জোচ্চোর

আশাপূর্ণা দেবী

প্রাপ্তিস্থান :

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র : ১৩৭০

প্রচ্ছদ : অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী দয়ারানী পাল
জি. এণ্ড পি. প্রিন্টার্স
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের

॥ ১ ॥

বিন্দে বুড়ি

দেশ রাজ্য জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে এখন উনিশশো উনআশীর ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, আর শুধু শহর বাজারেই নয়, গ্রামে গঞ্জে মায়ের কোলের শিশুটাও জানে মানুষ চাঁদে ঘুরে পুরনো হয়ে এসেছে সেই কবে, এখন মঙ্গল গ্রহে ঢুঁ মারতে যাচ্ছে। এবং তাবৎ জনেই জানে মানুষ ক্রমশঃ বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি হয়তো শেষতক্ রবির বাড়িও সঙ্কেত পাঠাবার তাল করতে, শূন্যে 'স্টেশন' বসাচ্ছে।

এই সাগরপুকুর গ্রামেও কারো জানতে বাকি নেই বিজ্ঞানের বলে এখন মানুষের শরীর যন্ত্রগুলোর কোনটা অকেজো-টকেজো হয়ে গেলে তাদের বাদ বাতিল করে কৃত্রিম অকৃত্রিম নতুন সব যন্ত্র বসিয়ে নিয়ে দিব্যি কাজ চালানো যায়। চোখের সামনেই ক'জনা তাদের হাওয়া ফুরিয়ে আসা হার্টের গায়ে 'হার্ট-মেসিন' বসিয়ে পুরোদমেই বেঁচেবর্তে রয়েছে। মেসিনের আয়ু ফুরিয়ে এলে, কলকাতায় গিয়ে আবার নতুন 'আয়ু' ভরে নিয়ে আসছে। তবু—তবু এখনো বিন্দে বুড়িকে হঠাৎ ঘাটে পথে দেখতে পেলেই, ছেলে বুড়ো সবাই উল্টোপাক খেয়ে চোঁ চাঁ সট্‌কান দেবে। তার কারণ? কারণ 'দৃষ্টি'।

বুড়ির 'দৃষ্টি'কে সকলের দারুণ ভয়।

ওই দিষ্টিতেই তো বুড়ি কী না কি অনিষ্ট ঘটাতে পারে কে জানে! মানুষ গ্রহান্তরে ঘুরে আসতে শিখেছে বলেই তো আর 'নজর লাগা' 'বান মারা' 'তুকতাক' 'জুড়ি-বুটি' এগুলো মিথ্যে হয়ে যায়নি? আর শক্তিও ফুরিয়ে যায়নি জল-পড়া, তেল-পড়া, ফুল-পাতা, শেকড়-বাকড়, হোমের ছাই, হাড়িকাঠের মাটির।

বিপদে পড়লে, এরাই বিপদতারণ।

এদের নিয়ে যাদের কারবার, তারা 'ভরে'র ঘোরে স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুরে এসে তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছুর ফটো তুলে তোমার সামনে ধরে দেবে। বিজ্ঞান পারবে এ সব ? সে বড় জোর তোমার রক্ত মাংস চামড়া শিরা ভেদ করে হাড়ের ফটোটা তুলে ধরতে পারে। কাজেই বিজ্ঞান হার মানলেই অ-জ্ঞানের কাছে আশ্রয়। আশ্রয় তো নিতেই হবে কোথাও।

একদা বৃন্দেও এ তল্লাটের পরম 'আশ্রয়' ছিল। বৃন্দের নাম তখন একডাকের মাথায়। বৃন্দে তখন 'গুনীন্ মা'। বিপদে পড়লেই ডাক ডাক বিপদতারিণী গুনীন মা কে। কিন্তু এখন পালা বদলে গেছে। এখন বিন্দেবুড়িই যেন গ্রামের একটা বিপদ-কেন্দ্র।

ওর দৃষ্টি পড়ার ভয়ে ওর বাড়ির সামনে দিয়ে সাধ্যপক্ষে কেউ হাঁটে না।...অথচ ঝোপ জঙ্গল আর ফণীমনসার বেড়ায় ঘেরা বুড়ির ওই বাড়িটার সামনে দিয়েই স্টেশনে যাবার শর্টকাট রাস্তা। গ্রাম সুদ্ধ লোকেরই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারীর ব্যাপার। পুরুষ ছেলেরা তো নিশ্চয়ই যাবে, গ্রাম ঝেঁটিয়েই যাবে। কলকাতা না ছুটে গতি কি ? এখানে 'পাত' সেখানে 'ভাত'।

গ্রামের বৌ-ঝিও তো কম যায় না পড়তে, পড়াতে, চাকরি করতে, গান শিখতে, এমন কি সেলাই-বোনা শিখতেও।

সুবোধ কুমোরের মেয়েটা নাকি মাটির মূর্তি গড়া শিখতে নিত্যদিন রেলগাড়ি চড়ে কলকাতায় যাচ্ছে আসছে।

এত প্রগতির হাওয়া সাগরপুকুর গ্রামে, তথাপি সব স্টেশন যাত্রীরাই বিন্দের দিষ্টির ভয়ে দুশো পাঁচশো গজ বেশী হাঁটা স্বীকার করে নিয়েও ভাঙা শিবমন্দিরের পিছন দিয়ে ইস্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে স্টেশনে যায়। শুধু সাইকেল আরোহীরাই যা চোঁ চাঁ দৌড় মারে সামনে দিয়ে।

মুশকিল এই, বুড়ির বর্তমানের বাসস্থান ওই খড়ের চালার ঘরটা, আর ফাটা বাঁশের খুঁটির ঠেকনোয় ঠেকানো থুখ্‌থুড়ে দাওয়াটা, একটা ঢিপি জমির ওপর। সেই দাওয়ায় বসে থাকা বুড়িটাকে দেখলে ঠিক

অশোকবনের চেড়ির মতো দেখতে লাগে! আর মরা আগুনের ঢেলার মতো চোখটাও চোখে পড়ে।

অথচ জমজমাট জ্বলজ্বলট যে ঘরবাড়ি আর সাজানো সংসারখানা ছিল বৃন্দের, সেখানে এখন আর তার পা ফেলবার হুকুম নেই! ও মুখো হতে গেলেই টগর ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। বলবে—এখেনে ক্যানো? এখেনে উঁকিঝুঁকি ক্যানো? আমার বাচ্চাকাচ্চাকে নজর দিতি এই-'চস বুড়ি?

'নজর'। হায় সে ক্ষমতা যদি এখন থাকত বৃন্দের।

তাহলে এতদিনে কবে টগরের 'সপুরী একগাড়ে' হয়ে যেত। কিন্তু বৃন্দে এখন বিষ হারানো ঢোঁড়া। বৃন্দের এখন মন্তর-টন্তর বিস্মরণ হয়ে গেছে, শেকড়-বাকড় চিনতে পারে না। বাণ মেরে অন্যকে শুকিয়ে দেবে কি, নিজেই তো শুকিয়ে শুকিয়ে আখের ছিবড়ে হয়ে গেছে। শুকিয়েছে বয়েসে, শুকিয়েছে মনের জ্বালায়, আর শুকিয়েছে পেটের আগুনে।

সর্বনাশিনী সর্বগ্রাসিনী টগর বৃন্দেকে শুধু দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তার রুজি রোজগারের পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছে শয়তানীর জাল ফেলে ফেলে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি যাচ্ছিল, রোজগারও কমে এসেছিল, বৃন্দের 'দুলোর বাপ' মরতে সাহায্যকারী হারিয়ে, আরোই ক্ষীণধারা হয়ে এসেছিল, তবু কিছু তো ছিল?

এখনকার বাচ্চাদের পেঁচোয় না পাক, হঠাৎ জ্বরের তাড়সে 'তড়কা'-টা তো হয়? আমাশা, ঘুংড়ি কাসি এ সবও হয়ে পড়ে রাংতা-মোড়া বড়ি-ফড়ি ছাপিয়েও। আর বুড়োদের ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা এগুলোও হয়। বৃন্দের জল-পড়া তেল-পড়াগুলো তো এ সবে ম্যাজিকের মত কাজ করত। এইটুকুর পেন্নামী থেকেই পেটটা চলে যেত একা বৃন্দের। টগর সে গুড়েও বালি দিয়েছে।

টগরের বিষ মন্তরে চাকা ঘুরে গেছে। এখন বৃন্দে সাগরপুকুরের বিভীষিকা স্থল। বিপদতারিণী থেকে বিপদকারিণীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে এখন তাকে দেশের লোক।

ইচ্ছে করে তো কেউ ওর ছায়া মাড়াতে যায়ই না, দৈবাৎ পথে ঘাটে দেখতে পেলেও ছুট মারে।

তা পথে দেখাটাও ক্রমশঃই বিলোপ পাচ্ছে। শুধু ঘাটেই বলা যায়। লাঠি ঠুকে ঠুকে খুট খুট করে যায় বৃন্দে শুধু ঘাটে। পেট বড় কড়া মনিব। মায়া মমতার বালাই নেই, উঠতে না পারলেও ঠেলে তুলে খাটতে পাঠায়।

পুকুরে তো যেতেই হবে।

বৌ হারামজাদি তো 'টিপকল' সমেত উঠোনটাই দখল করে নিয়েছে।

এতটুকুন একটা মেটে কলসীর গলায় গামছা বেঁধে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে একটু রান্না খাওয়ার জল নিয়ে আসে বিন্দে পুকুর থেকে। আর পুকুর পাড় থেকে খুঁটে খুঁটে নিয়ে আসে কিছু শুষনি কলমি শাক দুটো শামুক গুগ্‌লি। কি দুটো 'ঘেনি কাঁকড়া'।

ধনুকের মত গোল হয়ে যাওয়া শরীরটাকে আরো গোল করে হেঁট হয়ে বৃন্দে যখন ওই সব সংগ্রহ করে, তখন ওর ঘাড়টা অসম্ভব নড়ে। আর ঘাড় নড়ে বলেই মাথার ওপরকার ঘোলাটে সাদা ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের দু'ধারে সাপের ফণার মত দুলতে থাকে। দৃশ্যটা দূরে থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের পিলে চম্‌কে দেবারই মত। বড়দেরও ভীতিকর।

ঘাড় আরো বেশী নড়ে, বিন্দের বিড়বিড়িনি বকুনির ঠ্যালায়।

বকুনি আর কি !

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাল পাড়া। স্বর্গের ভগবানকেও ছেড়ে কথা কয় না। তবে প্রধান টার্গেট হচ্ছে দুলোর বৌ টগর। যে বৌটার স্বামী হঠাৎ হাট থেকে ফিরে 'বুক কেমন করতেছে' বলে ধড়ফড়িয়ে মরে যাওয়ায় রটিয়ে বেড়িয়েছিল, বেটার বৌয়ের প্রতি আক্রোশে তাকে জব্দ করতে নিজের বেটাকেই বাণ মেরে খতম করেছে বুড়ি।...তদবধিই বিন্দে গ্রামের বিভীষিকা।

বিন্দের তাই এখন গালমন্দই একমাত্র অস্ত্র।

ইহ পৃথিবীতে যত গাল থাকতে পারে তার সবগুলো বৃন্দে ছেলের

বৌয়ের প্রতি প্রয়োগ করে। আর ইহ সংসারে মেয়েমানুষের জীবনে যত রকম দুর্দশা ঘটা সম্ভব, সেই 'দশা'গুলো বৌয়ের ভাগ্যে ঘটাবার জন্যে তার জানা জগতের যাবতীয় দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করে।

কিন্তু সবই ওই বিড়বিড়িয়ে। গলা তুলে গাল পাড়বার সাহস ঘুচে গেছে। গেছে বৌয়ের বড় মেয়েটা লায়েক হয়ে ওঠা পর্যন্ত। বছর দশেকের মেয়েটা একদিন একখানা খেঁটে বাঁশ উঁচিয়ে তেড়ে এসে বলেছিল, 'ফের যদি মায়ের নামে গাল পাড়বি, তো এই বাঁশ মেরে মাথা ফাইটে দেবো, তা বুলে আকৃচি আঁ্যা।'

তদবধি 'গলা' বন্ধ বৃন্দের ওই বিড়বিড়। ওটাই এখন রোগে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় নড়ে, আর গলার নলি নড়ে।

ফণীমনসার বেড়ায় ঘেরা থুত্থুড়ে চালাঘরটার দাওয়ায় বসে মাৎগুড়মাখা চালভাজার গুঁড়োর দলা গিলতে গিলতে বিড়বিড় করে, আচ্চয্যি! এখনকার কাঁচা কচিগুলান কি সব্বাই আকুলি-সুকুলির বর পাওয়া? মা চণ্ডির বরপুত্তুর? তাই সাজ্‌জন্মে অ্যাকটাকে ডাইনেও চোষে না?

টগর যে গাঁয়ে তার দফারফা করে রেখেছে, সেটা বুড়ির জ্ঞান গোচরে ধরা পড়েনি, অগোচরেই রয়ে গেছে। কেউ তো আর কাছে এসে বলে যায় না। তাই ভাবে রোগ-বালাই উপে গেছে গ্রাম থেকে। তাই বলে, মা ওলাইচণ্ডীও কি গাঁ থেকে বিদেয় নেচে গা? মা শেতলা তার বেটাদের আঁচলে গিঁট বেঁদে থুয়ে একেচে?...আর ভূতপেরেৎও ভোবোন ছাড়া হয়ে গ্যাচে? তাই ঝি বৌর গায়ে এট্টু হাওয়া বাতাসও নাগে না?...তবে আর গিরোস্তো বাড়ি থেকে বিন্দে কাওরাণীর ডাক পড়বে কোন কাজে?

কত ঝি বৌর দাঁত কবাটি ছাইড়েচে এই বিন্দে। কত বেয়াড়া মেয়ের ভূত ছাইড়েছে। চোক উল্টে যাওয়া ছেলেপুলেরে সোজা করে দাঁড় কইরে দেচে।...ডাগদার বোদ্যি কি আর ছেল না গাঁয়ে? ছেল, তবু বিন্দেকে নৈলে চলতনি কাউর।...

এখনি যেন সব সায়েব ম্যাম্ হয়ে গ্যাচে। আহা, মা ওলাইচণ্ডি, মা

শেতলা, ভূত পেরেৎ হাওয়া বাতাস, সবাই মিলে একবার ঝাঁইপে পড় না এই সাগোরপুকুর গাঁয়ে।

আর বিন্দেকে শোক্তি গ্যাও। নোতুন যৈবনের মতন শক্তি।

মনের প্রাণের কথা শোনবার লোক চলে গ্যাছে। অন্য আর কে এমন ভয়াবহ কথা কান পেতে শুনবে? তাই এই আক্ষেপের বাণী, প্রার্থনার বাণী ওই চালভাজার গুড়োর মধ্যেই গুঁড়ো হয়ে যায়।

কিন্তু শুধু বৃন্দে বুড়ি কেন? আধবুড়ো অনঙ্গ ডাক্তারই যখন তার ফাঁকা ডিস্পেনসারি ঘরের মধ্যে হাতল ভাঙা চেয়ারটায় বসে কাঁচা পাকা গোঁফের ঝুড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলে, দেশটা কি বিলেত হয়ে গেল, অ্যাঁ! চিরপরিচিত রোগগুলো সবে উবে গেল তল্লাট থেকে? এখন রোগের মধ্যে রোগ, যত সব দুরারোগ্য ব্যাধি? নে, রুগী নিয়ে কলকেতায় ছোট। কলকেতায় যেন ধন্বন্তরী বসে আছে! কলকেতায় লোক মরে না!

বলি অনঙ্গ ডাক্তারের হাতে এ-যাবৎ ক'টা রুগী ফেঁসেছে? গুণে বলতে পারি।···খাতায় লেখাও আছে। ডাক্তার মরলে দেখিস খাতা খুলে।···আর তোদের ওই কলকেতার পেশালিস্টদের হাতে? হুঁ!···বলি নাড়িজ্ঞান আছে কারুর? রুগী নিয়ে গিয়ে সামনে ধরে দিলেও তো টাচ্‌টি করে না। হুকুম হবে রুগীর রক্ত আন্—ইউরিন আন্—হ্যান আন—ত্যান্ আন্—মাথা থেকে পা অবধি এক্সরে ফটো আন্, তবে রুগী ছোঁব।···তখন বাবুদের হাজারে হাজারে টাকা ঢালতে পেছপা নেই। মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছে। রুগী বয়ে বয়ে কলকেতায় যাও আর আসো, তারপর আর বোয়ো না। তাকে হাসপাতালে রেখে এসো, আর শেষ অবধি কলকেতার শ্মশানে পুড়িয়ে খালাশ হও।···অথচ অনঙ্গ ডাক্তারকে দুটোর ওপর তিনটে ভিজিট দিতে হলেই বুক ফেটে যায়। তখন শাসানি—কই ডাক্তার? কিছু তো উন্নতি দেখছি না। ···তা দেশটা বিলেত হয়ে গেল বৈ আর কী বলব? দুরারোগ্য ব্যাধি

ভিন্ন কলেরা নেই, বসন্ত নেই, ম্যালেরিয়া নেই, পেটের অসুখ রক্ত আমাশা পর্যন্ত নেই। ছিঃ? · থাকবে কোত্থেকে? এখন যে সব স্বয়ং-কর্তা বাবুদের পকেটে পকেটে ওষুধের মোড়ক। বিশ্বসুদ্ধ সবাই ডাক্তার হয়ে বসে আছে। রোগকে কি আর মাথা তুলতে দেয়?

তখন কি আর দেয়াল ছাড়া অন্য কাউকে বলে অনঙ্গ দাস? এ-সব কথা মনেরও অগোচরে থাকে।

শুধু মড়িপোড়া ঘাটের 'গুনো ডোম'? সে রাতের বেলা হাই তুলতে তুলতে তার সাকরেদকে ডেকে ডেকে হেঁকেই বলে, হ্যাঁ রে বেচু, সাগরপুকুরের লোকগুলো কি অমর হবার পিতিজ্ঞে নিয়েচে? রাতভোর বাসর জাইগে বোস করে রইচি, একখান মড়া নাই?

গুনো ডোমের ঘাটটাকে এখন 'সাগরপুকুরের' লোকেরা সভ্য করে বলে 'বার্ণিংঘাট' তা 'বার্ণিং' হতেই বা আসচে কে? আসবে না। বড়জোর দিনান্তে দুটো কি একটা। অথচ আগে?

গুনো উদীপ্ত হয়ে উঠে বসে বলে, ত্যাখনকার কতা মনে কর বেচা! গাঁয়ে এ্যাক অ্যাকটা মড়োক নাগচে, আর তোতে আমাতে চিলু সাজাতে দিশে-পিশে পাচ্চিনে।·· এই আসচে, এই আসচে তার ওপোর তার ওপোর। দিন রাতের ভেদ নাই।

বেচু হয়তো বলে, আজকাল আর লোক রাত-ভিতে বেরোয়-না মামা, মড়া কোলে নে বোস করে থাকে ফর্সা হবার ওপিক্ষেয়। অথচ অ্যাখোন মা মনসার বংশোধরেরাও তো নোপাট্টি। আর জনে জনে হাতে টচ্‌বাতি। ভয়ের কী আচে?

গুনো নিঃশ্বাস ফেলে বলে, রাতে বেরোয় না—তো দিনোমানেই বা বাসিমড়ার ভিড় কই? সাদে বলচি এ তল্লাটের লোকেরা অমর হবার পিতিজ্ঞে নেচে।

তা গুনোর এ আক্ষেপও তার প্রাণের প্রাণ পাতানো ভাগনা বেচু ভিন্ন কি আর কারো কানে ঢোকে? কাজেই গ্রামবাসীর টের পাবার উপায় নেই তাদের সেই অতি অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকাটার উপর কোথায় কি বিষদৃষ্টি পড়ছে।

তবে এমনিতেই বৃন্দের 'দৃষ্টি' সম্পর্কে সবাই অবহিত।

বৃন্দের ওপর দিকের তিন পুরুষ, না, ঠিক পুরুষ বলা চলে না, 'তিন নারী'ই বরং বলতে হয়, মা দিদিমা আর তস্য মা সবাই ছিল নাড়িকাটা দাই। গেরস্ত বাড়ির আঁতুড় ঘরই তাদের কর্মক্ষেত্র। বৃন্দে যে কেমন করে 'গুনীন মা' হয়ে উঠেছিল সেটাই রহস্য।

অবশ্য রহস্য আবিস্কার করতে গেলে, উৎস-মুখের সন্ধান যে না মেলে তা নয়। বৃন্দের যখন প্রথম বয়সে. মানে বাল্যবয়েসেই, সত্যকার বিয়ে হয়েছিল, এবং বেশ ক'বছর শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়েও ছিল, তখনই এই বিদ্যাটি শিক্ষার সূত্রপাত।

বৃন্দের দিদিশাশুড়ি ছিল ওদের হলুদ গাঁয়ের নাম-করা মেয়ে। যত রকম জড়ি-বুটি শেকড়-বাকড়ের সঞ্চয় থাকা সম্ভব, তা তার ছিল। দিদিশাশুড়ির এই সব জড়ি-বুটির সাপ্লায়ার ছিল একটা যোয়ান বয়সের বেদেনী। তার সঙ্গে ভাব-ভালবাসার সূত্রেই বিন্দের এই বিদ্যে শেখার সূত্রপাত। উৎসাহ দেখে দিদিশাশুড়িও শিখিয়েছিল অনেক। নিজের সব বিদ্যেই মরণকালে নাতবৌকে দিয়ে যাবে এ অঙ্গীকারও করে রেখেছিল, কিন্তু তার মরণকালের আগেই বিন্দের মরণ হল।

'অমনিষ্যি' যে বরটা ছিল বিন্দের সেটা একদিন বলা কওয়া নেই হুম্ করে মরে গেল, আর বিন্দেও পত্রপাঠ তার পিসতুতো দ্যাওরের সঙ্গে পলায়ন দিল।

ওদের সমাজেও দ্যাওরের সঙ্গে বিয়ে হয় না। কিছুদিন ঘুরল একসঙ্গে, কারণ লোকটার ছিল ওই ঘুরুনীর নেশা। আর যুবতী বিন্দের কাছে তখন পৃথিবীটা দারুণ আকর্ষণের। বলতে কি—ওই দেশ বিদেশ ঘোরার প্রলোভনেই দেশ ছেড়েছিল বিন্দে। কিন্তু লোকটার নেশা লোকটাকে আরও দূরে নিয়ে গেল।

একদিন মুঙ্গেরের গঙ্গার ঘাটে 'তুই এট্টু বোস, আমি আসতেছি—' বলে বিন্দেকে বসিয়ে রেখে সেই যে হাওয়া হয়ে গেল, তো গেলই।

বিন্দে কি তা বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে এই বিশ্বাসঘতকতার জ্বালা জুড়োবে? না, তেমন পলকা ধাতুর মেয়ে বিন্দে নয়। বিন্দে সেই

মুঙ্গেরের ঘাট থেকে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে আর একটা পুরুষের ঘাড় জোগাড় করে, তার সঙ্গে তারই গাঁ এই সাগরপুকুর এসে ঘর বাঁধল। তুলো তার এই তৃতীয় সংসার জীবনের ছেলে।

এই সাগরপুকুরেই বিন্দের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কেটেছে, বিন্দে সংসার করেছে, জমি-জিরেত করেছে আবার দোহাতা কর্মজীবনের পশার জমিয়েছে। এত ঘোরা ঘুরতির মধ্যেও বিন্দের অতীত বিদ্যাটি নষ্ট হয়ে তো যাইইনি, বরং বেড়েছে। নানা সংস্পর্শে এসে নানা সাহায্যে বেড়েছেই সত্যি।

বিন্দে মানুষের ভাল করতেও শিখেছে, মন্দ করতেও শিখেছে।

তবে গেরস্ত ঘরের ঘর সংসারী মানুষরা তো মন্দ করতে বলতে তেমন সাহসী নয়, ভাল চাইতেই আসত ছুটে ছুটে, আর সে ভালটাই করত বিন্দে। জল পড়া তেল পড়া মাদুলী শেকড় বাকড় ঝাড় ফুঁক, যা চাও, বিন্দের কাছে আছে।

কোলের ছেলেকে মায়ের কোল থেকে 'ডান চুষলো'—ছেলে বমি করে করে নেতিয়ে পড়ে যায় যায়—তখনই ডাক ডাক গুনীনমাকে ডাক।

তখনকার বিন্দের চেহারা, যদি ক্যামেরায় ধরা থাকত, এখন দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করত, সেই মানুষটা এই মানুষ ?

মাজামাজা গড়ন, পিঠ ছড়ানো কালো চুলের 'ঢাল'। মুখ চোখ কুঁদে কাটা। সুন্দরী ছিল বৃন্দে কালো রঙেও।

কিন্তু রূপ-যৌবন জিনিসটার তো চিরস্থায়িত্বের গ্যারান্টি নেই। তুকতাকেও থাকে না। রূপ তো গিয়েইছিল—

বিন্দে ক্রমশ গেঁয়ো যোগীও হয়ে পড়েছিল। লোকের হঠাৎ ঘাড়ে কোমরে ব্যথা আটকে ধরলে অভ্যেসের বশে বিন্দের কাছে 'ঝাড়াতে' যাচ্ছিল বটে, কিন্তু হাতে হাতে ফল পেলেও, বলছিল—'দূর! ওই অ্যানাসিনের বড়ি দুটোই কাজ করল।'

বিন্দের কালো চুল শাদা হচ্ছে, ভরাট গালে ভাঙন ধরছে। খাড়া ধনুক শরীরটাতে অলক্ষ্যে কে কোথায় বসে যেন ছিলে পরাবার চেষ্টা

চালাচ্ছে। আর ওদিকে সাগরপুকুরের মাটি থেকে ম্যালেরিয়া কমছে, ওলাবিবি বিদায় নিচ্ছে, মা শীতলা, যদিবা তাঁর তিন ছেলের মধ্যে হুটোকে মাঝে মাঝে ছাড়ছে, কিন্তু আসল জোরাল ছেলেটাকে সহজে আঁচল ছাড়া করছে না।

অনঙ্গ ডাক্তারের মতন তো বিন্দের হাতে পর্যাপ্ত ওষুধ নেই। তাই রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে ছড়িয়ে রেখে এসে মড়কের পদধ্বনির আশায় ঘণ্টা গুনবে।

তুলোর বাপ থাকলেও হয়তো বা করত একটা ব্যবস্থা।

সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না এমন সব ওষুধ তারও জানা হয়ে গিয়েছিল। সংগ্রহ করে আনতে পিছপা হত না। আর এমন অলক্ষ্যে কাজ সারত যে শিবের বাবাও টের পেত না। মন্দটি করে রাখত সে আর বিন্দে ভাল করত। ধরা পড়ত না।

অনঙ্গ ডাক্তার ধরা পড়েছিল।

আর পড়েছিল বিন্দের হাতেই।

রাতের অন্ধকারে হু'জনে মুখোমুখি। পুকুরের জলে 'ওষুধ' ঢালবার মুখে।

বিন্দে শেকড়ের চেষ্টায় গিয়েছিল।

গেরস্থদের বৌ ঝি বিশেষ একটা 'ওষুধের' জন্যে তখনো বিন্দের দ্বারস্থ হত। দশটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ল্যানজারি হওয়ায় যে সুখ নেই, সেটা বুঝেছিল তারা গরমেন্টের প্ররোচনার অনেক আগে থেকেই। তাদের সেই বোধ বুদ্ধির সহায়ক ছিল বিন্দে। তাই অমাবস্যার রাত্তিরে পুকুর ধারে শেকড় তুলতে এসেছিল সে।

ডাক্তারের ক্রিয়াকলাপটা দেখে ফেলে বিন্দে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করল, ডাক্তার মশাই এটা কি হল?

অ্যাঁ! কে? কে তুই? কোন্‌টা কি?

শুদোচ্ছো ক্যানো? নিজেই জানো নাই?

অনঙ্গ দাবাড়ি দিয়ে অস্বীকার করতে পারত কিন্তু সেইমাত্র অকর্মটা করে ফেলে বুকটা ধড়ফড় করছিল—তাই বলে উঠল, চুপ বাবা চুপ!

তোর মা চণ্ডীর দোহাই! কাজটার ফল ফললে তো তোরও লাভ, আমারও লাভ!

বিন্দে তীব্র গলায় বলল, আর গুনো ডোমেরও লাভ।

আহা না না, অত কিছু না। তেমন জোরালো কিছু না। শুধু একটু রোগ-বালাই হতে পারে।

আচ্চা দেকব। ত্যামন হলে তোমায় ধরে নে গে মা চণ্ডীর তলায় বলিদান দেওয়া করাবো, তা কয়ে রাকচি।

অনঙ্গ মুসড়ে গিয়ে খানিকটা তুতিয়ে পাতিয়ে শেষে রেগে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, তোরও হাটে ভাঙবার হাঁড়ি আছে।

কী আচে আমার, অ্যাঁ? কী আচে শুনি?

আছে। তোর বেটার বৌই বলেছে। বলে হন হন করে চলে গিয়েছিল অনঙ্গ ডাক্তার।

কিন্তু ছুজনারই কপাল। তেমন কিছু ছেড়ে কিছুই হল না। নির্ঘাৎ ভেজাল ওষুধ।

আর সাগরপুকুরের লোক তো সহজে পুকুরের জল ব্যাভার করছে না অনেক দিন থেকেই। রাস্তায় রাস্তায় টিপকল বসিয়ে দিচ্ছে গরমেন্ট। পয়সাওলারা নিজেরাই নিজ নিজ উঠোনে বসিয়ে নিচ্ছে।

বিন্দের উঠোনেই তো টিপকল বসেছে তখন।

প্রথম যখন জিনিসটা গাঁয়ে চালু হয়েছে। ছলোর বাপ উয্যুগ আয়োজন করে নিজের উঠোনে ওই 'পাতালগঙ্গা' বসিয়েছিল।

সেই জিনিস এখন ছলোর বৌয়ের অধিকারে।

সর্বস্বই তার অধিকারে। পেটের বেটাই বিন্দেকে দূর দূর করে খেদিয়েছে।

বুড়ি আমার মেয়ে ক'ডাকে নজর দে নজর দে ওগা করে দেচে—।

এই ঢেউ তুলে টগর ছলোকে লেলিয়ে দিয়ে বিন্দেকে ভিটে ছাড়া করে রান্নাঘরের ধারে ওই চালাখানা তুলিয়ে বসতি করিয়ে দিয়েছে। তার মানে দূর করেই দিয়েছে।

তাড়িখোর ছলো, বোঝ না সোঝা। ঠ্যাঙা নিয়ে বোঝ।

বৌয়ের কথা শুনে বলেছে, তাই তো, মেয়েগুলানতো রোগা হয়ে গেছে।

তুলো মাকে চোখছাড়া করে এসে মায়ের ঘরের বড় চৌকিখানায় হাত পা বিছিয়ে শুয়ে বলেছে, ভালই হল। আমার একখানা নেজস্বো ঘর হল। তোর ওই নরিষ্টি, গরিষ্টি মেয়ে তিনডেরে নে। তুই ও ঘরে রাজত্বি করগে যা টগরি।

কিন্তু সে আর ক'দিন? তুলোকেও তো সে চৌকি ছাড়তে হল। কে জানে এখন কোথায় কোন্ চৌকি জুটেছে তার। এখন তো সবটাতেই টগরের রাজত্বি। বিন্দে বুড়ি ও অঞ্চলে পা দিতেই পায় না।

মাঝে মাঝে গলা তুলে চেঁচায় বটে, টিপকলের জলডা আমারে নিতে দিবেনি ক্যান্রে লক্ষ্মীছাড়ি? নান্নাখাওয়ার জলডা নিতে দিবিনে ক্যান্? ওডা তোর শোউরের তৌউরি না। সে মালিক না?

টগর বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, তো যমের বাড়ি থে ডেকে নে আয় মালিককে। তা-পর দখল নিতে আসিস।

নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র শাপ-শাপান্ত।

টগর যে তার ওই সোয়াগের মেয়ে তিনটেকে নিয়ে রাতারাতি বিছানায় মরে থাকবে, এমন ভবিষ্যৎ বাণীও করে বিন্দে।

টগরও চেঁচাতে ছাড়ে না, আর দু'পক্ষ যখন সপ্তমে ওঠে, তখন ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে সেই দস্যি লোকটা, তুলোর জায়গায় যে ওই সংসারটাকে বাগিয়ে নিয়েছে। ওখানেই খায় শোয় বসে দাঁড়ায়, আর সংসারটার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দৈত্যের মত খাটে।

তাড়িখোর তুলো উঠোনের একমুঠো ঘাস কখনো ছেঁড়েনি। আর এ লোক ওইটুকুতেই সোনা ফলাচ্ছে।

সে এসে টিপকলটার ধারেই দাঁড়ায়, আর হুঙ্কার দিয়ে বলে, হয়েচেটা কী? অ্যাতো চেল্লাচিল্লি কিসের?

ব্যস। সব চুপ হয়ে যায়।

তুলোর মেয়েগুলো হি হি করে হাসে, আর বলে বাপটারে, বুড়ি য্যানো ঢিল খাওয়া নেড়ি কুত্তার মতন পাইলে গ্যাল। তাই লয়?

আশ্চর্য!

লক্ষ্মীছাড়ি ছুঁড়িগুলো কিনা আপন ঠাকুমাকে বাঁশ নিয়ে মারতে আসে, আর নিজের বাপের থেকে সৎবাপকে ভালবাসে। 'বাপটা' বলতে গড়িয়ে পড়ে একেবারে।

দেখে আর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় বিন্দের। মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে শাপ দেয়, মরবি মরবি। মা ওলাবিবি তিনডেরে অ্যাক সাতে ধরবে। আত পোয়াতে না পোয়াতে, দোক্‌খিন দোরে যাবি।

ওরা আর ভয় পায় না।

একই কথা শুনে শুনে কানে ঘাঁটা পড়ে গেছে।

নতুন কথা আর পাবে কোথায় বিন্দে? শুনতে পেলে মেয়েগুলো জিভ ভ্যাংচায়, পা দেখায়, আর হি হি করে হাসে। বুড়ি তখন যদি বলে, পা ছ্যাকাচ্চিস? বাপের মায়েরে পা ছ্যাকাচ্চিস? ওই পায়ে কুট্ হবে, জিব খোসে যাবে—। সেটাই কি নতুন বলে?

কিন্তু আর কোন সম্বল আছে এখন বিন্দের?

সন্ধেবেলা ভাতের পাট নেই। কোথায় ভাত যে পাট থাকবে? ক্ষমতাই বা কোথায় ভাত সেদ্ধ করতে? সন্ধ্যেবেলা চালের খড় খসে পড়া থুত্থুড়ে দাওয়ার নীচে বসে তেল নুন আর জল মাখা ছাতুর গুলি চিবোতে চিবোতে বৃন্দে উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তার সেই উজ্জ্বল সমারোহময় দিনগুলোর কথা ভাবে।

॥ ২ ॥

উকিলবাবুর মেয়ের ঘরের পেরথম নাতি, চাঁদপারা রূপ ঝিয়ের কোলে চেপে পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠেই ভয়ে নীল হয়ে সেই যে ঘাড় নটকে ঝিয়ের কাঁদে মুখ গুঁজল, সে মুখ আর তুলছে না। শুধু বু বু করতে করতে মুখে ফেনা কাটছে :

নজর লাগাই। কিন্তু মোক্ষম কিছু।

কিন্তু ও রোগের ওষুধ কি আর ডাক্তার বদ্যির কাছে মেলে। এর চিকিৎসা গুণীনমা। ডাক তাকে, এখুনি ছুটে যা।

রান্না চড়াচ্ছিল বৃন্দে, জ্বলন্ত কাঠে জল ঢেলে দিয়ে ছুটে এলো। দেখে কপাল টিপে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ছেলের মাকে জিগ্যেস করল। ঝির সাতে ছাড়া করার বেলা ছেলের কপালে কাজলের টিপ ছ্যাও নাই?

হ্যাঁ। দিয়েছি গো।

হাতের ত্যালোয় গোবরের ফোঁটা?

তাও দিয়েছি।

কোড়ে আঙুল কামড়ে নেচলে?

হ্যাঁ মা, সব করেছি।

মুখে 'থুক' দেচলে?

ছেলের মা মাথা নাড়ল।

দাও নাই। উইতো, উইটিই তোমাদের দোষ। শুদোই মা তোমার সাত দুয়োরি ঘরের ছটা দুয়োরে খিল হুড়কো নাগিয়ে তালাচাবি দে বন্দ করে, যদি অ্যাকটা দুয়োর হাট রেকে থোও, সেই ফাঁক দে দিয়ে চোর মাতা গলাতি পারে, কি নারে'? বল আমারে?

মা নীরব।

দিদিমাকে বলে, আপনি তো মান্যিমান গিন্নী মনিষ্যি। তো আপুনিও তো হ্যাবে? আপুনি জানো না কি থেকে কী হয়?

দিদিমা ইতস্তত করে জানালেন তিনি তো বলেছিলেন, কিন্তু মেয়ে বলে ঘেন্না লাগে।

ঘিন্না নাগে? তো অ্যাকোন বোজো? বলে মায়ের থু অমতো। ওই ফাঁকা দুয়োরটি দিয়েই চোর সেঁদিয়েচে।

মা দিদিমা দুজনেই হাপাসায়।

ডাক্তার গিন্নী আর উকিল গিন্নী।

আর কখনো এমন ভুল হবে না মা। এখন তুমি বাঁচাও।

তা বাঁচাল বৈকি বৃন্দে. মায়ের খোঁপার লোহার কাঁটা পুড়িয়ে এক ঝিনুক দুধে তিনবার ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ডুবিয়ে, সেই দুধ জোর করে গিলিয়ে দিল মুখ গোজা নেতিয়ে পড়া ছেলেকে। দণ্ড দুই পরেই হেঁটে বেড়ালো।

তা তো বেড়ালো। কিন্তু এমন কাজটা করল কে?

আর কেউ নয়। সেই দাসী।

কেন এত দিনের বিশ্বাসী লোক। লোভ! লোভে পড়ে মানুষ কি না করে।

তার পেট কোঁচড়ের আঁচল থেকে বেরোল ছেলের গলার সোনার হার।

এতক্ষণ ছেলে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সবাই, দেখেনি গলার হার গলায় আছে কি নেই। বিন্দের জেরায় স্বীকার করতে বাধ্য হল যে নিয়েছে লোভে পড়ে। এখন ধরা পড়ল। দেখা গেল ছেলের ঘাড়ে গলায় হার হিঁচড়ে টানার দাগ ···।

কলকাতার স্যাকরার গড়া, আধুনিক 'টিপকল' খুলতে পারেনি, ছিঁড়ে নিয়েছে। তদবধিই ছেলে মুখ গুঁজেছে। ঘাড় তোলেনি।

স্বীকার না করে উপায় ছিল?

বৃন্দে একগোছ পান মন্তর-পড়া জলে ডুবিয়ে ধরে শাসাচ্ছিল, বল

মাগী, বল কেমন করে নেছিলি?…মিচে কতা বলবি তো এই পানজলের আচড়া মারব। জন্মের শোদ বাক্যি বন্ধ হয়ে যাবে। তোর ঝাড়ে বংশে শ্যাষ হবে।

উকিল গিন্নী হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিয়েছিলেন বৃন্দেকে। আর তাঁর মেয়ে দিয়েছিল চওড়া লাল পাড় পাটের শাড়ি। সেই শাড়ি-পরা রূপ দেখে তুলোর বাপ বলেছিল, পতে ঘাটে এই রূপ নে ঘুরিসনে তুলোর মা। গোরায় ধরে নে যাবে।

বৃন্দে বলেছিল, মরণ! বুড়ো-কালে অ্যাকনো কতায় কত অস।

কথা। একদা ওই কথাতেই মজে বৃন্দে ওর সঙ্গে জাকিয়ে বসে ওর দেশ। গাঁ এই সাগরপুকুরে এসে বসবাস করতে লেগেছিল। চওড়া বুক, চওড়া পিঠ, বাবরি চুল, হাত পা যেন লোহায় গড়া। অথচ প্রাণটা মায়ার সমুদ্দুর। আর মুখের কথা? যেন মিছরির পানা।

কতকাল হয়ে গেছে, তবু এখনো মনে করলে, মনটা হুহু করে ওঠে।

ভাল করতেও পারত বৃন্দে, মন্দ করতেও পারত। দত্তবাড়ি, জ্ঞাতির লড়াই। গলাবাজি থেকে হাতাহাতি।

দুই জ্ঞাতি ভাই, জ্যাঠতুতো খুড়তুতো, লেখাপড়া জানা। তথাপি পরস্পরে বাপ তুলে গালিগালাজ। অতঃপর কোর্টে ছোটে আর কি!

কিন্তু ঝগড়ার কারণ? কারণ হাস্যকর।

বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছের আগাটা ঝুঁকে এসে পড়েছে, ছোট দত্তর ভাগের পাঁচিলের এধারে।

ছোট দত্ত শাসায়, উঠোনে ঘুঁটে শুকোয়, কাঠ শুকোয়—ছায়া পড়ে। গাছের মাথা সরিয়ে নেবে তো নাও, নচেৎ বাগদী লাগিয়ে গাছ ঝাড়ে মূলে শেষ করে দেব।

আর বড় দত্ত শাসায়, ডেকে আন উকিল ব্যারিস্টার। বলুক কে বলবে, গাছের ছায়া অন্যের জমিতে পড়তে পারে না। পড়াটা বে-

আইন। দেখি কেমন বাগদী লাগাস। গাছ ঢু' ফাঁক হবে তো তোর মাথাও ঢু'ফাঁক হবে।

ছোট দত্ত রাতের অন্ধকারে এসে ধরল বৃন্দেকে।

ঢুলোর বাপ হেসে বলল, তা আপনারই তো ছোটকত্তা গাজুরি লড়াই? গাছের ছাওয়া নে নড়াই চলে?

ছোটকত্তা একগোছা দশটাকার নোট 'মায়ে'র পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, তা জানিনে। বিহিত একটা করতেই হবে। এ হচ্ছে ইজ্জতের লড়াই। বলে কিনা কোর্টে যাবে। মাকে দেখতেই হবে। মুখ রাখলে শাড়িজোড়া। নতুন গামছা, আরো টাকা।

অগত্যাই দেখতে হল মাকে।

বাস! রাতারাতিই বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছ, কাঁদি কাঁদি ডাব সুদ্ধ, বাণ খেয়ে কাঠ। একটা ডাবের মধ্যেও ছিটে বিন্দু জল নেই।

পরদিন বড় দত্ত আপসে এসে পড়ল, তুই আমার এই করলি বাছা? বলি ছোট হারামজাদা কত টাকা দিয়ে গেছল তোকে? আমায় একবার তুই জানালি না কেন? আমি তার ডবল দিতাম। অন্যায় তো ওরই।

বৃন্দে অকুতোভয়ে বলল, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার মালিক বিন্দে না। ট্যাকা তার ছপ্পর ফুঁড়ে পড়ে। উনি অগরে শরোণ নেচে, উনির সাতে বেইমানী করব?

বড় দত্ত আগুন হয়ে বলে গেল এক মাঘে শীত পালায় না বিন্দে! দেখব! তা সেই তেনাকেই আবার দাঁতে কুটো নে আসতে হল বৃন্দের দোরে।

ছেলের বৌয়ের গহণার বাক্স চুরি হয়ে গেছে। ছিল কোথায়? ঘরের মধ্যে লেপের চালির ওপর তোলা ছিল। বিছানা বালিশের মধ্যে তাকিয়ার তুলো বার করে তার ভিতর পুরে রাখা থাকত। সে জিনিস চোরে নেয় কেমন করে? মই ভিন্ন তো নাগাল পাবে না।

থানা পুলিশ করতে গেলে জিনিস মিলবে না, হয়রাণি সার হবে। এ কথা গ্রামের বাসিন্দাদের জানতে বাকি নেই। অতএব? অতএব 'গুণীনমা।'

কড়ি চেলে বল মা, কে এমন কাজ করেছে। কোন ঘরশত্তুর বিভীষণ ? গিন্নীর একটা অগাবগা ভাইপো থাকত সংসারে, দু'বেলা দুটি খাওয়ার বিনিময়ে মজুরের খাটুনী খাটত, তবু কর্তার দু'চোখের বিষ সে। 'সন্দ' তার ওপর।

কড়িটি চাললেই খ্যাঁক করে তার কণ্ঠনালিতে চেপে বসবে। কাঁকড়া বিছের কামড়ের মত। হাতে ধরে ছাড়ানো যাবে না। স্বীকার করলে আপনি ছেড়ে খসে পড়বে।

আর অস্বীকার করলে ? সে কথা বৃন্দেই জানান দিল। নিয়ে অস্বীকার কল্লে মুখে অক্ত উটবে।

কত্তা বললেন, যা হয় হোক।

গিন্নী বললেন, ওই মুখে রক্ত ওঠাউঠি বাদ দিয়ে হয় না ?

বৃন্দে মাথা নাড়ে।

মন্তরের কাজ মন্তর করবে। কড়ির কাজ কড়ি। চলার পর আর বৃন্দের হাতে নেই। সে নিজের পথে ছুটবে। তবে হ্যাঁ, চোরের চেহারা চরিত্তির বলে দিতে পারে বৃন্দে চোখ বুজে। তারপর তোমরা থানা পুলিশ কর, আর মারধোর কর। তবে কড়ি হচ্ছে মোক্ষম। নির্ভুল।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে বৃন্দে, লম্বাপারা গড়োন, গোরাপারা অং।

গিন্নী নিশ্বাস ফেলে। স্বস্তির নিশ্বাস। আর যাই হোক তাঁর ভাইপোকে কেউ 'গোরাপারা রং' বলে অপবাদ দেবে না। আর লম্বাপারাও নয়। দেখা যাক কে ?

বৃন্দে বলে চলে, মাতার স্মুমুকের চুল পাতলা, বাঁ পায়ে একটা জড়ুল। আর ডান কানের পিঠে তিল। ···ঘরেই বসবাস, ঘরেই শোওয়া বসা—

ছেলের বৌ ডুকরে ওঠে।

কত্তা গিন্নী বৃন্দের পায়ের সামনে উপুড় হয়ে বলেন, মা, কড়িচালায় ক্ষ্যামা দাও। এই তোমার পেননামী, এ-কথা যেন আর কারো কাছে প্রকাশ না হয়।

কিন্তু করেছে কি সে গহণা ? বেচেছে ? গালিয়েছে ? না কি—

হ্যাঁ তাই। বেচেওনি গালায়ওনি। ভাবের মেয়েছেলেকে দেচে। কলকেতায় থাকে সে মাগী, এ অঞ্চলেই নয়।

তবে আর কী করা যায়!

করার কিছু নাই।

বৌ বাপের কাছে গিয়ে আবদার করে আবার গহ্ণা বাগাক। বলুক, চোরে নেচে বলে তোমার বেটি ন্যাড়া গায়ে লোক-সমাজে বেরোবে?

তা বিশ্বাসের মূল্য রাখে বৃন্দে। আজ পর্যন্ত বলেনি কাউকে।

॥ ৩ ॥

চোখের ওপর ভাসে সামন্তগিন্নীর চেহারাটা।

মোটাসোটা দলদলে গয়লার গাইয়ের মত আকার। গলায় ইয়া মোটা কড়ি হার, হাতে মোটা মোটা গোলাপপাতা বালা, ওপর হাতে পালংপাতা অনন্ত। কোমরে রুপোর গোট—দেড়সেরের কম ওজন নয়। নাকে ফাঁদি নথ, কানে সার মাকড়ি।

ভর দুপুরে পাঁচটা পান, পাঁচটা সুপুরি নিয়ে এসে চুপি চুপি গছিয়ে আর্জি জানিয়ে রেখে গেল, বৃন্দের ঘরের 'উদ্দানী চণ্ডির' ঘটের ঠাঁই।

'রুদ্রাণী চণ্ডী যে কোন দেবী, কোন মূর্তি তা জানে না বৃন্দে', সেই কোন অতীতে প্রথম পক্ষের দিদিশাশুড়ির কাছে শুনেছিল। এই তাদের ইষ্টদেবী। এনার নামে ঘট পিতিষ্টে করে রাখতে-হবে, যে যা বাসনা জানাতে আসবে, পাঁচটা পান সুপুরি ঘটের সামনে 'গছিয়ে' রেখে চুপিচুপি মনের কথা ব্যক্ত করে যাবে।

'এমারজেন্সির' ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা পদ্ধতি।

তখন তো ডাক পেয়ে ছুটতে হয়। জ্বলন্ত উনুনে জল ঢেলেও। তখন ওই ঘট পেন্নাম করেই ছুট। পরে সফল হলে মায়ের পূজো দেবে খদ্দের।

তা অসফল আর ক'বার হয়েছে বৃন্দে তার জীবনে?

এখনি চাকা ঘুরে গেছে।

ডাকই নেই, তা সফল আর অসফল।

সামন্ত গিন্নীর আর্জি, বেটার বৌকে জব্দ করতে হবে। বৌ নাকি জাহাবাজ চোপাবাজ। শাশুড়িকে মনিষ্যি জ্ঞান করে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। পাড়ার লোকের কাছে বলে বেড়ায় শাশুড়ি গিল্টির গহণা পরে বাহার দিয়ে বেড়ায়। কলকেতায় বোনের বাড়ি, সেখান থেকে কিনে আনায়।

...'সোয়ামীর সোয়াগে' দিন দিন আস্পদ্দা আরো বাড়ছে।

এই বৌকে যদি জব্দ করতে না পারত সামন্ত গিন্নী তো তার জীবনে ধিক।

'কী ভাবে জব্দ করতে হবে।

তা জানে না সামন্ত গিন্নী। শুধু তার স্বামীপুত্তরের গায়ে আঁচড়টি না লাগে। আকাশে ধুলো ছুঁড়লে আপন গায়ে এসে লাগে। তাই ওইটি বাদে। অনিষ্ট যদি করতেই হয়, তা তার বাপ ভাইয়ের হোক গে।

বৃন্দে জিভ কেটেছিল।

না গো না। বিন্দে ও কম্মে নাই। মানষের পেরাণ হানির মধ্যে নাই। কেন? বিন্দের ভাঁড়ারে কি ওষুধের অভাব? এই শেকড়টুকু নে যাও, যেমন করে পারো বৌয়ের মাথার বালিশের তলায় একে ছ্যাওগে, আতটুকু। অ্যাকটা আত।

সামন্তগিন্নী মুখ শুকিয়ে বলে, রেতে তো ছেলের সঙ্গে এক বালিশে মাথা মা! সোহাগের ছড়াতেই তো আছে—

'এক বালিশ দুই মাথা, আস্তে আস্তে কয় কথা।' তা ছেলের কিছু অনিষ্ট হবে না তো?

হলি আমি দিই?

বৃন্দে বলেছিল, শেকড়ে নাম বেঁধে থোবনি? বৌর নামডা বোলে যাও।

নাম মালতি।

মালুতি! ওঃ ফুলের নামে নাম? তাই বলি! হবেই তো। এই মেয়েছেলেরাই জাঁহাবাজ হয় মা। তুমি হিসেব নে দেকো।

তা যে যত জাঁহাবাজই হোক না কেন, বৃন্দের শেকড়ের কাছে সব ঠাণ্ডা।

শেকড়ের পরদিন থেকে বৌ আর মুখে 'রা' পাড়ে না। ঘাড় গুঁজে সংসারের কাজ করে, আর বাকি সময় আকাশ পানে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওদিক সামন্ত গিন্নীর ছেলের যেন মেজাজ গমগম। বৌয়ের দিকে সে আদরের চাউনি নেই, ছুতোয় নাতায় বৌয়ের ধারে কাছে ঘুরঘুর করা নেই। বুকটা ঠাণ্ডা সামন্ত গিন্নীর।

একজোড়া কানফুল হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, বিশ্বেস কর মা, গিল্টি না, খাঁটি গিনি ভেঙে গড়ানো। দিলাম তোমায়। তবে ছেলের এই ভাবটি যদি বরাবরের মতন বজায় রাখতে পারো, তা তোমায় রূপোর চুড়ি সেট গতিয়ে দেব।

বিন্দে তাতে রাজী হয়নি।

বলেছিল, বৌ তোমায় অমান্যি করেছেল, চোপা করেছেল মুখ ভোঁতা করে দিচি, ব্যস। দেকো আর কখনো গলা তুলি রা কাড়াবেনি। তবে চেরদিনের মতন সোয়ামী স্তীরির বেরহো বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবনি। পাপ নাগবে। পাপ পুণ্যি ধর্ম অধর্ম মেনে চলতে হয় বইকি।

তা নইলে মা উদ্দাণীর গোঁসা হবেনি?

তবে ক্ষেত্তোর বুঝে কম্মো।

মন্দ কাজেও মায়ের আদেশ নিতে হয়। পাওয়া যায় না তা নয়।

জমি নিয়ে মামলা মায়ে বৌয়ে। ত্রিভুবনে শুনেছে কেউ এমন কথা?

একমাত্র ছেলে, মা মরলে তো ছেলেরাই সব, তবু মামলাবাজি।

ছু' পক্ষই চুপি চুপি এসেছে পান সুপুরি হাতে।

মা বলে, মামলার দিন ছেলে যেন পড়ে পা মচ্‌কায়, কোর্টে যেতে না পারে। এক তরফা ডিগ্রী হয়ে যাক।

ছেলে বলে, মামলার দিন মার যেন পক্ষাঘাত হয় কোর্টে যেতে না পারে। এক তরফা ডিগ্রী হয়ে যাক।

বিন্দে বলল, না, চেরকাল জানি, কুপুত্তুর যোত্থাপি, হয়। কুমাতা কখনো নয়। তো মায়ের শরীরেই পক্ষাঘাত ছাও।

দিলো তো মা তাই।

অবিশ্যি খাটতে হয়েছে বৃন্দেকে। হোম যজ্ঞ, উপোস কবাস।

তবে মজা এই সেই মা মাগী কিন্তু পরে দূষলো না বৃন্দেকে। বলল, আমার কর্মফল। ভগবান হাতে হাতে দেখিয়ে দিল।···আর আরো মজা, সেই ছেলেই মাকে এমন সেবাটা করলো, যে পাড়ার লোক ধন্যি ধন্যি করলো। মাকে তুলে ধরে নাওয়ালো খাওয়ালো সব। সেও আবার বলল, 'পাপের প্রাচিত্তির করছি'। কত মানুষ, কত মুখ। কত চুপিচুপি সলা পরামর্শ। কত জনের কেঁদে পড়া। মেয়ে মানুষের জীবন যে বড় ছলনা বঞ্চনার। এই সব তুকতাক মারণ উচাটন বশীকরণ বিষকরণ না হলে তাদের চলবে কি করে?

স্বামী যদি অন্য মেয়েছেলেকে মন দেয়, বৌ বাঁজা বলে আবার বিয়ে করতে যায়, বছরে বছরে আঁতুড় ঘরে ঘুরে আসতে আসতে যদি দেহ ভেঙে যায়, বাচ্চা হয়ে হয়ে যদি না বাঁচে, তাদের গতি কি এই সব ছাড়া?

ডাক্তারকে বলতে যাবে?

ডাক্তারকে বলবার কথা?

তাছাড়া ডাক্তার ডাকতে হলে পুরুষের কানে তুলতে হবে না?

সকল কথা পুরুষের কানে তোলা যায়?

বৃন্দে যেন ভাবনার সূতোর গুলিটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, যত ইচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে সূতো খুলতে খুলতে। বড় বড় ঘরানাদের ঘয়ে

গতায়াত ছিল বৃন্দের, কতোই দেখেছে। কত লোভ, কত পাপ, কত নিষ্ঠুরতা, কত ভণ্ডামী, কত নির্লজ্জতা। বৃন্দের কাছে অনেক ইতিহাস।

বাঁড়ুয্যে কর্তার দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নী বৃন্দেকে এসে ধরে পড়ল, সতীনপো বৌটার যাতে জন্মের শোধ ছেলেপুলে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওমা। সি কি, জোয়ান মেয়ে, নতুন বে হয়েচে।

তা' হোক। ওর ছেলেপুলে হলেই তো আমার ছেলের ভাগীদার হবে? তোমায় আমি অনেক টাকা দেব।

বৃন্দে বলেছিল, টাকাতো আপনি আমায় দেবে মা, বলি পরকালে জবাব দেবার ভারটি নেবে কি? এত বড় অধম্মো ধম্মে সইবে?

ছোট গিন্নী মুখনাড়া দিয়ে বলল, তুমি আর ধম্মকথা কইতে এসো না বাছা। ক ত লোকের কত করছো। হওয়া ছেলে মেরে ফেলতে তো বলছিনে? যাতে না হয় তারই প্রতিকার চাইছি।

মনের অগোচরে পাপ নেই, লোভে পড়ে এ যুক্তিটা নিয়েছিল বৃন্দে। সত্যি এ তো আর মানুষ খুন নয়?

তা এ ওষুধ তো বৃন্দের হাতের মুঠোয়।

কতজনকেই সাপ্লাই করছে হরদম।

'কপাটবন্দী' গাছের বাকল, আর 'বিনষ্টি' লতার মূল, ওতো ঘরে মজুতই থাকে বৃন্দের।

অদৃষ্টের ফের!

আবার একদা সেই বৌ-ই এসেছে চুপিচুপি।

স্বামী না কি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে অনেক ডাক্তার বদ্যি করেছে, কাজ হয়নি। তো সে মানুষ নাকি মাদুলি কবচে বিশ্বাসী নয়, তাই বৌ তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি এসেছে।

দেখে মায়া হয়েছিল বৃন্দের।

পয়সার লালসে কাজটা করেছিল খুব খারাপ। কিন্তু আর তার হাত নেই। খোদার ওপর খোদকারি বারবার হয় না।···কে জানে, কোন পাপে বৃন্দের আজ এমন দুর্দশা।

আহা 'ভাল' 'মন্দ' দুই-ই তো করেছে বৃন্দে। তবে? পাপ পুণ্যিতে কাটাকুটি হয়ে যায় না? পয়সার লোভে অনেক অকর্ম করেছে বটে, অনেক পাপ। কিন্তু যারা করিয়েছে? তারা পাপী নয়? পাপের ফল তাদের ছোঁয় না?

ওইতো বাঁড়ুয্যে গিন্নী রামরাজত্ব করে সংসার করে ড্যাংডেঙিয়ে মরে গেল। বরং সতীনপো বৌটাই দুঃখে কষ্টে থেকেছে। সন্তান নেই, স্বামীও রইল না। তারপর চলেই গেল দেশ ছেড়ে বোনের বাড়ি, না ভাইয়ের বাড়ি।

কি দিয়ে তবে বিচার? বারুইদের মেজ বৌটা?

আপনার ছেলের মাথার দোষ কাটাতে, ননদের ছেলেটাকে পাগল করে দেয় নি?

বৃন্দে তো নিমিত্ত। প্ররোচনাটা কার?

সেই মেজ বৌয়ের কত বোলবোলাও। ইস্টিশানের ধারে তার সেই ছেলের কতবড় সিনেমা হল আরো এক ছেলে কলকাতায় বড়বাজারে দোকান দিয়ে 'লাল' হয়েছে, মেজকর্তা এখনো জ্যান্ত। বৃন্দের তবে কিসের পাপে এতো খোয়ার?

স্বেচ্ছায় ভালকাজই কি করেনি বৃন্দে?

দুলোর বাপ তখনো বেঁচে, একদিন হাসতে হাসতে এসে বলল, জগা বাউরি তো তোর অন্নো মারবে রে।

বৃত্তান্ত কি?

না, জগা কোথা থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছে।

জগার কী মদ্দগর্ব। বললো, তুই তো 'নিশিরডাক' ডাকতে শিকিস নাই, জগা সেডা শিকেচে।

বৃন্দে বলল, শিকুক। ওতো মানুষ মারা কল।

মানুষ বাঁচানোরও।

তা হোক। ওটা মহাপাপের কাজ।

তা একদিন সেই মহাপাপের কাজ চোখে পড়ে গেল বৃন্দেরই। বৃন্দের তো রাতে ভিতেই চরা। গেছিল মাঝরাত্তিরে কলাগাছের গায়ে

গুনছুঁচ বিঁধতে। কারু মন্দ করতে নয়, হিত করতেই। মুখুয্যে বাড়ির মেয়ের বিয়ে, মহা ঘটাপটার ব্যবস্থা। কিন্তু মেয়ে নাকি 'বাতুল'। যদি বিয়ের রাত্তিরে বৃষ্টিতে ভাসায়, এত আয়োজন পণ্ড হবে। তখনো তো জমিদার বলে কথা আছে, ওনারাই ছিল জমিদার। রসুনচৌকি বসিয়েছে সাতদিন আগে থাকতে। বরযাত্রীরা আসবে বলে, ইস্টিশান থেকে আলোবাতির মালা। ইংরিজি বাজনা মজুত। আর খাওয়ান দাওয়ানের কথা তো বাদই দাও।

বৃষ্টি হলেই তো সব লণ্ডভণ্ড।

তাই ওই কলাগাছের গায়ে গুণছুঁচ পুঁতে 'বিষ্টিবন্ধন'।

মাঝরাত্তিরে এলোচুলে ছুঁচ পুঁতে দিয়ে যাবে, যতক্ষণ না বৃন্দে নিজে এসে সে ছুঁচ টেনে তুলে ফেলে দেবে ততক্ষণ বৃষ্টির সাধ্যি নেই যে নাবে।

তবে গাছের এমন ঠাঁই পুঁততে হবে, যাতে কারো চোখে না পড়ে। মুখুয্যেদেরই কলাবাগান। সেখান থেকে চলে আসছে কাজ সেরে, দেখে জগা চলেছে হনহনিয়ে।

বৃন্দেকে দেখে বাঁশঝাড়ের গা ঘেঁসে ঘেঁসে হাঁটছে।

কিন্তু সেই এক লহমাতেই তো বৃন্দে যা দেখবার দেখে ফেলেছে। বৃন্দের শ্যেন দৃষ্টি। জগার হাতে একটা মুখকাটা ডাব। বাঁ হাতের তেলোয় বসিয়েছে, ডানহাতে কাটা মুখটা চেপে ধরেছে।

এলো চুল জড়াতে ত্বর সয়না, বৃন্দে ছুটে আসে। 'কার সববোনাশ কত্তে যাচ্ছিস রে লক্ষীছাড়া?'

জগা শিউরে উঠে বলল, ছুঁসনে ছুঁসনে। খবরদার।

তারপর বললো, সববোনাশই বা কেন? সুবকাজেও। ছাড় বিন্দেদি, দাঁড়ানো চলবেনি!

বলি রক্কেটা হচ্চে কার?

নবীনবাবুর শালার মেয়ে। কলকেতা থেকে এয়েচে। ডাক্তার বদ্যি হার মেনেচে, নবীনবাবুর পরিবার তাই ভাই-ভাজকে আনিয়েচে রুগী মেয়েরে নে। সেই ছুঁলি বিন্দে দি? দোহাই তোর ছেড়ে দে। ছুঁড়িটা খাবি খেতেচে—

হুঁ। বড় দরোদ। অনেক ট্যাকা কবলেচে বোধ হয়?

তা ওগডা কী?

ওগ্ অক্তচোষা। শরীলের সব অক্ত ভম্মোকীটে শুয়ে নেচ্চে—ও বাঁচবেনি।

বৃন্দের অমোঘ স্বর।

সেকতা তুই আমি বললি তো হবে না। বাঁচিয়েই ছাড়বে।

এক সন্তান?

বেটাছেলে আচে তিনটে চাট্টে, বেটিছেলে ওই এ্যাকটাই বটে। পয়সার আঁদিবদি নাই, বলে আজার আজত্বি দেবে, যদি মেয়ে বাঁচে। হাতডা ছাড় বিন্দে দি—

'মেয়ে' শুনে বৃন্দের মন থেকে অনেকখানি মূল্যবোধ ঝরে পড়েছিল, তায় আবার শুনল বেটা আছে তিন চাট্টে, বৃন্দে আরো শক্ত করল হাতের মুঠোটা।

বলল, পয়সার গরম। তাই মহাপাপেও ভয় নাই। বলি ডাবের খোলের মত্তি করে পেরাণ পাকিটা পুরে নে যাচ্ছিস?

জগা বলতে রাজী নয়, বৃন্দেও ছাড়বে না।

শেষতক্ জগা বাউরি শাসাল, দণ্ডো পার হলি, কাজ হবেনি, একুল ওকুল দুকুল যাবে। বেশী 'এ' কল্লে ভাল হবে নি বলচি।

বৃন্দের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

কী বললি জগা? বিন্দেকাওরাণীকে তুই ভাল হবেনি দেকাতে এইনিচস? এক ফোঁট্টা ছেলে, এই সেদিন ও কাঁকালে খুনশি বেঁদে উদোম হয়ে আস্তায় ঘুত্তে দেকেচি। বিন্দেকে শাসানি? বল বলচি, কার সরবোনাশ কল্লি? নইলি হাত মুচড়ি পটকে দিবো।

জগার অবস্থা বেপোট।

দুটো হাতই বন্দী। আবার সেই হাতেরই কব্জি বৃন্দের কবজায়। অগত্যা বলে ফেলতে বাধ্য হয়।

শুনে শিউরে ওঠে বৃন্দে।

অ্যাঁ কী বললি? হরিকুমোরের ওই হারামরা একমাত্তোর ছেলেডা?

জগা কাতর বচনে বলে, ওস্তাদ বলে থুয়েচে একমাত্তোর না হলি, এ কাজ হবেনি।

হবেনি। তাই তুই বড় মানসের ঘরের একটা পোকায়কাটা বাতুড়চোষা ছুঁড়ির জন্যি, ওর জলজীয়ন্তো ব্যাটাটাকে হত্যে করচিস? ভাল চাসতো, অ্যাকনো ভাবের মুক ছেড়ে দে জগা।

ছেড়ে দেব?

জগা হাপসে পড়ে।

কতো চেষ্টায় কতো সাদোনায় ঘটানু। অ্যাখোন তুই বলচিস—

বলচি।

বৃন্দে আবার অমোঘ স্বরে বলে, আমি বলচি ও মেয়ে বাঁচবেনি। আজ তুই বাঁচাবি, কাল আবার মত্তে পড়বে। অ্যাখনো সেময় আচে জগা, হরির ছেলেডার পেরাণডা ফিরিয়ে দে।

জগা তখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়, ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি সে জানে না।

জানে না অবশ্য বৃন্দেও।

একাজের শিক্ষাটা নেই তার। তবু শুনেছে ঢের।

তাই কড়া গলায় বলে। পেরাণডা শুধু নিতি জানলিই হয়নারে জগা, দিতি জানতিও হয়। ওই ডাবের জলটুকুন অ্যাখোন ওই কুমোরের বেটার মুকেই ঢালগে যা।

ওবাবা। আমায় পুলিশে দেবেনি?

দেবে, জেল খাটবি। না দিলি, তোরে আমি ফাঁসি দেওয়া করাবো, তা' কয়ে আকচি।

॥ ৪ ॥

শুনেছিল জগা তার কথা।

তবে বৃন্দে সঙ্গে গিয়েছিল।

ম্যানেজ করেছিল, মায়ের 'স্বপ্নাদেশের' গল্প বানিয়ে। তারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা তখনও বিপদ টের পায়নি। ছেলে

ঘুমোচ্ছে না ঘুমোচ্ছে। আট দশ বছরের ছেলে, কাঁথায় শোওয়া তো নয় যে, মা রাতে উঠে দেখবে।

ছেলের চেহারা দেখে মনে মনে হেসে ফেলেছিল বৃন্দে। অঘোর ঘুম ঘুমোচ্ছে ছেলে, যেমন কে তেমন। তার মানে কিছুই শেখেনি জগা।

বৃন্দে দরজার শেকল নেড়ে দোর খুলিয়েছিল, জগা বাইরে দাঁড়িয়েছিল ডাব হাতে। বৃন্দে বেরিয়ে এসে চুপিচুপি বলল, ডাবে দরকার নাই, তুই পালা, আমি পরে যাচ্চি।

হরিকুমোর দেবতুল্য ভক্তি করে বৃন্দেকে, কাতর হয়ে বলল, স্বপন দেকে ছুটে এয়েছে মা। তোমার দয়ার শেষ নাই। তো কী স্বপন দেকলে মা?

কিচু না বাবা। যেন কানে শুনন্নু 'হরির ঘরে যা দিকিন অ্যাকবার। মন নিচ্চে কেউ অনেষ্টর তালে আচে। তাই ছুটে এন্নু।'

এই মাজ রাত্তিরে। মাগো তোমার গরীব ছেলে, কী শোদ দেবে?

শোদ?

বৃন্দে হেসেছিল, তোদের ভক্তি ভালবাসাই আমার শোদ বাবা। বসে থেকেছিল আরো খানিকক্ষণ। হরির বৌকে বলেছিল পান খাবো বৌমা।

বাইরে আসার পর জগা ধরল, এডা কী হল বিন্দেদি?

হলো?

গল্পবানাতে ওস্তাদ বৃন্দে বলল, দেকন্নু ছেলের গতিক তো সুবিদের না। অ্যাখোন যদিই টেঁশে যায়। তো তোর আমার দুজনার হাতে হাতকড়া পড়বে। বলবে মাজ আত্তিরে দুয়োর ঠেঙিয়ে ছেলেকে তুক করে মেরে ফেললো। তো মায়ের শরোন নিন্নু। হাতচালা, ঝাড় ফুঁক, মন্তোর তন্তোর—ছেলে চোখ মেলল দেকে, তবে এন্নু।...

জগা মলিনমুখে বলল, ওদের কী জবাব দিবো?

কেটে পড় গা। দু'চাদ্দিন গা ঢাকা দে থাকগে যা। নবীনবাবুর শালা তো আর চেরকাল বোনাই বাড়ি থাকবেনি ?

ট্যাকা খেয়েচি—

খেয়েচিস, ফেরত দেগা যা। বলবি—ওষুদ খুঁজতে ওস্তাদের কাচে গেচনু—

ট্যাকা ফেরৎ দিবো ?

দিবি !

নিবে না।

বৃন্দে চোখ টিপে বলে, বড় মানুষ তো! অ্যাকোন শুনবে তুই ওষুদ খুঁজতে গেচলি, আর মেয়ে নিকেশ হয়ে গ্যাচে শুনি ট্যাকা ফেরৎ দিতি এইচিস, ত্যাখন বলবে ওতে দরকার নাই।

তাই বলতেচো।

বলতেচি। তোর আসার অনেক আগে পিথিবিতে এইচি—

তদবধি জগা বাউরি বিন্দের প্রতিপক্ষ না হয়ে মান্যভক্তিই করতো। আসল কথা তো ফাঁস করেনি বৃন্দে। 'নিশিরডাকে' মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে এলো, এই কথাই জেনেছে জগা।

কিন্তু সে বৃন্দে কোন বৃন্দে ?

সে কি এই নখদন্তহীন বিন্দে বুড়ি ?

বিধবা ব্যাটার বৌয়ের সংসারে পরের দাবড়ানি খেয়ে যে বুড়ি নিজের উঠোন থেকে পালিয়ে আসতে পথ পায় না ? আর লোকে যাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

সকল শক্তি হারিয়ে ফেলল বৃন্দে কোন ফাঁকে ?

সকল শিক্ষেদীক্ষে ভুলে গেল কী করে ?

আঃ, ওই বজ্জাতটাকে যদি বিন্দি একখান বাণ ঝেড়ে বোবা কানা করে দিতে পারতো। দূরে থেকে বাণ মারার ইতিহাসও তো আছে।

বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছ, বুদো গয়লার ক্ষেপে যাওয়া মোষটা, লরিগাড়ি কামারনীর লক্‌লকে বেগুন ক্ষেতটা, হাড়পাজী তুগ্‌গা তেলিনীর তুধেলা ছাগলটা, এরা সব বৃন্দের বয়েসকালের শক্তির সাক্ষী।

'মা উদ্দানী চোন্‌ডি, তোর নামডা পর্য্যন্ত বিস্মরোণ হয়ে যাই মাজে মাজে। কিন্তুক লোকে আমারে ছাড়ালো ক্যানে মা? কী অপোরাদ কন্নু তোর কাচে। লোকে যে কেন ছেড়েছে, সেই তথ্যটিই জানে না বৃন্দে। বৃন্দেকে তো কেউ বলতে আসেনি—তোরই বা টগর বলে গেছে·বিন্দে আগে নিজে 'মন্দটি করে, তবে তারিনীমূর্তিটি ধরে ভাল করতে বসে। নিজে 'নজর' দিয়ে পরে নজর ছাড়ায়। নিজে ভূতে ধরিয়ে পরে ভুত তাড়ায়। নিজে ডান চুষে' পরে ঝাড়ান কাটান করে। এতদিনে তোর স্বরূপ জানা গেছে।'

না, বলে কেউ যায়নি।

অনঙ্গ ডাক্তার একদিন বলেছিল রাগ করে সব ফাঁস করে দেব। কোথায় ফাঁস করেছে কে জানে। বৃন্দের কাছে নয়।

ভিতরে ভিতরে ভাঁওতা আছে।

এখনো আছে। জানে, ভাল করতে না পারুক, মন্দ করতে পারে এখনো।

বসে থাকতে থাকতে বৃন্দের পেটের ভিতরটা জ্বালা করে উঠে। খিদের চোঁয়ান নাড়িতে ছাতু আর কাঁচালঙ্কা বিষ হয়ে ওঠে। বৃন্দে এই সময় ভাত ফোটার গন্ধ পায়।

টগরের রান্না ঘর থেকে বাতাসে ভেসে আসে।

ভাত ফোটার, খেঁসারি ডাল ফোটার আর কাছিমের মাংস সেদ্দর।

কিন্তু ওই রান্নাঘরটা কি টগরের?

বড় সাধ করে হাঁড়ি মাচান বসিয়ে বসিয়ে ধাপি গেঁথে গেঁথে বানিয়ে দেয়নি তুলোর বাপ বৃন্দের জন্যে?

বলেছিল—অ্যামন রান্নাশাল বানিয়ে দিনু তোকে, যে রানতে রানতে আর উটতে হবেনি। হাতের মাতায় সব পাবি। তুলোর

গোড়ায় কাট খসি রাকতে এই এট্টু মাচান পয্যোন্তো বানিয়ে দিচি। নে কতো রাঁদবি রাঁদ।

খেতে ভালবাসতো, এনেও দিত তেমনি।

তখন তো ওই পাপিস্টি এসে ঘরে ঢোকেনি, দুলো মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরত। দুলো জল এনে দিত, মশলা পিষে দিত মাছ কুটে দিত। আর আহ্লাদে ডগমগ বৃন্দে বাপবেটায় ভাত বেড়ে ডাক দিত আয়। খাবি আয়। পেট জ্বলে না?

॥ ৫

পেট 'জ্বলা' কি জানিস, তা' কী জানতো বৃন্দে? জানত না তবু বলতো। আর এখন?

জ্বলা পেটটা গামছার বিঁড়েয় চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বৃন্দে। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে। ওই ভাত ফোটার ডাল ফোটার মাংস সেদ্ধর গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

কবে একদিন, ওই শয়তানের বেটাটা কোথায় গিয়েছিল, বৃন্দে তাই সাহসে ভর করে এই দাওয়া থেকে নেমে, ফনীমনসার বেড়া ডিঙিয়ে ওই টিপ্‌কল বসান উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, অ জবা! জবা! শোন একবার।

সেজ নাতনীটার নাম জবা।

বড়টার মতন অত হারামজাদা নয়। সেটির নাম পদ্ম। বৃন্দে বলে, 'শুদু পদ্মো না। পদ্মো কাঁটা।' তা জবা এসে দাঁড়িয়েছিল, কী?

বলতেচি, তোর মা কী আঁদবে র‍্যা বড় খাশা খোশবো বেইরেচে। কাচিমের মাংসো বুজি?

জবা বলেছিল, হুঁ।

তো আমায় এট্টুখানি দিতে বল্ না। এট্টু মালাখোলা যাতি হোক।

বেরিয়ে এসেছিল পদ্ম।

হেঁকে বলেছিল, বুড়ি কি বলতেছে র‍্যা জবা ?

জবা ঢোক গেলে বলেছিল, মা মান্‌সো রাঁদতেছে তাই এট্টু চাইতেচে।

অ্যাঁ কী বললি ? মান্‌সো চাইতে এসেচে। বুড়ির যে দেকি বড়ো নোলা। বলে দে মান্‌সো অ্যাতো সসতা না।

তবু মান খুইয়ে বলেছিল বৃন্দে, এট্টু দিলি কী তোদের অ্যাতো কমতি হবে। এ্যাতো খাবনা ভাতের উপুর অ্যাক হাতা ঢেলে দে' দে না নক্কীসোনা।

নক্কীসোনা। জবা হেসে পালিয়ে গিয়েছিল।

আর ঘরের মধ্যে থেকে সমবেত হাসির আওয়াজ ভেসে এসেছিল, নোলাদাগীবুড়ি। অ্যাখোন নক্কীসোনা বলতে এয়েচে। পাঁশ কেটে কেটে থুচ্চে আতদিন। যা বেরো। খৈরান নিয়ে নিয়ে নজোর দিতি আসবেনি বলচি। পদ্ম, জবা, ঘেঁটু, তিন ফুলের মুখেই তখন হাসির ধূম।

টগরের গলা শোনা গেছল, নজোর নাগা দব্যি পেটে সইবেনি পদ্মো, নোক চিমটে এট্টু তুলে নে পাঁদাড়ে ফেলে দে আয়। ফের এখোন মাতা গলাতে এইচিস বুড়ি ? হায়া নাই ? নাজ নাই ? যাঃ। যাঃ।

যেন বেড়াল কুকুর তাড়াচ্ছে।

তা মরে মরে পুরানো চেনা পরিচিত বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেও তো এমনি। যাঃ যাঃ করে অবিশ্যি বাড়িগুলোই পরিচিত, মানুষগুলো সবই অচেনা অপরিচিত হয়ে গেছে। একদিন সামন্তবাড়ির দরজায় লাঠি ঠুকে ঠুকে গিয়ে জিগ্যেস করেছিল একটা ছোটমেয়েকে, তুমার নাম কী গো ? তুমার বাপের নাম কী গো ?

তো মেয়েটা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, মা, মা, একটা ডাইনী বুড়ি আমায় নজর দিতে এসে কী বলচে সব।

টগরের রান্নাঘর থেকে—

ভাত মাংস চাইতে যাওয়ার দিনকে ঘরে ফিরে এসে বৃন্দে তার 'চণ্ডীর কুলুঙ্গীর' নীচে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকে বলেছিল, মা তুই যোদি সত্যের হোস্ আর বিন্দে যোদি তোর কন্যে হয়, তো এই আতের মধ্যেই ওই হারামজাদির য-পুরী একগাড়ে হয়ে মরে কাট হয়ে থাক। না যোদি হয় তো তোকে টান মেরে ওই পানা পুকুরে বেসজ্জন দে দেব।

মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু দুঃসময়ে ইষ্টও বিমুখ হয়।

একদা যে দেবী বৃন্দের একডাকে সাড়া দেচে 'থানে' থেকে কত কানে নেচে, সেই দেবী বৃন্দের কালশিটে পড়ে যাওয়া ঢিপি কপালের দিকেও নীরবে তাকিয়ে বসে থাকে। ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চোখ দুটো তো আবছা অন্ধকারে বিভীষিকার মত জ্বলে। চোখ তো জ্যান্ত।···

তবু—

পরদিন সক্কালেই টগরের ঘর থেকে হাঁসের ডিম ভাজার সুগন্ধ ভেসে আসে। তার মানে এখন সব কটায় মিলে চা খেতে বসবে। লক্ষ্মীছাড়াটা রাতে ফিরেছে মনে হচ্ছে। লোকটা হাঁস চাষ করে, ঝুড়িঝুড়ি ডিম বাজারে বেচে আসে। আবার বাড়িতেও ঝুড়ি ভর্তি। যার যখন ইচ্ছে হচ্ছে ভোজ খাচ্ছে, সেদ্ধ করে খাচ্ছে।

পদ্মতো কাঁচাই মেরে দেয় কত সময়। পদ্মর প্রাণের পুতুল বেড়ালছানা 'মিশকালী'ই বোধহয় দিন দুটো চারটে খেয়ে পার।

এতবড় নিষ্ঠুর বেইমান হতে পারে মানুষ?

মাঝে মাঝে যে অবাক হতে হতে পাথর হয়ে যায় বৃন্দে।

বৃন্দেরই সর্বস্ব গ্রাস করে বসে আছে, অথচ বৃন্দেকে কুকুর বেড়ালের মত দূর দূর করা। কুকুর বেড়ালকেও মাছ ভাত মেখে মেখে, 'আয় আয়' তুতু করে ডেকে খাওয়ায়। হাঁস মুরগীকেও খেতে দেয় আর বৃন্দেকে খিদের জ্বালায় পেটে গামছা বেঁধে ঘুমোতে হয়।

দিনে দুটো ভাত ফুটিয়ে খায় বটে,—দুটো পান্তা রেখে দিলে চলে কিন্তু বুড়ো হয়ে এক মরণ হয়েছে, পান্তা খেলেই পেট ভাঙবে, বমির উপর বমি।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কি আবার কাঠ কুটো জ্বেলে ভাত ফোটাতে বসতে পারে? জল আনতে হবে সেই পুকুর থেকে। ছোট্ট কলসীটাকে গামছায় বেঁধে ঝুলিয়ে বড় জোর দু'বার আনতে পারে, সে আর কতটুকু? ভাত রাঁধতে জল লাগে। ছাতু খেতে লাগে না।

দুলো মাকে 'ডাইনী' আখ্যা দিয়ে আলাদা করে দিয়েছিল বটে, তবু যতদিন বেঁচেছিল, বড় মেটে কলসী করে দু'এক কলসী জল এনে দিতো। তা' বৃন্দের কপালে তাও ঘুচল।

জগতে একটা ভাল লোক আছে এখনো, তাই ওই একবেলার ভাতটুকুও জোটে, সন্ধ্যেয় মাৎগুড় চালভাজার গুঁড়ো, ছাতু তেল নুন। লোকটা হচ্ছে সত্য মুদি।

মুদিখানাটা তার বড় নয়, তবে মনটা বড়।

আর ওই একটাই লোক যে বৃন্দেকে ভয় পায় না, ডেকে কথা কয়। অবিশ্যি ভয় পাবেই বা কেন? তিনকুলে আছেটা কে তার? যার জন্যে ভয় তরাশ? একদা সত্যর একটু উপকার করেছিল বৃন্দে।

সত্যর বাপের দোকানটা উঠে যাব যাব হয়েছিল, সেই সময় দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বৃন্দে।

তখন দুলোর বাপ মারা গেছে সবে, মন প্রাণ উদাস, সেই সময় বৃন্দে মুখুয্যে বাড়ি থেকে পাওয়া সেই দশ ভরির সোনার হার ছড়াটা দিয়ে দিয়েছিল সত্যকে। বলেছিল, এটা থেকে তুমি দোকানটা ফের তোলো।

সত্য ভয়ে ভয়ে বলেছিল, তোমার ছেলে জানতে পারলে, আমায় পুলিশে দেবে যে গো—

ক্যান্? মাগনা?

বৃন্দের যুক্তি এ তার নিজের পাওনা জিনিস। দুলোর বাপের দেওয়া তো নয়।

তা ছাড়া—জিনিষটা যে আছে, সেটা টের পেলেই তো হতভাগা মুখপোড়া ছেলে বলে কৌশলে যে করেই হোক্ ওটা বাগিয়ে নিয়ে ওই সোহাগের বৌকে পরাবে। নচেৎ বৌ সর্বনাশীই কোন ফাঁকে চুরি করে নেবে। তার থেকে সত্যর দোকানটা জ্ঁাকুক।

সত্য না হয় অসময়ে বুড়িকে দুটো ভাতের ব্যবস্থা করবে। মনে জানবে দোকানের আয়ে বিন্দেরও কিছু ভাগ আছে।

কিন্তু বলেছিল বলেই কি, সে কথা রাখবে সত্য, এমন ভরসা থাকার কথা নয়। দুনিয়াটাকে তো দেখছে বৃন্দে। না দিলেই পারতো। খেদিয়ে দিলেই পারত। বলতে পারত তুই যে সাহায্য করেছিলি, কে তার সাক্ষী আছে?

কিন্তু তা করে না সত্য।

দৈনিকের খাদ্যটা জোগান দিয়ে যায়।

একসঙ্গে দেবে কি? কে সামলাবে ইঁদুর আরশোলা? কখন হাত পা লেগে পড়ে যাবে। রোজের রোজ চারটি চাল একটু নুন, নারকেল মালায় একটু সরষের তেল, আর কাগজের ঠোঙায় একটু ছাতু আর মাটির ভাঁড়ে একটু মাৎ গুড়।

ওই সত্যর সঙ্গেই যা দুটো কথা।

বৃন্দে বলে, আরজন্মে তুমি আমার বেটা ছিলে বাপ।

সত্য বলে, ও কিছু না। ও কিছু না।

লাজুক আছে লোকটা।

আসলে লোকটা ভালই।

প্রশংসায় লজ্জা পায় এমন লোক তো এযুগে বিরল। আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, নিজেই নিজের ঢাক পেটাবে এযুগে এটাই তো স্বাভাবিক। সত্যচরণ তা হলে এ যুগের মত নয়। সত্যচরণের আত্মপ্রশংসায় লজ্জা, সত্যচরণের একদা উপকার পাওয়ার বদলে চিরকালের কৃতজ্ঞতা। এটি না থাকলে বৃন্দেকে তো নির্ঘাৎ

এতদিনের দুর্ভিক্ষের মড়ার মত চিমড়ে চিমসে মরতে হতনা !

তা'ছাড়া ওই দশভরি সোনার হারটার জন্যে কৃতজ্ঞতার সমীহ সম্ভ্রম যা ছিল তা তো ছিলই আর ছিল বিস্ময়ের সম্ভ্রম।

বৃন্দের হারান প্রাপ্তির মূল উৎসের ইতিহাসই সত্যকে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নম্র করে রেখেছিল। সত্যচরণ যে পেয়েছিল, তার মূলে বৃন্দের শুধু যে বদান্যতাই ছিল তা' তো নয়, স্বার্থও ছিল। পষ্টাপষ্টিই তো বলেছিল বুড়ি, ঘরে থাকলি তো ওই বৌ হারামজাদি চুরি বাটপাড়ি যে করে হোক হাতিয়ে নেবে। এ তবু জেয়ান হবে সত্যর দুকানে বিন্দের কেচু অংশো রইলো বিন্দের অসময়ের জন্যি। অতএব এটা এমন কিছু মহত্বের নয়। আশ্চর্যেরও নয়।

আশ্চর্যের হচ্ছে বিন্দের হারটা পাওয়ার কারণ।

দেখে রোমাঞ্চ হয়েছিল সত্যর বিন্দেমাসি মুখুয্যেকর্তার মরে যাওয়া নাতিটাকে মন্তরের জোরে বাঁচিয়ে তুলল।

সত্য তো দেখেছিল নিজের চোখে।

॥ ৫ ॥

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠির সকালে মা দশভুজা যখন দালান আলো করে বিরাজমান, তখন কিনা রোল উঠল, রাতের মধ্যে কখন কর্তার তিন বছরের নাতিটা মরে তক্তা হয়ে আছে। মা ওঠাতে এসেছে নতুন জামা পরিয়ে কলা-বৌ নাওয়ানের সঙ্গে পাঠাবে বলে। বার উঠোনে ঢাকী-ঢুলিরা সেইমত ড্যাডাং ড্যাং করে ঢাকে কাঠি দিয়েছে, ঠাকুর দালানে নবপত্রিকার তোড়জোড়, হঠাৎ এই নিদারুণ সংবাদ।

থেমে গেল বাজনা বাদ্যি, উঠলো কান্নার রোল।

কর্তা উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে দালানে উঠে প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে করতে চীৎকার শুরু করে দিলেন, বল সর্বনাশী। বল কেন এমন কাজ করলি ?

ইতিমধ্যে অন্যান্য জ্ঞাতির পাঁচ বছরের ছেলের মৃত্যু অশৌচ, ক'পুরুষ পর্যন্ত লাগে। পূজোর দিনগুলো তো তা হলে গেল। আর বলাবলি করছিল, ভয়ঙ্কর একটা কোনো অপরাধ ঘটেছে।

কিন্তু মা কি এমনই প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন ?

শাস্ত্রে পুরাণে অবশ্য দেখা যায়, দেবদেবীরা মানুষের থেকে অনেক বেশী প্রতিহিংসার পরায়ণ, তাই বলে মা দুর্গা ?

এই মুখুয্যে বাড়ির ঠাকুর দালানে যিনি তিনপুরুষ ধরে পূজিত হয়ে আসছেন ত্রুটিহীন আয়োজনে, চ্যুতিহীন নিষ্ঠায়।

ডাক্তার এসে তো রায় দিয়ে গেল।

কিন্তু ইত্যবসরে যে কে বা কারা, হয়তো বাড়ির ভৃত্যকুল, ডেকে নিয়ে এসেছে 'গুনীন্‌মাকে।

গুনীন্‌মার তখন ভাগ্যরবি মধ্যগগনে। এই মানুষই তো এই ক'বছর আগে বাদুলে মেয়ে দিদিমনির বিয়েতে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি বন্ধন করেছিল। এ বাড়িতে বৃন্দের বরাবরই আসা যাওয়া।

বাসিমুখে ছুটে এসেছিল বৃন্দে।

কিন্তু নিজেই জানে না বৃন্দে কী হয়েছিল।

আজ পর্যন্তই জানে না।

সেদিনের ঘটনা তার কাছে চির রহস্যাবৃত।

বৃন্দে জানে না সে কী করেছিল, তবে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা দেখেছিল, ঠাকুরদালানের নীচের বিরাট উঠোনের মাঝখানে খড়ির গণ্ডিকাটা খানিকটা জায়গার মাঝখানে বড় বড় ক'খানা আঙ্গুট কলাপাতার উপর শোওয়ানো সেই মৃতদেহটার ধারে মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হয়েছিল বৃন্দে, আর সেই খড়ির গণ্ডি ঘুরে ঘুরে একটা মেটে কলসী ভরা মন্তরপড়া জল থেকে আঁজলা ভরে ভরে ছেলের মুখে গায়ে আছড়ে আছড়ে মারছিল।

গুনীনমা যে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে একাজ করছে, দর্শকরা অনুভব করছিল। সেই অনেক দর্শকের মধ্যে সত্যচরণও একজন ছিল। যুবক সত্যচরণ।

অবিশ্বাস আর উত্তেজনা, এই ছিল দর্শকদের মধ্যে।

ছেলের তরুণী মা কোথায় কোনখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল কেজানে, যুবক বাবা ঠাকুর দালানের নীচের সিঁড়িটায় দু'হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে বসেছিল, আর ঠাকুরদা প্রতিমাকে ঠেলে নড়াতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে এসে উঠোনে এই দৃশ্যের ধারে এসে বসে পড়েছিলেন। শুধু ঠাকুরদা, মুখুয্যে গিন্নী স্থির হয়ে চোখবুজে বসে জপ করে যাচ্ছিলেন। এতোলোক জমা হয়েছিল, এবং বিশেষ কারো মধ্যেই বিশ্বাসের ভাব ছিল না তবু জায়গাটা নিঃশব্দ নীরব ছিল। কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করছিল না।

শুধু মাঝে মাঝে গুনীনমার তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার মা! মা!··· ক্রমশঃ গলাটা ভেঙ্গে আসছিল।

বাড়ির বাইরে অনঙ্গ ডাক্তার কিছু লোকের কাছে বলছিল আর কতক্ষণ এ ফার্স চলবে? এবং যে বড় ডাক্তার 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বৈঠকখানায় বসে 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' লিখে বিরক্ত চিত্তে বসেছিলেন কর্তাদের কাউকে দেখতে না পাওয়ায়।

হঠাৎ কী একটা ঘটল কে জানে।

তুমুল একটা কলরোল যেন আকাশ ছাপিয়ে অসীম শূন্যলোককে বিদ্ধ করল! ওটা সমবেত কণ্ঠের একটা জয়ধ্বনি।

হয়ত তার ভাষাটা ছিল, 'জয় মা'।

তবে সেটা বোঝা গেল না, শুধু ধ্বনিটাই পরিব্যাপ্ত হল।

কী হল?

চমকে উঠল ডাক্তার, আর অনঙ্গ ডাক্তার!

চমকে উঠল জনতা।

কী ঘটলো? আরো কোন অভাবনীয় মর্মান্তিক?

যিনি দশভূজা প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন

আর দেবীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করছিলেন, তিনি কি তাঁর সেই মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ প্রাণ হারালেন ?

অথবা—তরুণী মা ভাগ্যের এই অন্যায় আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে—এগিয়ে এলেন তাঁরা। এগিয়ে এসেছে তারাও, যারা এতক্ষণ যাকে বলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়েছিল, আর এখন 'জয় মা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

এখন চীৎকার ধ্বনিটা হচ্ছে—চোখ চেয়েছে। চোখ চেয়েছে।

এই অবিশ্বাস্য শব্দে চকিত হয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে এল ছেলের দিশেহারা বাপ। আর ঘর থেকে উন্মাদিনীর মত এলোকেশ হয়ে বেরিয়ে এল মা।

কিন্তু এখন বিপদ।

ছেলেটাকে চোখ চাইয়ে, 'গুনীনমা' কি নিজে চিরদিনের মত চোখ বুজল ? খড়ির গণ্ডির ধারে ঠিক মৃতের মতই তো পড়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

ততক্ষণে ছেলে শুধু চোখই চায়নি, উঠে বসতেও চেষ্টা করেছে।

কোন অপদেবতাকে মড়ার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল না তো ? বলেছিল কেউ কেউ, যার মধ্যে অনঙ্গ ডাক্তার প্রধান। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ঘটনা যারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নয়, তারা কিন্তু এ কথাটা বিশ্বাস করছে। মৃতদেহে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব।

এমন কি এও মনে মনে ভেবে নিল কেউ, 'আচ্ছা পরে ছেলের ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যাবে।'

আর বড় ডাক্তার এখন বললেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে এরকম রোগের আছে, যাতে রোগীর দেহে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে ওঠে।

ডাক্তার সেটা চিন্তা করছিলেন এতক্ষণ।

যাক এখন ছেলেকে ভাল করে ঢাকাঢুকি দিয়ে বিছানায় শুইয়ে

দেওয়া হক। যে ভাবে ঠাণ্ডা জল আছড়া দেওয়া হয়েছে, নিউমোনিয়া হতে কতক্ষণ ?

অনেকক্ষণ পরে বৃন্দেও উঠে বসেছিল।

ছেলেটাকেও বসিয়ে রাখা হয়েছে ঠাকুরমার কোলে। ভিতরে নিয়ে চলে যাওয়া হয়নি বৃন্দের মুর্চ্ছাভঙ্গের আগে।

মুর্চ্ছাভঙ্গের পর বৃন্দে না কি ছেলেটাকে বসে থাকতে দেখে, হাউ হাউ করে কেঁদেছিল।

কে জানে কিসের এই কান্না।

বৃন্দেকে পাটের শাড়ি পরিয়ে গালচের আসনে বসিয়ে গলায় জবার মালা দিয়ে, কর্তা-গিন্নী দুজনে রীতিমত পূজোই করেছিলেন বলা যায়। অথবা এ যুগের ভাষায় সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করেছিলেন। অতঃপর মুখুয্যে গিন্নী তাঁর নিজের গলার দশভরির গোট হারখানা খুলে বৃন্দের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। কর্তা একখানা ফুলগিনি দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। আর বৌ বাক্স খুলে পূজোর কেনা নতুন রেনারসী একখানা নামিয়ে দিয়েছিল বৃন্দের পায়ের কাছে, ছেলে দিয়েছিল একগোছা নোটের তাড়া।

যে যেখানে ছিল নাটকের শেষ অবধি দেখেছিল।

যারা 'অপদেবতা' চালানের সন্দেহ পোষণ করছিল, তারাও ছেলেকে স্বাভাবিক কথা কইতে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

সত্যচরণ ছিল সেখানে, কিন্তু সেই দলে নয়।

অভিভূতর দলে।

তা' তাও ছিল বৈকি কিছু। এমন দৃশ্যে অভিভূত হবে না। আর ব্যাপারটা তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। সাগর পুকুরের লোক তখন একেবারে অবিশ্বাসী হয়ে যায়নি।

তখন এই—

ঘটনার পর থেকে বৃন্দের বোলবোলাও যাকে বলে টপে উঠেছিল।

॥ ৭ ॥

ঢুলোর বাপ দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেছিল।

সে তো অচ্ছুৎ! সে তো আর পাঁচটা ভদ্রলোকের গায়ে গা দিয়ে দাঁড়াবে না। দূর থেকে দেখছে বৃন্দেকে মালা গলায় দিয়ে পাটের শাড়ি পরিয়ে কর্তা গিন্নী ছেলে বৌ সবাই প্রণাম করছে।

কী রোমাঞ্চ!

কী অদ্ভুত আবেগ উল্লাস!

বৃন্দে ঘরে ফেরার পর বোকাবোকা গলায় বলেছিল লোকটা, এখন তোর গায়ে হাত দিতি আমার ভয় নাগচে। মন নিচ্চে তোতে বুজি মা 'রুদ্দানী চোণ্ডীর' ভর হইচে। তো কেমন করি কী কল্লি বল দিকি?

বৃন্দে বলেছিল, আমার বোদ নাই।

আজ পর্যন্তও বোদ নাই।

তা' বোধ নেই বোধহয় সত্যচরণেরও।

নইলে বৃন্দের ছেলের বৌ যখন বৃন্দের নামে যথেচ্ছ অপবাদ দিয়ে দিয়ে তার 'গুণ ফাঁস' করে দিয়ে দিয়ে গ্রামের লোকের মন ঘুরিয়ে উল্টোমুখো বহাতে সক্ষম হয়েছে, তখনও সত্য নিজ বিশ্বাসের মত অবিচল আছে।

সে বোঝে বয়েস হয়েছে, এখন ক্ষমতা গেছে তা'বলে চিরদিনই বৃন্দে লোক ঠকিয়ে খেয়েছে, একথা বিশ্বাস করতে নারাজ সে।

মুখুয্যে বাড়ির এই ঘটনার সময় হারু বাগদির মেয়ে টগর বালিকা মাত্র, ঢুলোর সঙ্গে মোলাকাতও ছিল না, তবু পরে ঢুলোর বৌ হয়ে

এসে বলে বেড়ালো, উতো ওর নিজের কুকীর্তি! নিজে 'বাণ' মেরে বাচ্চাডারে খতম করে একে তৎপরে নোক সমাজে ঘটাপটা দেইকে বাঁচা করাল।

বাবুদের বাড়ি থে নিজেরা কেউ উকে ডাকতে এয়েছেলো? কোন্নোটা না। উয়ারই যড়কর়া লোক লোক গে খবোর দেচনো। বাণডা মোকখোম ছেলো, তাই সিটারে তোলা করাতে অত ঝলপিটাপিটি।

বালিকা ছিল টগর তখন।

তা' পদ্মও তো এখন বালিকা। সাপের চেয়ে সলুইয়ের বিষ বেশী।

বাপের সঙ্গে এসেছিল টগর।

হারু ফিরে যেতে যেতে বলেছিল, তার্জ্জবডা ছাকালো বটে গুনীনমা।

মেয়ে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ছেলেডা মরে নাই। শুধু ভিম্রি গেছল। মলে আর বাঁচাতি হতনি।

ডাগদারে তো ঝেড়ে জবাব দে গেচলোরে।

দেক্‌গা যাক না ক্যানে। ঠিক ছ্যাকে নাই। মানুষ জেয়ন্তোরে মাত্তি পারে, মড়ারে জেয়ন্তো কত্তি পারে।

বালিকা টগরের মুখে কথাটা হয়তো বেশী দার্শনিক শুনিয়েছিল। কিন্তু পদ্মও তো বালিকা। সাপের চেয়ে সলুইয়ের বিষ বেশী।

সত্যভাষিনী টগর পরবর্তী জীবনে, তার কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। জেয়ন্তোরে মারতে সক্ষম হয়েছে সে নিজেই। বৃন্দের জ্বলজ্বলাট গৌরিবমূর্তিটিকে সে ক্রমেই মৃদু বিষ প্রয়োগে জীর্ণ করে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

॥ ৮ ॥

কিন্তু তখন গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে।

সেই ঘটনার পর থেকে একেবারে টপে উঠে গিয়েছিল বৃন্দে ;" শুধু এ গ্রামই নয়, নানাদিক থেকে লোক ছুটে আসতে শুরু করেছিল, দিকে দিকে সাগরপুকুরের 'গুণীনমার' নাম ডাক। "সাগরপুকুর" বিখ্যাত হয়ে গেল বৃন্দের মহিমায়।..ষ্টেশনে ভিড় বাড়ে। আর রিকশাগুলোকে বললেই, সে বলে, 'ঠিক আছে বুঝেছি।'

সেই সময় দুলোর বাপ ঘরবাড়ি বাগান পুকুর করল, উঠোনে টিউবওয়েল বসাল, মনের মত করে রান্নাঘর বানিয়ে দিল বৃন্দেকে।

পেশার জন্যে বার ব্রত উপোস তিরেস অনেক করত বৃন্দে কৃচ্ছ্র সাধনের অনেক নিয়ম নীতিও মানত কিন্তু সংসারটি পুরো বজায় রেখেছিল।

ভরের সময় ছাড়া সে ঠিকই আছে।

'ভর' হওয়ার বাড়বৃদ্ধির পর থেকে, বৃন্দেকে আর লোকের বাড়ি ছুটতে হত না, লোকই ছুটে আসত।...এমন কি স্কুলের ছেলেমেয়েগুলো পরীক্ষার আগে! চণ্ডীর ফুল নিয়ে যেত, নিয়ে যেত চণ্ডীর সেবিকার 'আশীর্বাদ।'

তা' এ একটা খুব বিরল দৃশ্য নয়।

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে সেখানে, গাছ তলায়, বাঁশবনে এই সমারোহময় ভক্তির দৃশ্য দেখা যায়; একটা কিছু অলৌকিক শক্তির বার্তা পেলে হয়।...আর আমাদের এই বঙ্গভূমিতে? সে তো বলে কাজ নেই।...আজ দেখলে কেউ কোথাও পেতলের থালায় দুটো চারটে পয়সা রেখে চোখ বুজে বসে আছে, কাল দেখলে তার সেই বোজা চোখের ক্যাপাসিটিতেই

থালায় পয়সা ধরছে না।···অতঃপর মন্দির উঠল, দিনে দিনে সে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল, তারপর লোকের ভিড়ে অন্যলোকের রাস্তা চলা দায় হল।···হয়ত ফলাও করে খবরের কাগজেও বেরোলো সেই বার্তা।···

অহরহই এ দৃশ্য দেখা যায়।

মানুষ বিজ্ঞানের উন্নতি চরম সীমায় লক্ষ্যমাত্রা রেখে ছুটছে বলেই কি অলৌকিকের পিছনে ছুটবে না?

বৃন্দের ভাগ্যে তখন সেই মহালগ্ন এসেছিল।

ভুলোর বাপ বলত দিনে দিনে তোর যা বোল বোলাও হতেচে বিন্দে, মন নিচ্চে তোকে নে কলকেতায় গিয়ে অ্যাকটা ঠাট্ বাট্ পেতে বসিগে।···তা'লে দালানকোটা বানিয়ে ফেলতি পারব।···

বৃন্দে উড়িয়ে দিত। বলতো শহরে বাজারের লোক এসবে বিশ্বেস করে না কি? করেনি? বলতেতিস কি তুই? হুদো হুদো লোক আসতেচে না কলকেতা থেকে? 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' বাবুদের আপিসের লোকই কত আসতেচে। তুই তো ভরে' থাকিস কে আসতেচে যেতেচে খ্যাল করিস নাই।···তাই বলতেচি অ্যাকবার কলকেতায় নে গেলে—

বৃন্দের এতে তেমন সায় নেই। বৃন্দের বক্তব্য, এখেনডা হলো গে মায়ের থান। ঘটের পিতিষ্টে, এখেনছেড়ে ওন্যেত্তর গেলে কি আর মা উদ্দানী কেরপা করবে?

লোকটা বলত, আহা তোরে কি আর চাটি বাটি উঠিয়ে নে যেতে বলতেচি? কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের চাতালে কি কোনো মোহাশ্মশানের ধারে কাচে, হপ্তায় দু'দিন গে বসলি। তাতেই দেকচি—

হপ্তায় দু'দিন কোরে আমি কলকেতায় ছুটবো? এডা—অ্যাকটা কতা হোলো। আর এই বাবুরা যে রোজ দিন ছুটতেচে। মেয়ে লোকও ছুটতেচে আজকাল। শয়োরের লোক বিশ্বাস নে আসে না। মজা দেকতে আসে পরীক্ষা করতে আসে।

তো পরীক্ষেয় তো পাশ হবি তুই। ফাস্টো হয়েই পাশ দিবি।

বৃন্দে কেমন বিমনা হয়ে যেত।

বৃন্দের মনে হত এই তার বাঁশবন আর ফণী মনসার ঝাড়ের আড়ালে মনের মত ভিটেটুকু এই জোড়া নিমগাছ তলার কুঁড়েয় মায়ের ঘট পিতিষ্টে, এই শত শত ভক্তের পায়ের ধুলোয় পবিত্র হয়ে ওঠা উঠোন বাগান, এ সবের নড়চড় করলেই বুঝি বৃন্দে শক্তি হারিয়ে ফেলবে।··আসলে যা কিছু করে বৃন্দে, আমি করছি, ঠিক এ বোধে করে না। যা করবে মা করবে মায়ের কি ইচ্ছে মা জানে এই সব বলে বলে অভ্যাস হয়ে গিয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই ভয় হয় বুঝি ঠাঁই নাড়া হলেই বুঝি সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

হায় তখন যদি বৃন্দে সেই মানুষটার হিত কথা শুনতো! তা হলে হয়ত আজ এমন দুর্দশায় পড়তে হত না তাকে।···সেই 'অন্যরকমই' তো হয়ে গেল।

কে জানে কোন মহাভাগ্যের বলে বৃন্দের হাত দিয়ে মরা পর্যন্ত বাঁচালো মা, বৃন্দের অবস্থা ফিরিয়ে দিল, আবার কোন কুটিল ভাগ্যের ফেরে বৃন্দে সর্বস্ব হারিয়ে কাঙালিনী হয়ে গেল।···

ওই মানুষডাই ছেলো আমার সৌবাগ্যো।

মনে মনে ভাবে বৃন্দে।

ও হতেই আমার অ্যাতো বাড়বাড়ন্তি, অ্যাতো বোল্‌বোলা।··· ওরপরেই মা উদ্দানী এতো সদয় ছেলো ও মরার পর অবদি আমি সরবোস্বান্তো হলাম গো। হয়তো বৃন্দের কথাই ঠিক।

'ভুজুদা' নামের লোকটা বৃন্দের জীবনে খুব পয়া ছিল। তাই বৃন্দে ধুলো মুঠি ধরেছে সোনা মুঠি হয়েছে।

তবে—

ভুজঙ্গই ওই কালসাপিনীকে ঘরে আনার গোড়া।

বৃন্দে বলেছিল মেয়ে সোদ্দল বলে কি তুলো তোরে ধুয়ে জল

খাবা ?···হেরোর আবস্তার ওই ছিরি। কিচু দেবেক থোবেক নাই।

ভুজঙ্গ হেসে বলেছিল, বেটার বোয়ের বাপের ছায়ায় থোওয়ায় পিত্যিসী তুই ? তোর মা তোরে চেনে মেপে দেচ্চে না ?

অস্বীকার করা যায় না কথাটা। অতএব—

অতএব যৌবন না আসতেই যুবতীর থাক্কা ধরা রূপসী টগর, বৃন্দের বুকে জাঁতা বসাতে, এ সংসারে এসে প্রবেশ করলো।

ছেলের বৌকে প্রথম প্রথম ভুজঙ্গ খুব আদর যত্ন করেছিল, 'ছেলেমানুষ' ভেবে মায়াও করেছিল, এবং তাকে তার 'শাশুড়ীর মহিমা' সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলো, এটি কি বস্তু।

শ্বশুরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, পরিবারের লোকঠকালে ব্যবসা হতে সৌউর আমার বড়লোক বোলে প্যায়ে তো, তাই অ্যাতে ভোক্তি।···

তা কী আর করা ?

একদিনে তো আর টগর বিষবড়ি খাইয়ে মারেনি শ্বাশুড়ীকে ? বড় হয়েছে, তিন তিনটে মেয়ের মা হয়েছে, এবং কেমন করে যেন বৃন্দের পাতানো সংসারখানাকে নিজের মুঠোয় ভরে ফেলতে শুরু করেছে। সেই সময় ভুজঙ্গ মারা গেল। দুম করেই গেল। চোখেকানে দেখতে দিল না বৃন্দেকে।

আর সেই শুরু হল টগরের পাড়া বেড়ানো।

অর্থাৎ বিষ ছড়ানো।

'নিজের সোয়ামীকেই যে আকৃতে পাল্লোনি, সে জেবন বাঁচাবে ওন্যের ? ক্যানো তোর জড়িবুটি গ্যালো কোতা ? তোর উদ্দানী মা ? হুঁঃ। সব ভুজুং।

॥ ৯ ॥

তখনি রাষ্ট্র হলো বৃন্দে লোক ঠকাতে নিজে 'মন্দ' করে তবে 'ভালো' করাতি দেখায়। রাষ্ট্র হলো—মুখুয্যেদের সেই বাচ্চা খোকাটাকে ঘরে বসে 'বিষবাণ' মেরে তারপর তাকে বাঁচাবার ভান করতে গেছিল বৃন্দে।···অতোদিন আগের কথা, তবু লোকে টগরের কথাই বিশ্বাস করে ফেলল।···তারা অবশ্য আর গ্রামে নেই। সেই বছরই পুজোটি সমাধা করে মুখুয্যেরা গ্রামের বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় পাকাপাকি বাস করতে চলে গিয়েছিল। এমনিতে তো বেশীরভাগই থাকত, তবে পালে পার্বিনে, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে আর ওই দুর্গোৎসবে আসতো।···দুর্গোৎসব উঠিয়ে দিল, নিজেদের আসা বন্ধ করে দিল। কেন কে জানে। ছেলে বেঁচে ওঠা সত্ত্বেও এই ডিসিশনে, কি জানি হৃদয় রহস্যের এ কোন্ রহস্য।

কিন্তু মুখুয্যেরা না থাকলেও গ্রামে ছিল তো অনেকেই। আর দীর্ঘকাল যাবৎ বৃন্দের প্রতি সমীহ সম্ভ্রম আর কৃতজ্ঞতা নিয়েই ছিল। চিড় খেল সেই মনোভাবে। তারপর ভাঙন।···

তোমার আগুনলাগা ঘরে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে তোমায় বাঁচিয়েছে বলে, যে পড়শীর প্রতি তুমি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত ছিলে, হঠাৎ যদি টের পেয়ে যাও আগুনলাগানোটা সেই পড়শীরই অবদান, মন যেভাবে ওলট পালট হয়ে যায়, সেইভাবেই ওলট পালট খেলো সাগরপুকুর গ্রামের মন।

ক্রমশঃই সবাই অতীতের খাতা উল্টে উল্টে টগরের কথার 'সমর্থন' আবিষ্কার করতে লাগলো, আর ওই একটা মুখ্যু অছ্যুৎ জাতের মেয়ে এতাবৎ এইসব বুদ্ধি রাগমান লোককে ঠেকিয়ে খেয়ে এসেছে বলে,

আক্রোশে আর অপমানে বিকৃত হয়ে উঠল।···

বৃন্দের কপাল তখন তার নিজের দেহতেও ভাঙ্গন ধরেছে।··· বুকের বল চলে গিয়ে বুক গেছে ধ্বসে, যত্নের অভাবে শরীর যেতে বসেছে গুঁড়ো হয়ে। গ্রাম গ্রামান্তরের লোকেরও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এসেছে।···

চারিদিকেই তো নতুন উৎসাহের অবির্ভাব।

তখন 'রামদেবপুরের ফকিরের' বাড়বাড়ন্ত জাহির হচ্ছে।

অতএব বৃন্দে তলিয়ে যাবে, স্বাভাবিক।

দুলোর বাপ যে সাহায্য সহায়তা করতো—

তাড়িখোর দুলো তার সিকির সিকিতো করলই না বরং একদিন টগরের প্ররোচনায় মত্ত অবস্থায় মাকে ভিটে ছাড়া করে ঢিবি জমির ওপর বানানো সেই 'চণ্ডীর কুটিরে' বসিয়ে রেখে এলো। শাসিয়ে এল খবরদার যদি আমার বেটিগুলানের ওপর নজর দেতে ও ভিটেয় উঁকি দিবি তো, তোকে ওই শ্যাওলা পুকুরে ডুইবে রেকে আসবো।

বৃন্দে রেগে কী বলল, আমায় এই শূন্যিঘরে একেথুলি, আমার জিনিষ পত্তর?

দুলো বলল, উসব তো আমার বাপের। তোর বাপের?

তোর বাপেরটা হোলো কমনে? আমার ওজগার না?

দুলো বলল, মানে দুলোর মাথায় ওটা নেশার রং বলল, তবে থানা পুলিশ করগা যা।···

কে করবে থানা পুলিশ?

কে লড়বে বৃন্দের হয়ে? কে বলতে আসবে ন্যায় কথা? কার দায় পড়েছে তাড়িখোর গোয়ারের সঙ্গে কথা কইতে আসতে?

বৃন্দে তো গ্রামের সকলের কাছে কেঁদে গিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু একটা 'শক্তির পতন' মানুষকে বড় বেশী সহানুভূতিহীন করে ফেলে।···যেন সেই শক্তিকে বিশ্বাস করে এসে যে বোকামী করে ফেলেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করে।

মাটির খোল্টায় পরিণত হয়ে আঁস্তাকুঁড়ে পড়ে রইল।

শুধু সত্য চরণ।

একটা ব্যতিক্রমের মত, নীরবে এসে বৃন্দের ভাঙা চালার নীচে মেটে দাওয়ার ওপর নামিয়ে দেয়। নিত্যদিনের সিধে।···একটু চাল, এতটুকু ডাল, একফোঁটা নুন, একছিটে তেল, দুটো ছাতু, দুটো চাল ভাজা, দু'তিনটে গুলি গুলি আলু। একদা বৃন্দেকে যা খাওয়া অভ্যাস করিয়েছিল ভুজঙ্গ সেই অভ্যাসটার জন্যে অনেকদিন কষ্ট পেয়েছে বৃন্দে। এমন কি মান খুইয়ে ওদের গিয়ে বলেছে, ভাত দিস না দিস, অ্যাকটুক চা তো আমারে দিতি পারিস? নিজেদের অ্যাতো চায়ের র‍্যালা।

তখন টগর হেসে হেসে বলেছে, বসতি পেলেই মানুষে শুতি চায়। আজ তোরে অ্যাকটুক চা দিই, কাল তুই 'ভাত দে' বলে জুলুম কর। হুঁঃ। ক্যাঙালকে শাগের ক্ষেত ঢ্যাকাতে অ্যাচে।

টগর কেন এতো এমন করে ভেবে পায় না।

মনুষ্য চরিত্রে চির অভিজ্ঞ বৃন্দেও যেন দিশেহারা হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। বৃন্দের শক্তিকে ভয় করে বলেই টগর এমনভাবে তাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত ওই শক্তিকে ভয় করে এসেছে, আর তাকে দাবাতে চেষ্টা করে এসেছে, এতোটুকু শিথিলতা দেখালেই যদি আপদ শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে টগরকে বিপদজনক অবস্থায় ফেলে।।

কৈ-মাগুর মাছ-কুটতে বৃন্দে নিজেই যেমন, তার চোখে মুখে নুন লাগিয়ে, মাথাটা ছেঁচে ছেঁচে নিস্তেজ করে ফেলে, তবে বঁটিতে দু টুকরো করে।

জিনিস কটা নামিয়ে রেখে সত্যচরণ বললো, মাসি, অসময়ে শুয়ে যে?

বৃন্দে উঠে বসে বলল, শরীলডে ভাল নাই। তা' তোমার আজ বিলম্বো?

আসলে বৃন্দে খিদেয় শুয়ে পড়েছিল। চালকটা না এলে তো ভাত রাঁধার উপায় নেই।

সত্য এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, শাক-টাক কিছু তোলোনি?

নাঃ। আজ আর মন নাই।

সত্য দাওয়া থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে একগাছা কাঁকুড় শাক, আর অ্যাতোটুকু একটু জালি কাঁকুড় তুলে এনে বলল, ন্যাও, উঠে রাঁধো। না খেলে শরীর ধুঁকবে।···আমার বাড়ি কাছে হলে, তোমার দুটো ভাতের ব্যবস্থা আমিই করতাম। সেই তো—নিজের জন্যে হয়। তো তুমিতো আর অতটা হেঁটে যেতে আসতে পারবে না।

বৃন্দে উঠে বসলো।

আহা! ভগমান আচে তালে অ্যাখনো।

তারপর বললো, না বাবা চলতে নারি।

ওই তো। নচেৎ দেখতে যেতে পারতে মুখুয্যে বাড়িটার এবার আবার কত জৌলুস ফিরেছে। ওদের বাড়ির পাশেই তো আমার ঘর।

বৃন্দে আবেগের গলায় বলল, কোন মুকুয্যে বাড়ি?

আহা মুখুয্যে বাড়ি আর কটা গো মাসি? ওই বাবুদের বাড়িই। তেনারা যে এবার আবার পূজো করছেন।

পূজো করচে!

বৃন্দের চোখের সামনে যেন একটা রং-মশাল জ্বলে ওঠে। অ্যাতোকাল বন্দো দে' আবার পূজো করতেচে?

সত্যচরণের আজ রান্না করতে হবে না।

মুখুয্যে বাড়ির যে কেয়ারটেকার এযাবৎকাল বাড়ি দেখাশুনো করে আসছে, সত্যচরণের সে বন্ধুলোক। সেও নিঃসঙ্গ। সত্যও তাই। তা আজ সে অফার দিয়েছে—আজ থেকে রান্নার লোক লেগেছে, রাঁধবে বাড়বে, বাবুরা এসে পড়বার আগে একটু পুরনো হতে, কেয়ারটেকার নিজে, আর কিছু 'লোকজন' খাবে। অতএব সত্যও যেন এসে বসে যায়।

সত্যর তাই আজ অনেক সময়।

দোকান বন্ধ করে এসে গল্প করতে বসেছে।

হয়তো বা বৃন্দের এই নিস্তেজ শিথিল ভঙ্গী, এই বলীরেখাঙ্কিত মুখ, নিভে যাওয়া কয়লার আঙারের মত চোখ আর হেরে যাওয়া চেহারাটা দেখে মুদির দোকানওয়ালা সত্যচরণের মায়া হল।

তাই বললো, বুঝলে মাসি, আজ আর আমায় হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না। আজ নেমন্তন্ন।

'নেমন্তন্ন' শব্দটা শুনেই বুড়ি বিন্দের বুকটা যেন উথাল পাথাল করে উঠল। কত বাড়িতে কত নেমন্তন্ন খেয়েছে বৃন্দে। যত জানা ঘর, তাদের ইষ্টপূরণ বাবদ খাইয়েছে, আবার কাজ-কর্মেও নেমন্তন্ন করেছে। তখন আবার বলেছে—ছেলেকে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসো মা।

এসব ক্ষেত্রে বড় একটা তা আনতো না বৃন্দে।

তার স্পেশাল খাতির থাকলেও, জাতের বিচারটাতো সমাজ সামাজিকতায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না? খেতে বসাবে নিশ্চয় অচ্ছুৎদের সঙ্গে। বৃন্দে বলতো, অ্যাকটা লোক দিও মা, খাবার সঙ্গে নে যাব। ওরা আসতে চাইবেনি।

বাড়িতে এনে তিনজনে একসঙ্গে খেতো। আর বাবুদের বাড়ির রান্নার তারিফ করতো। বিশেষ করে ছুলো। বলতো, মাচ্-মানসো তো তুইও আঁদিস মা অ্যামন খোসবো হয় না ক্যান বলতো?

ওনারা কতো তরিবৎ করে। আঁচুনী ঠাকুরে আঁদে।

বলে বৃন্দে নিজের ভাগের সবটা ছেলের পাতে তুলে দিতো।

যতক্ষণ সে ওই ক্রিয়াকলাপে আছে, ততক্ষণ যেন অন্য আর এক বৃন্দে। কিন্তু সংসার জীবনে বৃন্দে নামের মেয়েমানুষটা তো একেবারেই সাধারণ ছিল। স্বামী পুত্তরের প্রতি স্নেহশীল, সংসারে টান।

আর গাল মন্দ?

কেউ কোনোদিন শোনেনি তার মুখে। এক ভূতছাড়ানো মন্তরের মধ্যে ছাড়া।

জীবন্তেই কি প্রেতাত্মা হয়ে যেতে পারে মানুষ?

কিন্তু একটা সহজ মানুষ বৃন্দের সঙ্গে সহজভাবে গল্প করতে বসেছে দেখে বৃন্দে যেন অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যায়। উৎসাহের গলায় বলে ওঠে, বস্‌লে গো?

ওই তো মুখুয্যে বাড়ি। পশু´ আসবেন তেনারা আজ থেকেই রাঁধুনী ঠাকুর।

আসবেন তাঁরা।

এই দীর্ঘ পঁচিশটা বছর পরে তারা আসবে। কিন্তু কারা কারা?

সত্যচরণ হাসে, সেই বুড়ো কর্তা-গিন্নী কখনো এখনো বেঁচে থাকে? এখন ছেলে বৌ। যেনাদের ছেলেকে তুমি জীবন দিয়েছিলে।

হঠাৎ বৃন্দের চোখে একঝলক জল এসে পড়ে। চোখ মুছে কষ্টে বলে, আমি কে? যা করেচে মা। তো তুই অ্যাখনো সে কথা স্মরোণে রেখেচিস বাবা? আর কোন্নো মানুষডা আকেনি। তো সেই ছেলেডা? আসে নাই।

আরে এসেচে বৈ কি।

সত্যচরণ জানায়, তার জন্যই না কি আসা।

এ বছরের এই দুর্গোৎসব তো তার নামেরই মানতি।

বুড়ো কর্তা-গিন্নী যে কী ভেবে এখানের পূজো ভুলে দিয়েছিলেন তাঁরাই জানেন।

···কলকাতার বাড়িতে না কি ঘটে পটে পূজো করতেন, কর্তা মারা যাওয়ার পর তাও উঠে যায়।

অথচ পয়সার অবধি নেই।

বিরাট ব্যবসা তো।

দালানের প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টায় মায়ের নাকি দশহাতের একখানা হাত খুঁতো হয়ে গিয়েছিল. কে জানে সেই অপরাধ বোধই কর্তাকে ওইভাবে চালিত করেছিল কিনা।

যাক সে তো অনেক দিনের কথা।

বর্তমানের ঘটনা—সেই মরেবাঁচা ছেলে বিলেতে পড়াশুনো করে

ফিরেছে, এবং বিশেষ ঘটা সহকারে বিয়েও হয়ে গেছে। দেশে এ যে হবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সেই বাবদ ছেলের মার এই মানত।

দেশে এসে একটা ঘটা করবেন, নতুন বৌকে দেশের পূজো দেখাবেন।

নিজের সেই বধূজীবনের আনন্দের স্মৃতির গল্প করেছেন, দেখাতে সাধ।

বলেছেন নাকি। গ্রামের লোক ত কেউ কোনো দোষ করেনি ছেলের নেমন্তন্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পূজোয় তার শোধ হোক। আমার নিজের বিয়ের সময় দেখেছি গ্রামসুদ্ধু লোক পাঁচদিন ধরে নেমন্তন্ন খাচ্ছে।

এখন অবশ্য খরচের হার অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু ব্যবসার আয়ও ত অনেক বেড়েছে। তাছাড়া বাপবেটা দুজনেই কৃতী।

এ সমস্ত গল্প শুনে এসেছে সত্যচরণ তার সেই বন্ধুজনের কাছে। কাজকর্মের অবসরে সে লোকটা গল্প করতে সত্যচরণকে ডাকে। জমিদার বাড়ির নীচের তলায় কত ঘর কত দালান। এতোদিন পোড়া হয়ে পড়েছিল, এখন নতুন রং মেরামত হয়ে আবার পুরনো বাহার খুলেছে।

আমারে কেউ কয়না। আজ এই তুমি কইলে, তাই টের পেলাম।

বৃন্দে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কেমন দেখতে হয়েছে সেই খোকাডা, কত বড় হয়েছে দেখতে মন যাচ্ছে।

সত্যচরণ দুঃখের গলায় বলে, তুমি তো হাঁটতে পারোনা। তা একটা রিক্সা গাড়ি চেপে যাবে ক্ষ্যাপা?

বৃন্দে বলে, আমারে চেনবে? এডা আবার কেডা এলো, বলে দৌরানে গলাধাক্কিয়ে তাইড়ে দিবে।

সত্য জিভ কাটে।

ছি ছি। এ কী বলছো মাসি। তাঁরা সভ্য ভদ্দর শহরের মানুষ। এই সাগরপুকুরের লোকের মতন বেইমান নয়। পরিচয়

দিলে, দেখো কত মান্য সম্মান করবে। কী বল? আজ এই এতো আহ্লাদ কোথায় থাকতো, যদি সেদিন—মরা ছেলে না ফিরে পেতো।

বৃন্দের বুকটা দুলে ওঠে।

বৃন্দে তবু নিজেকে সামলে বলে, আর বাচ্চা-কাচ্চা নাই?

নাঃ। ওই একটাই। সাধে বলছি—কী থাকতো তাহলে? কখন বিলেত ফেরৎ ছেলে, পরীর মতন বৌ, গ্রামের লোকেদের দেখিয়ে মুখটা বড় হবে কতো! তা তুমি বেঁচে আছো জানলে, নিশ্চয় তোমাকেও পূজোয় নেমন্তন্ন করবে!

বৃন্দে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, অ্যাকডা পেরানী ত এই বৃন্দেবুড়ির ছায়া মাড়ায় না। যাই তুমি ছেলে—তাই এখনো পেরানটা আছে।

সত্যচরণ ভাবে, ওনাদের কানে তুলতে হবে—সেই গুণীন মা এখনো বেঁচে আছে। তবে স্বামীপুত্তুর হারিয়ে আর ছেলের বৌয়ের দুর্ব্যবহারে বড় দুঃখে কষ্টে আছে। তাঁদের তো হাত ঝাড়লে পর্বত, যদি বুড়ির 'শেষ কালে' একটু সুব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

সত্যচরণ এর মধ্যে কোনো অযৌক্তিক দেখতে পায় না। ভদ্র মানুষের মধ্যে তো কৃতজ্ঞতা থাকবেই।

এই যাঃ। তোমার দেরী করে দিলাম মাসি। নাও নাও রাঁধো।

বলে সত্যচরণ চলে যায়।

কিন্তু বৃন্দের আর উনুন জ্বালতে গা ওঠে না। বৃন্দে ভাবে, সেজের কালে ভাত এঁদে খাবো অখন।

অতএব বৃন্দে সেই ছাতু কটাই জলে গুলে গুড় দিয়ে খেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু রাতে ঘুম আসে না বৃন্দের তা দুপুরে।

অন্যদিন যদিবা একছিটে 'ভাত ঘুম' হয়, আজ তো তাও নয়। বৃন্দে সেই বাবুদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসে।

॥ ১০ ॥

বৃন্দে পঁচিশবছর আগে ফিরে যায়।

মুখুয্যেদের নব আবির্ভাবের উদ্যোগে গ্রামে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। যদিও আজকালকার ছেলে মেয়েরা কোনো ফালতু ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করাকে খেলোমি মনে করে, এবং এতোদিনের অবহেলিত জীর্ণ দশাগ্রস্ত প্রাসাদটায় মিস্ত্রীর হাত পড়েছে দেখেও, তাকিয়ে দেখে না। তবু এই মেরামতীতে আর রং করণে কত খরচা হতে পারে, তার একটা সম্ভাব্য হিসেব মনে মনে কষতে থাকে অনেকেই।

খরচা যে রীতিমতই হবে তাতে সন্দেহ কি?

এখন বয়স্ক মহলে জল্পনা-কল্পনা—এতো খরচের কারণটা কি? তবে কি ছেলে বৌকে কলকাতার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্তা গিন্নী নিজেরা এখানে এসে বসবাস করতে চান?

বিলেত আমেরিকা ফেরৎ ছেলে আর আধুনিক বৌ-এর সঙ্গে হয়তো বনছে না। আরে রেখে দাও তোমার বিলেত আমেরিকা ফেরৎ। কলকাতার রাস্তায় মুঠো মুঠো গড়াগড়ি যাচ্ছে।' না বনলে এমনিই বনছে না।

কিন্তু এখানে এসে বাস করবে কি করে, প্রসূন মুখুজ্যে তো এখনও সার্ভিসে। তা'ছাড়া অতো সব ব্যবসা।

তাতে কি? পয়সার তো অভাব নেই। ওদের জন্যেই তো পেট্রল। রোজ গাড়িতে যাওয়া আসা করবে। ক' মাইলই বা রাস্তা। বড়লোকেরা এমন করে আজকাল।

নাকের সামনে হঠাৎ এক বড়লোক এসে বাস করতে বসলে, ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না।

তাতে তোর আমার কি?

তা অবিশ্যি। আমরা তো আর 'বাবু' এসেছেন বলে প্রজার মত জোড়হাতে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি না।

কেউ কেউ যাবে দেখিস। বুড়োরা তো নির্ঘাৎ। সেই পুরোনো প্রেম ঝালাতে যাবে।

কে যেন বলছিল, শুধু ধূমধাম সহকারে পূজো করে চলে যাবে।

গেলেই ভালো।

আচ্ছা শুধু চারিদিনের জন্যে এতো খরচা?

বড়লোকি দেখানো। আর কিছু নয়।

মুখে ঔদাসীন্য দেখালেও, তলে তলে উত্তেজনা আছে।

কথাটা সত্যিও।

যদি বাসই না করে, চারদিনের জন্যে এতো খরচা? বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকে তো।

হয়তো বাড়াবাড়িটা বেশিই হয়ে গেছে।

কণ্টাক্টর লাগিলে কাজ তো।

তবু—

বাড়ি সম্পর্কে একটা অপরাধবোধ পীড়িত করছিল বোধ হয় বর্তমান মালিককে। টাকার অভাব তো নেই সত্যি, অবহেলায় পিতৃপুরুষের ভিটেটা পড়ে যাবে? তাছাড়া নতুন বৌকে দেখাবার বাসনাটাও পেয়ে বসেছিল নতুন বৌয়ের শাশুড়ীর। এই পুরনো গড়নের বাড়িরও কত বাহার বুঝুক। পুরনো নামেই তো নাক তোলে সব।

বাড়ি সারানো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল—আসল ঘটায়, মুহূর্তে মুহূর্তে চমকাচ্ছে সবাই।···লরী চেপে কুমোরটুলীর ঠাকুর এলেন, সেটা এমনত কিছু না। 'সাগরপুকুর বান্ধব লাইব্রেরীর' সর্বজনীন দুর্গোৎসবেও কলকাতা থেকে ঠাকুর আসেন। কিন্তু প্যাণ্ডেল? ডেকরেটিং? আলোকসজ্জা? কেটারিঙের ব্যবস্থা?

পূজোর ভোজে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা। এটা এখনো হয়নি এখানে।

গ্রামসুদ্ধ নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে।

মাঝখানে একদিন গাড়ি করে এসে প্রসূন মুখুয্যে বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন করে গেছেন। এ সেকাল নয় যে, নায়েব গোমস্তা দিয়ে নেমন্তন্ন হবে।

মা দুর্গার ছবি আঁকা নিমন্ত্রণ কার্ডটা বাঁধিয়ে রাখার মত।

পঞ্চমীর দিন সাত আটখানা গাড়ি করে কলকাতা থেকে এসে গেল, নতুন বৌ ও আত্মীয় স্বজন। সেই সব গাড়ির সারি আসতে লাগল বৃন্দের বাড়ির সামনে দিয়েই।

শুধু আজ নয়, ক'দিন ধরেই আসছে গাড়ি, ট্রাক। যেন রাজসূয় যজ্ঞ। আসল কথা সকল জিনিস কলকাতা থেকে আনানোর ব্যবস্থায় সমারোহের ব্যবস্থাটা এত প্রকট দেখাচ্ছে।

টগরের বাড়ির লোকটার প্রকৃতপক্ষে ঘরামির কাজ।···পূজোটুজো বা বিয়ে থাওয়ায় সে রীতিমত 'ব্যস্তমানুষ।' আর এই উপলক্ষে তো বিরাট বায়না পেয়েছে সে। সবকিছু কলকাতা থেকে এলেও, বাঁশ দড়িগুলো এখানেরই। এবং দুচারটে ঘরামিও নেওয়া হয়েছে ডেকরেটারের নির্দেশে।

জবা, পদ্ম, ঘেঁটু ওদের মধ্যেও তাই উৎসাহ উত্তেজনা।

ওদের নাকি নবমীর দিনে খেতে যাবার কথাও আছে।

বৃন্দের কানে মাঝে মাঝেই ওদের কথার টুকরো ভেসে আসে···কী খাওয়াবে রে বাপটা?

আমারে বুজি বলে থুয়েরে?

বেস্তর ঘটা? তাই না রে। তুই কটা মাচ খাবি জবা?

অ্যাক কুড়ি, দুকুড়ি। তুই?

দশকুড়ি।

দুর, পেট ফাট্যা অক্কা পাবি।

মা, তুই যাবিনে ?

যাবো না ক্যানে ?

শুদু বুড়ি পড়ে থাকবা। হি হি।

তো তুই কোলে ধরে নে যাস।

হি হি হি।

ওদের ওই হাসির আওয়াজটা বড় অসহ্য লাগে বৃন্দের। কান চেপে শুয়ে থাকে। পঞ্চমীর দিন একেবারে সিধে দিতে এসে উৎফুল্ল সত্যচরণ বললো, আজ সবাই এসে গেছে মাসি, আমার বন্ধুকে বলে রেখেছি ওনাদের জানাতে।

বৃন্দে আজ ক'দিন ধরে আয়োজনের বহর দেখছে। আর কখনো কম্পিত, কখনো স্তিমিত, কখনো উত্তাল, কখনো স্মৃতি মর্মরিত।

মনে পড়ছে—মুখুয্যে কর্তার মেয়ের বিয়ের সেই 'বিষ্টিবন্ধন'।

চওড়া লালপাড় তাঁতের শাড়ি প্রণামী দিল গিন্নীমা, কত মান্য, কত আদর। ছেলের বিয়েতেও সাতদিন ধরে চলেছে খাওয়া মাখা।

আর সেই ভয়ানক দিনে ?

সেই ছবিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে বারবার। গাড়ি করে কারা যেন সব এলো। ওর মধ্যে কি সেই ছেলেটা ছিল ?

এখন বৃন্দে কিঞ্চিৎ স্তিমিত।

কারণ তুলোর মেয়েদের হি হি টা যেন এখনো বাতাসে ভাসছে।

বলল, কী জানান করবো ?

এই—সত্য, একটু ঢোক গেলে বলে, তুমি এখনো বেঁচে বর্তে আছো, সেইটাই আর কি। বন্ধুকে বলে এসেছি—সে যা বলবার বলবে। চারটে রিকশাগাড়িকে ওরা রাতদিনের ভাড়া করে রেখেছে দরকার লাগতে—এক সময় তোমায় তারই একটায় চড়িয়ে—

বৃন্দে মলিন হাসি হেসে বলে, 'তোর যে বাবা গাচে কাঁটাল গোঁপে ত্যাল।'

আহা কাঁঠাল পাতে নাবছে দ্যাখোনা। জানতো না গিন্নীমা—যখন জানবে তুমি এখনো আছো, দেখো কী আহ্লাদ করবে।

তেনার কি অ্যাখনো সে কথা স্মরোণে আচে?

স্মরণে নেই? কী বল মাসি?

বলে যায়। তার কেয়ারটেকার বন্ধু তাকে অনুরোধ জানিয়েছে তিন চার দিনের মত দোকান বন্ধ করে ওখানে থাকতে। কাজের লোক, অনেষ্ট লোক। সত্য ভেবেছে, ভালই হয়েছে।

সত্য সেখানে থাকলে মাসির স্থায়ী একটু ভালমত ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে বলে বলে।

দিন কেটে যায় পাথরের ভার নিয়ে।

কোথায় কে?

'কী আহ্লাদের পসরা নিয়ে কি তবে, সেই ছেলের মা নিজেই আসবে? আজ যিনি গিন্নীমা! হয়তো তাই। তা সময় তো নেই, তাই এতো দেরী। রাত হয়ে যায় দাওয়া থেকে নড়ে না বৃন্দে।

ভাবে কতবড় বিরোদ কাজ মাতায়, তিনির কি সয়োজে অব্‌কাশ হবে? আত্‌ করেই আসা করবে।

রাত করে?

কিন্তু কত রাত?

সন্ধেবেলা ভাত রেঁধে খাবার কথা।

দুপুরে তো ছাতুগোলায় কেটেছে। কিন্তু কাঠকুটো ধরাতে সাহস হয় না। যদি তখনি এসে পড়ে? ধুঁয়ো লাগবে।

আর—আরও একটি ক্ষীণ আসা।

ঘটার বাড়ি থেকে আসবে, শুদু হাতে কি আর আসবে? 'ভালমন্দ' কিছু আনবে হয়তো। মিচিমিচি ভাত ক'টা খেয়ে খিদে নষ্ট করে বসে থাকবে?

॥ ১১ ॥

শুক্লাপঞ্চমীর রাত। মৃদু জ্যোৎস্না ঠাহর হয় না কত রাত। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে বৃন্দে ?

মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে কথাটা তুলল টগর।

বলল, পদ্মোটা কেঁদে মরবে।

লোকটা বসে বসে একটা জবা ফুলের মালা গাঁথছিল।

বলল, চুপ ! একদম চুপ ! টু শব্দোটি না।

পেরাণ তুল্যি তো ? তাই বলতেছি, আর কোতাও পেলি নাই ? পেলে তোরে বলিনা ?

আকাশে তো চাঁদের আলো ফুটফুটি। ভয় লাগছে।

—তুই থামবি ?

ওর দাবড়ানিতে টগরও থেমে যায়।

ভুলোকে সত্যকার বিয়ে করা স্বামীকে ফুঁ দিয়ে ওড়াতো টগর। কিন্তু একে ভয় করে। একে বোঝা ভার। কখনো মাথায় তোলে, কখনো পায়ে ছ্যাচে। মেয়েগুলোও তাই ওকে কখনো বাপটা বলে আদর কাড়ায় কখনো যমের মত ভয় করে।

মালাটা সরিয়ে রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে লোকটা বলল, শয়তান বুড়ি রাত দুপুর অবদি দাওয়ায় বোস করে ছেলো ক্যানো বল দিকি ?

টগর জানবে কেমনে ? বাজনা বাদ্যির আওয়াজ আসতেছে তো, তাই শুনতে যে হবে।

বাজনা বাদ্যি। হুঁ কানের কত জোর !

শোয়াপল্লি যে ? ঘুইমে পড়বি না তো ?

লোকটা উঠে বসে বলল, ফের কথা ? বলছি না চুপ !

টগর ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে। ভান দেখায় ঘুমিয়ে পড়ছে। কিন্তু ঘুম কি আসবে? আসতে চায় না।

আচ্ছা টগরের তো ভরপেট তবে ঘুম না আসার কারণ কি?

ঘুম না আসতে পারে বৃন্দের। পেট খালি।

দাওয়া থেকে উঠে এসে বৃন্দে-সত্যর দেওয়া সেই জালি কাঁকুড়টা বঁটিতে ফেঁড়ে নুন ঠেকিয়ে খেতে গিয়েছিল। খেতে পারা গেল না। তেতো হাকুত্।

কাঁচা চালই দুটো নিয়ে চিবিয়ে খেতে গেল, তাও হল না। শুধু মাড়ির জোরে জব্দ করতে পারল না তাদের। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে, তলানি গুড়টুকু মুখে দিয়ে ঢকঢকিয়ে খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

ভাবনা, রাতে তেষ্টা পেলে খাবে কি।

আর তো জল নেই।

মরুকগে। রাততো পোহাবে এক সময়?

মনে হচ্ছে সত্যর বন্ধু কথাটা তেনাদের বলতেই ভুলে গেছে। সত্য ঠিকই বলেছে, গিন্নীমার কানে উঠলে নির্ঘাৎ লোক পাঠাতো… হ্যাঁ লোকই পাঠাবে। বৃন্দের যেমন মরণ, তাই ভেবে মরেছে তিনি নিজে আসবে। তাই কখনো হয়। একি যে সে লোক।

মরতে ভাত কটা রাঁধল না বৃন্দে। ন্যাও অ্যাখোন মরো পেটে কিল মেরে জ্বলে মরো।

আচ্ছা বুড়ো হলে এতো ক্ষিদে পায় কেন?

বয়সকালে মায়ের নামে কত উপোস করেছে বৃন্দে, কই এমন তো হয়নি, টেরও পায়নি। সারাদিন উপোস করে মাঝরাত্তিরে উঠে শেকড় তুলতে গেছে। হঠাৎ বিড়বিড় করে নিজে নিজেই বলতে থাকে বিন্দে…

'বশ করার' ওষুধের কত খিরকেল!

আমাবস্যের দিনে নেজ্জলা উপোসে থেকে মাজ আত্তিরে গে পুকুরে ডুব দে, ভিজে কাপড়ে এলো চুলে শেকড় তুলে নে এসে। আতের

মছেই তারে বেটে পানের পাতে মাইকে থোও···সেই পানটি চুন সুপুরি আলাচ কপ্পুর দে সাজ করে নোকটারে খাওয়াও। ব্যস। সে তোমার পায়ে পায়ে ঘুরবে। করিচি তো এসব। কতো করিচি।

আচ্ছা।

নিবু'দ্ধির ঢেঁকি বিন্দে ছেলের বিয়ে হতে হতেই বৌটাকে কেন বশ করার পান খাওয়ায়নি? পেরথম পেরথম তো বৃন্দের পানের বাটা থেকে পান খেতে খুব তৎপর ছেলো বৌ।

ছ্যাক্ তোর, না ছ্যাক মোর।

বাটা খুলে পান নে দৌড়। আহা সেই মহালগ্ন হারিয়েছে বৃন্দে। আর উপায় নেই। আর শক্তিও নেই। একদিন তো বৃন্দে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ওই লোকটাকে 'বাণ' মারতে পারলো না, ঘাম ছুটে গেল, হাত পা কাঁপতে লাগল। বুক 'উৎলোতে' লাগল।

জেগে থাকতে থাকতেই কখন যেন স্বপ্নের শিকার হয়ে গেল বৃন্দে।

এই স্বপ্নের মধ্যে কত লোক, কত মুখ। চেনা অচেনা।

যেন—সেই উঠোনটায় আবার গিয়ে বসেছে বৃন্দে। পরনে পাটের শাড়ি। গলায় জবার মালা। ঝলমলে ঝকমকে গিন্নীমা বলছে আপনার হতেই তো সব মা। আপনি যদি সেদিনকে ওর জীবোনটা ফেরৎ না দিতেন কিছু হতো? ওরা সভ্য। ওরা 'আপনি' করেই কথা বলে।

কর্তা বলবে, জানতুম না আপনি বেঁচে আছো। জানলে আপনারে সকলের আগে নে আসতুম।

আর সেই খোকাডা? সেও এসে—

কিন্তু কোথায় সে? এরা কারা? এরা তো সেই বুড়ো কর্তা গিন্নী?

আর ওই বৃন্দে?

কালো চুলের ঢাল। মাজা মাজা রং। মাজা গড়ন। চকচকে তেলতেল মুখ। খাড়া হয়ে বসে আছে। ও কোন বৃন্দে?

সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে বৃন্দের। স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান তাকে কিছুতেই বাগিয়ে ধরতে পারছে না। অতীতের মধ্যে গলে গলে মিলে যাচ্ছে সেটা।

সারারাত বাজনার আওয়াজ আসছে।

কিন্তু এ বাজনা কি পূজোর বাজনা? ফিনফিনে গান, ঝিনঝিনে সুর।…

একে তো বলে মাইকের গান।…

হঠাৎ একসময় বেজে উঠল পূজোর বাজনা।

ঢাকে কাঠি পড়ল।…

ভোর হলো নাকি? তাইতো। কলাবৌ নাওয়াতে যাবে তবে এখন। টাকীঢুলি ঘুম ভেঙে উঠেই দিয়েছে দুটো ঘা। যাতে সবাই জেগে ওঠে।

বৃন্দেও উঠে পড়বে নাকি?

এই পথ দিয়েই তো বড় দীঘিতে যাবে ঢাক ঢোল বাজিয়ে সমারোহ করে, কলাবৌ নিয়ে।

আর বৃন্দেকে দেখতে পেয়ে বলে উঠবে। ইস তাইতো—বড্ড ভুল হয়ে গেছে মা, আপনাকে বলতে আসি নাই।

কিন্তু উঠবে কি হাত পা উঠছে না।

মাথাটা লট্‌কে পড়ছে। কালকের উপোসটা বড্ড লেগেছে।

আচ্ছা! বাজনাটা বেজেই থেমে গেল কেন? গোলমাল কিসের?

কোথা থেকে এমন রে রে, শব্দ আসছে?

শব্দটা বৃন্দের কুঁড়ের দিকেই আসছে যে। কাছে, আরো কাছে। আরো।—। একেবারে দরজায়—

কী বলছে ওরা?

অতোগুলো লোক।

কোথায় সেই হারামজাদি বুড়ি।

টেনে বার কর। পিটিয়ে লাশ করে ছাড়।

মেরে তক্তা বানিয়ে দে!

এই শয়তানী বুড়ি, বেরিয়ে আয় বলছি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বজ্জাতি! এই বিন্দে! বিন্দে! বেরিয়ে আয় শীগগির!

তারমানে বিন্দেকেই খুঁজতে এসেছে।

কিন্তু এই কি নেমন্তন্ন করতে আসার ভাষা।

বৃন্দের দরজায় এতো গোলমাল, কিন্তু যাদের বাড়ি সমারোহ হবার কথা, সেখানে এক নিথর স্তব্ধতা। যেন এই আড়ম্বর আয়োজনে উদ্দাম উত্তাল হয়ে ওঠা প্রাসাদটায় হঠাৎ কোন দৈত্য এসে মরণ কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেছে।

এই ভয়াবহতায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বর্তমানের গৃহকর্তা প্রসূন মুখার্জি, সেই পঁচিশ বছর আগের এক দুর্গাষষ্ঠির ভোরের মত, ঠাকুর দালানে ওঠবার সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। আজ আর দুহাতে মুখ ঢাকা নয় বটে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক কঠিন আবরণ। বোঝা যাচ্ছে না মনোভাবটা কি।

দালানের উপর ধারের দিকে বসে আছেন বর্তমান গৃহিণী মীরা মুখার্জি। পঁচিশ বছর আগের সেই দুর্গাষষ্ঠির দিনটায় যে মেয়ে কোথায় যেন পড়েছিল অচৈতন্য হয়ে। এখন তার মুখে একটা স্থির সংকল্পের আভাষ।

বাড়িতে একটি নবদম্পতি আছে, তারা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না।

তবে সাহস করে এগিয়ে এসে স্তব্ধতা ভাঙছে না। মরণকাঠির প্রভাবটা অবহেলায় মুছে দিয়ে 'জীয়নকাঠির' সন্ধান এনে দিচ্ছে না।

উঠোন ভর্তি ডেকরেটারদের চেয়ার পাতা আছে, উঠোনের চারদিক বিচিত্র আর বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত। চেয়ারগুলির মধ্যে অনেকগুলি দখল করে আছেন কিছু বয়স্ক ভদ্রলোক। পাড়ার এবং জ্ঞাতিবাড়ির। তার সঙ্গে পুরোহিতও।

কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এগিয়ে এলেন প্রসূনের খুড়তুতো কাকা প্রভাস মুখুয্যে। গলা ঝাড়া দিয়ে বললেন, বৌমাকে বল বাপু মনটা স্থির করতে। ঠাকুর মশাই বলছেন, দেউড়ি যখন আটক রয়েছে, খিড়কি দিয়েই নবপত্রিকা স্নান করিয়ে আনা হোক। উনি যখন বলছেন—

প্রসূন মুখার্জি একবার চোখ তুলে উঁচুদিকে তাকালেন।

চওড়া লালপাড় গরদ পরিহিতা নীটোল যৌবনা মীরা মুখার্জি স্থির স্বরে ঘোষণা করলেন, আমি তো বলে দিয়েছি ঠাকুর মশাই, পূজো হবে না। পূজোর ইচ্ছে আমার চলে গেছে।

মীরা মুখার্জিকে দেখে কেউ বলবে না ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে ওর। যেন পঁচিশ বছর আগে যে বাইশ বছরের বৌটি এখানে ঘুরে গেছে, সেই বৌ-ই সাজবদলে গিন্নী সেজে মঞ্চে উঠে এসেছে।···যেমন স্থির যৌবনা, তেমনি স্থির ঘোষণা।

ঠাকুর মশাই কুণ্ঠিত গলায় বললেন, বুঝছি মা। আপনার মনের অবস্থা বুঝছি। মহাষষ্ঠির দিন এই অশুভ ঘটনা। স্বয়ং ষষ্ঠিরবাহন। কিন্তু এই বিপুল আয়োজনের দিকে তাকিয়ে, আর জনসাধারণের মুখ চেয়েই এ বিধান দিচ্ছি। পূজো তো আগামীকাল। আজ কলাবৌ স্নানটা করিয়ে আনা হোক্ তারপর দেউড়ি সাফ্ করিয়ে, এখানে একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ণের ব্যবস্থা করে—

গৃহিণীর আগেই কর্তা বলে ওঠেন, দেউড়িই বা সাফ্ হচ্ছে কি করে? পঞ্চাশ টাকা থেকে একশো টাকায় উঠেছি, কেউতো ছুঁতেই রাজি হচ্ছে না। ডুলে পাড়া, বাগদি পাড়া সর্বত্রই নাকি লোক ঘুরে এসেছে।

এখন আবার প্রসূনের কাকা এগিয়ে আসেন।

বলেন, কি জানো বাবা, তুকতাকের ব্যাপারতো কেউ সাহস করছেনা। ডুলে বাগদি হোক আর যাই হোক, সবাই ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করে। তায় আবার দিনটা মোক্ষমতো মহাষষ্ঠির দিন, মাষষ্ঠির বাহন।

তারপর আবার গলাঝেড়ে বলেন, সেদিনই তোমায় আমি বলিনি বাবা? তুমি আবার বলছিলে ওকে নেমন্তন্ন করে পাঠাবে। এখন বুঝছো, আমাদের কথা সত্যি কিনা। মহা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ!

প্রসূন মিলন গলায় বলেন, কিন্তু গুণীনমাতো চলতে ফিরতে পারে না।

সাধারণ কার্যক্ষেত্রে পারে না—

কাকা উদ্দীপ্ত হন, কিন্তু এসব কর্মে ঘাড়ে পিশাচের ভর হয় তো। তার জোরেই।

প্রসূন আলগা গলায় বলেন, অথচ সেদিন এই এখানেই—

তার রহস্যতো তোমার কাকিমা বলে গেলেন কাল। নিজে মেরে নিজে বাঁচালো। এই যে বিতিকিচ্ছি কাণ্ডটি করে রেখে গেছে এর পেছনে কী মতলব আছে কে জানে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কর্তা স্খলিত স্বরে বলেন, আগে তো দেখেছি, আপনারা সকলেই খুব ভক্তিটক্তি—

ঠাকুরমশাই এবং তস্য বয়স্য কাকা মশাই দুজনেই সমস্বরে বলে ওঠেন, ওই তো! ওইখানেই তো বাহাদুরী। ভাবতে পারো বাবা একটা মুখ্যু নিরক্ষর ছোটজাতের মেয়েছেলে কতকাল ধরে এই অ্যাতো রাশি রাশি লোককে ঠকিয়ে খেয়ে এসেছে: শুধু এ গাঁ কেন দেশ দেশান্তর থেকে লোক এসেছে। এখন? এখন ধরা পড়ে গেছে স্বরূপটি। ···স্রেফ একটা ডাইনী। নইলে এই অ্যাতো বড় পূজোর দিন কিনা এই কর্ম করে।

কর্তা কি বলতেন কে জানে, গিন্নীর ক্লান্ত অথচ দৃঢ় স্বর ভেসে আসে, ওসব কথা থাক। এখনই একটা গাড়ির ব্যবস্থা হোক্ আমি খোকাকে বৌমাকে নিয়ে চলে যাবো।

চলে যাবেন? এখনই চলে যাবেন?

দু'দুটো আর্তস্বর যেন আছড়ে পড়ে আপনি এখনই চলে যাবেন? দালানে প্রতিমা বসে—

বসেই থাকুন। নয়তো বিসর্জন দিয়ে দিন—

এখন চেয়ার-আসীন জনগণ বলে ওঠেন, বিসর্জন! সে কী?—সেটা যে মহা অশাস্ত্রীয় হবে। দিকে দিকে সর্বত্র মা দালানে উপবীষ্টা—এখন বিসর্জন! ইস! তাহলে এই দালানেই পড়ে থাকুক মা!

যাঁরার স্বর উত্তপ্ত, এই যখন তাঁর ইচ্ছে—

দুর্গাষষ্ঠির দিন সকালবেলা দেউড়ির সামনে মা ষষ্ঠির আসল বাহন মিশকালো এক কালো বেড়ালের ছানাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে এঁরাই শিউরে উঠেছিলেন বেশী, এঁরাই বিভীষিকা দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন সবাইকে। ঢাকী-ঢুলীরা এঁদের নির্দেশেই বাজনা থামিয়ে ফেলেছিল, আর এঁরাই বলেছিলেন, যা সবাই, সেই শয়তানী ডাইনী বুড়িকে মারতে মারতে ধরে আন, তুলে নিয়ে যাক, ওই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাকে। এখন তাঁরাই আবার পূজো হবে না শুনে বিচলিত হচ্ছেন।

অশাস্ত্রীয় কাজ তো করা চলে না।

সেই যে কবে একদিন বাজারের পথে তিনমাথার মোড়ে, কে একটুকরো কলাপাতার ওপর পাঁচটা জবাফুল বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, ছুঁয়েছিল কেউ? টান মেরে ফেলে দিয়েছিল? আর ভুলে ভুলে কি ডিঙিয়েই ছিল? ঘুরে অন্যপথে বাজার গেছে।

কে না জানে, ডিঙোলেই অন্য কারও দুরারোগ্য ব্যাধি তার শরীর থেকে তোমার শরীরে এসে ঢুকে পড়বে।

কে জানে সে কাজই বা কার?

ওই ডাইনী লোক দেখিয়ে চলৎশক্তিহীনের ভান দেখায় কিনা কে বলতে পারে? পিশাচে ভর করে হয়তো রাতচরা হয়ে বেড়ায়।

তা কতক্ষণ পরে যেন ছুটো ছাগলে সেই জবা কলাপাতা সব সাফ করে ফেলেছিল তাই রক্ষে। তবু ছু'পাঁচদিন লোকে সেই জায়গাটা এড়িয়ে পা ফেলেছে।

ভগবান জানেন ছাগল ছুটো কোন ছুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে গেল কিনা। 'অ্যাজমা' কি 'ব্লাড্ ডিসেন্ট্রি', 'টি· বি.' কি 'ক্যানসার।'···

কিন্তু ফুল পাতা নির্মূলের তো তবু দৈব প্রেরিত প্রাণীর ভরসা। কালো বেড়ালের উপায় কি?

ওকে তো আর ছাগলে খেয়ে যাবে না।

প্রথম দর্শক কেয়ারটেকার বৈকুণ্ঠ ঘোষ।

ভোরে গেটের চাবি খুলতে এসে আঁৎকে উঠে এমন ডাক হাঁক শুরু করেছিল যে সেই ভোর রাত্রির শান্ত শান্তি যেন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল। তবে তখন গোলমাল শুনে নবদম্পত্তি সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে এসে বলে উঠেছিল, কী আ-শ্চর্য! এই নিয়ে এতো হৈ চৈ? রাস্তায় মরা কুকুর বেড়ালের ছানা পড়ে থাকতে দেখেনি কেউ?

বিজ্ঞরা সে কথা শুনে তাদের ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

দেখবে না কেন! দেখেছে। গাড়ি চাপা পড়ে মরে থাকে, ছু'দলে ঝগড়া খেয়োখেয়ি করে মরে পড়ে থাকে। কিন্তু ছুর্গাষষ্ঠির ভোরে পূজোবাড়ির ঠিক গেট-এর সামনে মিশকালো এক বেড়ালছানাকে গলায় জবার মালা, আর কপালে সিঁছুরের ফোঁটা পরে মরতে আসতে দেখেছে কেউ কখনো?

নাঃ। একথা স্বীকার করতেই হলো, এমন দৃশ্য কেউ কখনো দেখেনি। সুইসাইড্ করবার জায়গাটা আবিষ্কার করেছে বটে ছানাটা।

আমেরিকা ফেরৎ ছেলে বলল, দূর! 'তুকতাক' আবার একটা কথা নাকি? আমি ও সব বিশ্বাস করি না। কেউ না ছোঁয়, আমি টান মেরে ফেলে দিয়ে আসছি। বল তো চানও করে ফেলতে পারি।

লরেটো পড়া বৌ তার হাত চেপে ধরে বললো, কী দরকার তোমার এতো বাহাত্বরীতে? কিসে কি হয় কে জানে। মরা বেড়াল ফেড়ালে জার্ম থাকতে পারে। মানলাম। কিন্তু এই সব তুকতাক তুমি বিশ্বাস করো?

মোটেই না। তবে চিরকাল এসব চলেও তো আসছে। ও নিয়ে তাল ঠোকার দরকার কি? কখনো ওদিকে যাবে না তুমি।

দৃশ্যটার বীভৎসতায় তার গা গোলাচ্ছিল।

দু'জনেই তাই আবার শয়নকক্ষেই ফিরে গেছে। সেখানে হয়তো দেশের এই সব কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

॥ ১২ ॥

গুঞ্জন ধ্বনি উঠল চারিদিক থেকে।

বোধন বসে গেছে, মহাপূজার সব আয়োজন সম্পূর্ণ, আর এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। অপূজিতা মাকে ঠাকুর দালানে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া! এ কী একটা কথা হল?

মীরা মুখার্জি সংকল্পে অটুট। বলছেন—

আমারই অন্যায় হয়েছিল, পূজোর সাধ করা। শ্বশুর শাশুড়ী যখন তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ঠাকুর আর এ বাড়িতে পূজো নেবেন না। খরচ অপচয় হলো অনেক। তা' সেটা ভুলের খেসারৎ বলে ধরতে হবে।...গাড়ির ব্যবস্থা করা হোক্, আমি এখুনি খোকাকে বৌমাকে নিয়ে চলে যাব।...আপনাদের ছেলের ইচ্ছে হয়, শান্তি-স্বস্তেন করে নিয়ে করুন পূজো।

ছেলে দাঁড়িয়ে উঠলেন একটা অ্যাবসার্ড কথা, বলার কোনো মানে হয় না।

আমার থাকাটাও অর্থহীন।

তা'হলে প্রতিমা?

ঠাকুর মশাই তো রইলেন। যা করবার করবেন। খরচার টাকা রেখে যাচ্ছি। এই সব সাজ গোজ ?

ডেকরেটাররা খুলে নিয়ে যাবে। তাদের পাওনা তো পেয়েই গেছে।

আর কেটারাররা ?

যা এনেছে উঠিয়ে নিয়ে যাক। লোকসান পুষিয়ে দেওয়া হবে।

সকলেরই সব লোকসান পুষিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু আশাহত নিমন্ত্রিত গ্রামবাসীদের ?

তাদের কথা কেউ ভাবছে না।

'লৌকিকতার' ভারবিহীন তিনদিন ব্যাপী একটা নিষ্কণ্টক নিমন্ত্রণের আশায় যারা দিন গুনছিল।

কি আর করা। তাদের কপাল।

তারা অতঃপর কিছুদিন ধরে এঁদের এই আচরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে ডিবেট চালাবেন। আর নতুন রং করা বুড়ি বাড়িটা আবার ধীরে ধীরে রং হারিয়ে বার্দ্ধক্যের চেহারায় ফিরে যাবে। আর যে কখনো আসবে এরা এমন মনে হয় না। তবে বাড়িটাকে একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে শোধন করে যাওয়া দরকার।

কে বলতে পারে, ওই মৃত কালো বেড়ালের আত্মা ওঁদের পিছু পিছু ধাওয়া করবে কিনা।···অলক্ষ্যে ওঁদের মোটরেও উঠে বসতে পারে।

'কালো বেড়ালের আত্মা' একটা পৃথিবী জানিত ভীতির বস্তু।

তা' করতেই যদি হয় তার ব্যবস্থা-তাড়াতাড়ি হোক।

এ বাড়িতে যখন রান্নাবান্না হবে না। বেলা হলে অসুবিধে।

কিন্তু সেই বুড়িকে এখনো এনে ফেলছে না কেন ?

ধরে হোক বেঁধে হোক।

মারতে মারতে, তাকে তার 'তুকতাক' তুলিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য

করতে হবে। অতঃপর জায়টাকে গোবর গঙ্গাজল এবং অগ্নিশুদ্ধ করে নিয়ে শান্তি স্বস্তয়ন যাহোক একটা কিছু করে ছেড়ে দেওয়া মুখুয্যে পরিবারকে।

কিন্তু কোথায় সেই ভয়ঙ্কর অপরাধের নায়িকা?

তাকে নিয়ে এসে হাজির করছে কই?

না তাকে আর হাজির করে উঠতে পারেনি ওরা। যাদের ধরে আনতে পাঠানো হয়েছিল। মহেআহে গিয়েছিল যারা, স্বভাবতঃই তারা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার দল।···বেঁধে আনার হুকুম পেলে আর একটু বাড়াবে—

এটাই স্বাভাবিক।

তারা অতএব 'পিটিয়ে লাশ,' করে 'মেরে তক্তা বানিয়ে' নিয়ে এসেছে।

অবশ্য ঠিক 'নিয়ে' আসা বলা চলে না।

পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে রেখে এসেছে। চিরকালের শয়তান একটা সর্বনাশিনী ডাইনিকে যখন হাতে পাওয়া গেছে, হাতের সুখ করে নেবে না?

অতঃপর রেখে এসেছে সেই ভাঙা ঝরঝরে দাওয়াটায়। যেখানে একটা চটা ওঠা কলাই করা বাটি ছাতু না কি যেন গায়ে মেখে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

রেখে এসে হাতের ধুলো ঝেড়ে বলল, চোখরাঙিয়ে—ডাকাডাকি করতে ভয়েই মরে গেল বুড়ি। ঘরে ঢুকে দেখি মরে রয়েছে।

কিন্তু তা বললে তো হবে না। পড়ে থাকলে তো চলবে না।

দেশে আইন নেই? পুলিশ নেই? তারা এলো, এবং 'নিয়ে' তারাই গেল বেঁধে ছেঁদে।

মর্গের রিপোর্ট অবশ্য 'ভয়ে'র কথা তোলেনি।

বলেছে। 'অপুষ্টি জনিত মৃত্যু।'

একদা এদেশে দোহাত্তা লোকে পীলে ফেটে মরতো এখন দোহাত্তা 'অপুষ্টি জনিত'য় মরে। অতএব এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যুই বলতে হয়। দোহাত্তাই যখন ঘটছে। আর বুড়ির চেহারাও তো রিপোর্টের পক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেখে কি কেউ বলতে যাবে, ঘুষ খেয়ে রিপোর্ট দিয়েছে।

তবু জগতে মন্দ লোকের তো অভাব নেই?

তাদের কাজই অকারণ বিষোদগার।

দু'একটা দুষ্টমতি খবরের কাগজ, এমনি বিষোদগার করে বসলো। অক্টোবরের কোন একটা তারিখে ফলাও করে বেরোলো।

'এমনও হয়। এই উনিশশো উনআশীতে'ও হয়। কলিকাতার অতি নিকটবর্তী একটি গ্রামে, 'ডাইনি' সন্দেহে এক বুড়িকে পিটাইয়া মারা হইয়াছে।...বুড়ির আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, অতএব পুলিশী তদন্তেরও প্রয়োজন হয় নাই। পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

এই আমাদের দেশ।

অগ্রসর দেশের মানুষরা যখন গ্রহে গ্রহান্তরে পাড়ি দিবার সাধনা করিতেছে, তখন আমাদের দেশে এক গরীব অসহায় বুড়িকে 'ডাইনি' বলিয়া পিটাইয়া মারিয়া কেহ লজ্জিত হইতেছে না।.....অথচ এই গ্রামে শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই।...

অপর একটা কাগজ আবার আরো সরস করে বলেছে, যদিও এই গ্রাম বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া বিজ্ঞানের সুখ সুবিধাগুলি দ্রুত করায়ত্ত করিতেছে, এবং ক্লাবে লাইব্রেরীতে জনসভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বন্যা বহাইয়া, নিজেদেরকে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তথাপি—যাক খবরের কাগজের কথা কে ধরে।

ওদের কাজই তো তিলকে তাল করা।

হ্যাঁ তিল থেকে তাল করা, ভদ্র ব্যক্তিদের বৃথা অপদস্থ করা, পুলিশকে হ্যানস্থা করা, এবং কথায় কথায়! 'হায়! এই আমাদের দেশ' বলে আক্ষেপ করা। এই তো পেশা ওদের?

খবরের কাগজের কথায় কান দিলে চলে না।

তবে হ্যাঁ তিল থেকে যে তাল হয় না তা নয়। এই সাগরপুকুর গ্রামেই তো দেখা গেল তার দৃষ্টান্ত।

একটা নিহত বিড়াল শিশুর মৃতদেহ সারা গ্রামখানাকে তোলপাড় করে তুলতে সক্ষম হলো, কলকাতা থেকে আনা বহুমূল্য দেবী প্রতিমার মানতি পূজোর বহুমূল্য আয়োজন খতম করে দিলো, এবং একটি রাজসূয় যজ্ঞ পণ্ড করে ছাড়ল। এই শেষেরটায় গ্রামসুদ্ধ লোক তো কম আহত আশাহত হয় নি।······এমন কি, যে লোকেরা ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলো ভেবে উৎফুল্ল হচ্ছিল, তারাও ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবল, এতোটা হবে কে জানতো।

তবে হলোতো? ঐ তিল থেকেই হলো।

এই উনিশশো উনআশীতেও হলো।

আর ভয়ের কারণ নির্মূল হলেও এখনো লোকে স্টেশন যাবার ওই সহজ পথটা পরিত্যাগ করেই রেখেছে, সাইকেল আরোহী আরোহিনীরাও পর্যন্ত।······ঘুরপথেই যাতায়াত করছে তারা।

কে না জানে, ওই ঢিবি জমিটার ওপর ফণী মনসার বেড়া ঘেরা চালা খসে পড়া ভাঙা দাওয়াটায় নিরয়বব একখানা ছায়ার গায়ে আগুনের ঢেলার মত দুটো চোখ পথ চলতিদের রক্ত চুষতে রাতদিন জেগে বসে থাকে।······'গ্রাম' তো নামেই, প্রগতির কমতি নেই। তবু—

মার্কসবাদ কোনো কাজে লাগেনা, কাজে লাগে না ইংলিশ মিডিয়াম।

——

জোচ্চোর

ট্রেন থামার আগেই নিজের সাইট ব্যাগটা কাঁধে জম্পেস করে তুলে নিয়ে, আর সুদত্তার স্যুটকেসটাকে বাগিয়ে ধরে দরজার কাছে চলে এসেছিল প্রবাল সুদত্তাকে হাতের ইঙ্গিতে অনুগামিনী করে নিয়ে। থামা মাত্রই খালি হাতটা বাড়িয়ে সুদত্তাকে প্রায় হিঁচড়ে টেনে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

টেনে নামানো ছাড়া উপায় কি? ট্রেন তো এখানে মাত্র এক মিনিট থামে। আর লাফানো ছাড়াই বা উপায় কি? প্ল্যাটফর্ম বলতে তো ট্রেনের দরজা থেকে অনেকটা নীচে এবড়ো-খেবড়ো খানিকটা জমি।

নামার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা ঘস্‌ঘস্ করে বেরিয়ে গেল। সুদত্তা সেই দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হাঁফ-ছাড়ার মতো একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, বাবাঃ, এমন ভাবে টেনে নামালে যেন নারীহরণের নায়ক! এদিক ওদিক থেকে হৈ-চৈ করে লোক ছুটে এলে আশ্চর্য হতাম না।

আমি হতাম। প্রবাল কাঁধের ঝোলাটা আবার টেনে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে পা চালানো শুরু করে বলল, নারীহরণ হচ্ছে দেখে ছুটে আসবার মতো লোক ধারে-কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে?

সত্যি, স্টেশন এত চুপচাপ কেন!

এক মিনিট স্টপেজের স্টেশনে কত জনসমাগম আশা কর?

আশা-টাসা কিছু করছি না। সুদত্তা বলল, ভাবনা করছি কতখানি হাঁটাবে। গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

প্রবাল হাসল, এখনি ভয় ধরছে? একপা-ও তো হাঁটনি এখনো।

সুদত্তা রেগে উঠে বলল, হাঁটতে ভয় পাচ্ছি না কি আমি?

তবে?

তবে আবার কি? এখন এই দুপুর রোদে, সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটাটা খুব আরামদায়ক হবে কিনা সেটাই ভাবা হচ্ছে। কতটা রাস্তা কে জানে!

আমি তো জানি।

আহা, কতই জানো। নিজেই বলেছ দশ বছর পরে এই আসছ। সবকিছু মনে আছে যেন।

দশ বছরের বিরতিতে মামার বাড়ির রাস্তা ভুলে যাব?

ছেলেরা এ সব খুব তাড়াতাড়িই ভোলে।

ছেলেদেব সম্পর্কে এমন জোরালো অভিজ্ঞতাটি কবে হল?

হিসেব দিতে হবে না কি?

নাঃ। প্রবাল কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তেমন সৌভাগ্য করে কি আর পৃথিবীতে এসেছি?

সুদত্তা ঘাড় বাঁকিয়ে ওকে দেখে নিল। রোদ পড়ে প্রবালের ফর্সা মুখটা আরো ফর্সা লাগছে, কপালে ঘাম জমেছে ছোট ছোট ফোঁটায়।

সুদত্তা শাড়ির আঁচলটা টান-টান করে কোমরে এঁটে নিয়ে বলল, স্যুটকেসটা এবার আমায় দাও তো।

প্রবাল গম্ভীর ভাবে বলল, কেন? টাকা-কড়ি গহনা-পত্র অনেক আছে বুঝি?

তার মানে?

মানে তো সোজা। অন্যের হাতে রেখে স্বস্তি পাচ্ছ না।

পাচ্ছি না-ই তো। সুদত্তা রেগে রেগে বলল, ঝোঁক করে চলে তো এলাম, এখন এই ক'টা দিনই তোমার সঙ্গে আমার বনলে হয়। যা না তুমি।

চমৎকার! দোষটা আমারই হল তাহলে?

ওঃ বলতে চাও আমিই ঝগড়াটি?

আমি তো কিছুই বলতে চাইনি। নিঃশব্দেই যাচ্ছিলাম।

বেশ নিজে খুব ভালো। সুদত্তা বলল, বীরপুরুষ তো এইটুকু স্তা এতটুকু একটা স্যুটকেস বয়েই ঘামতে শুরু করেছেন।

প্রবাল সুদত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

সুদত্তারও কপালে ঘাম জমে উঠেছে।

চুলের গোড়ায় গোড়ায় ভুরুর খাঁজে, চোখের কোলে।

সুদত্তার রং শ্যামলা, তবু রোদের আঁচে লাল্‌চে হয়ে উঠেছে।

প্রবালের ইচ্ছে হল পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘামটা মুছিয়ে য়। কিন্তু পাগল তো নয় প্রবাল, তাই এই দৌলতপুর হেন গুগ্রামের রাস্তার মাঝখানে এমন একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বসে। সীমানায় লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন হূর্তে মাটি ফুঁড়েও মানুষ উঠে পড়ে এটা তো ঠিক। মমতাটুকু এখন তোলা থাক।

অতএব তুষ্ট বুদ্ধিকেই প্রশ্রয় দেওয়া যাক। স্যুটকেসটাকে একটু লে ধরে তুলিয়ে বলল, খুব এতটুকু অবশ্য নয়। ভেতরে ক'ডজন াড়ি ভরা হয়েছে? ডজন তিন চার? না আরো বেশি?

ডজন তিন চার? আরো বেশি? কেন, আমি কি তোমার ামার বাড়িব দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাস করতে এসেছি? ক'টা াড়ির ভার এত ভার? সুদত্তা আচমকা প্রবালের হাত থেকে ্যুটকেসটায় হ্যাঁচকা টান মেবে মাটিতে নামিয়ে ফেলেই হি হি করে হসে বলে ওঠে, এ মা! কী বোকা! বয়ে নিয়ে যাবার দরকার কি ছিল? এটার তো চাকা রয়েছে। টেনে নিয়ে গেলেই তো হল।

প্রবাল ওর হেসে গড়ানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সুদত্তার াসিটা একেবারে মার-কাটারি। হাসিটা দেখলে মনে থাকে না দত্তা ফর্সা কি কালো, সুদত্তার চোখ দুটো বড় বড় ভাসা ভাসা না ছোট ছোট নাচুনে মার্কা।

কিন্তু সুদত্তার হাসিটি কি সুলভ? সুদত্তা এ যুগের তরুণীদের তো ভুরু প্লাক করে না, তার নিজস্ব ধনুকাকৃতি ভুরুজোড়া প্রায় র্বদাই উঁচিয়ে রেখে কথা বলে। তবু সুদত্তা কী অদ্ভুত আকর্ষণীয়া।

প্রবাল অবশ্য এই পরম সত্যটি প্রকাশ করে না, বরং সুদত্তাে ক্ষেপিয়ে তার ভ্রুধনুটি আরো উৎক্ষিপ্ত করিয়ে মজা দেখে। এখ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, চাকাটার সাহায্যে কি টেনে নিয়ে যাবা ভূমিকাটা পোষা কুকুরের ম্যাডাম!

পোষা কুকুরের!

হ্যাঁ। তা জানো না তুমি? স্যুটকেসের তলায় চাকা লাগানো ফন্দীটা মাথায় আনা হয়েছিল কুকুরের কথা ভেবেই।

কে বলেছে তোমায় এমন অদ্ভুত কথা! ওটা বানানোর উদ্দে কুলির কথা না ভেবে নিজের ভার নিজে বইবার জন্যে। বুঝলে মশাই।

ওটা তোমার ভুল ধারণা। প্রথম যখন ওটা হাটে-বাজারে ছড়া অ্যাডভার্টিজমেন্টের ছবি দেখেছিলে? নব-দম্পতি হনিমুন-এ যাচ্ছে প্রেমে ভাসতে ভাসতে, পিছনে পোষা কুকুর। আর তার পিছনে ঢাউশ এক স্যুটকেস চলেছে কুকুরের মুখে চেপে ধরা দড়ির টানে তা নইলে হয়তো আর কারো টানে অন্য দিকে চলে যেতো।

কই, এমন ছবি আবার কবে দেখলে তুমি? আমি তে দেখিনি।

আহা সবই কি আর সবাই দেখতে পায়? চোখ সজাগ থাক চাই।

সুদত্তা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলে ওঠে, যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছ মানে? এটা হনিমুন অভিযান?

প্রবাল বলতে যাচ্ছিল, আহা সেই মনোরম অবস্থাটা ভাবলেই বা ক্ষতি কি। বলল না। বরং বলে উঠল, কী সর্বনাশ! এ কথা আবার কখন বললাম? বলেছি, যারা যায়, তাদের পক্ষে মালপত্র সামলাতে একটা পোষা কুকুর এসেনসিয়াল। আর তার কথা ভেবেই এই স্যুটকেসে চাকার আবিষ্কার। তবে যদি বল, যে কোন পোষ্যপ্রাণী হলেও কাজ চলে যায়, তাহলে অবশ্য—

এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, চাকা যে খুব মসৃণ ভাবে এগোতে পারছিল তা নয়। সুদত্তা থেমে পড়ে বলে, এই ভাবে ইয়ার্কি মারতে মারতে হাঁটলে পৌঁছতে ক'ঘণ্টা লাগবে খেয়াল আছে ?

যতক্ষণ লাগে ততক্ষণটাই লাভ। গিয়ে পড়লেই তো সেই সমাজ সংসার সভ্যতা ভদ্রতা।

আহা, কী একেবারে সুখকর অবস্থা।....সুদত্তা বলে ওঠে, তাই ভাবতে হবে 'সমাজ সংসার মিছে সব' এর নাম তোমার নব ফাল্গুন! মলয় বাতাসের বহর বটে! আর রোদের তাত জুন মাসকেও হার মানাচ্ছে।

প্রবাল ঘড়ি দেখল। বেলা দেড়টা। প্রখর রোদেরই সময়। আর পাড়াগাঁয়ের রোদের তাত বেশী। রাস্তা আর বেশী নেই, কিন্তু এটুকুও সত্যিই কষ্টকর।

হঠাৎ যেন ভুঁইফোঁড়ের মতো একটা সাইকেল বোঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। আরোহীর জামার লাল রংটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো চোখ ঝলসে দিয়ে।

সুদত্তা বলে উঠল, আরে সাইকেল-ফাইকেল আছে তাহলে তোমার মামার বাড়ির দেশে ?

দেশটাকে ভাবছ কি ? নেহাৎ একটা অসময়ে এসে পড়েছ তাই। ছেলেবেলায় যখন আসতাম, যথেষ্ট সমারোহময় অবস্থা দেখেছি। বড়মামার আবার একটা টমটম জাতীয় ঘোড়ার গাড়ি ছিল। তিনি তাতে চেপে রোগী দেখতে বেরোতেন।

আছেন এখনো তিনি ?

কে বড়মামা ? নাঃ। বড়মামা বিগত, মেজমামা সপরিবারে কানপুর-বাসী। ছোটমামা জাপানে গিয়ে সেখানেই সেট্ল করেছেন। বড়মামার ছেলেরা কলকাতায় থাকে।

ও মা, তবে তোমার মামার বাড়িতে আছে কে ?

কেন, আমাদের সেই বিখ্যাত নেবুমাসী আছেন। যাঁর কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে তুমি দেখতে আসতে চাইলে।

সুদত্তার হঠাৎ মনে হল কাজটা বোকার মতো হয়ে গেছে। অথচ তখন ভীষণ আগ্রহ অনুভব করেছিল যখন প্রবালের কাছে শুনেছিল তার ছেলেবেলায় মামার বাড়ি মানেই ছিল নেবুমাসী। আর তাঁর নিতান্ত নির্বেদেই নাকি ক'দিনের জন্যে মামা বাড়ির দেশে যাচ্ছে প্রবাল।

নেবুমাসি নাকি বাল্যকালে এমন সুন্দরী ছিলেন যে হেতমপুরের না কোথাকার যেন রাজা সন্ধান পেয়ে ছেলের বৌ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নেবুমাসীর বাবা সে অফার নেননি। অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন। বলেছিলেন না কি রাজবাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর মেয়েকে বেচে দেওয়া সমান। মেয়ে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হবে না, সাতজন্মে বাপের বাড়ি আসতে পাবে না। আমার একটা সন্তান লোভে পড়ে বিসর্জন দেব?

তা এমন অহঙ্কারের কথা মানাতোও তাঁর মুখে। এই সা দৌলতপুরটাই ছিল তাঁর অধিকারভুক্ত। বনেদী জমিদার। তৎপরে তিনি তখনকার কালে মেয়েকে প্রায় অরক্ষণীয়া করে তুলে বি দিয়েছিলেন এমন ঘটা করে যে নেবুমাসীর বিয়ের ঘটার গ দৌলতপুরের প্রায় একটা ঐতিহাসিক গল্প হয়ে থেকেছে অনেক কাল। প্রবালদের তো শুনে শুনেই মুখস্ত ছিল।

বলে বসেছিল সুদত্তা, আমি যাব তোমার সঙ্গে—।

কিন্তু সে উৎসাহ কি শুধুই ওই ঐতিহাসিক গল্পের আর সে গল্পে নায়িকাকে চাক্ষুষ দেখার আগ্রহে? তাহলে এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন কাজটা বোকার মতো হয়ে গেছে?···আর নিজেকে তলিয়ে দেখে মনে হচ্ছে কেন এই একটা ছুতোয় ছুটির ক'টা দিন প্রবালের সান্নিধ্যের আশাতেই তার এই ঝাঁপিয়ে পড়া। অবশ্য জেদটা আরো বেড়ে উঠেছিল প্রবালের প্রতিকূল বাণীতে।

সে যাবে শুনে প্রবাল তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল

তুমি যাবে? তাহলেই হয়েছে! থাক!

হয়েছে মানে? কি হয়েছে?

ব্যাপারটা অসম্ভব তাই বলছি।

অসম্ভবটা কিসে?

আরে বাবা সে একটা অজ পাড়া-গাঁ। বেণুদা সেদিন বলেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না কলকাতার প্রায় নিকটবর্তী এখনও এমন জায়গা আছে, যেখানে সভ্যতার আলোক স্পর্শ করেনি।

সভ্যতার আলোকের দাহ তো জন্ম থেকেই অনুভব করছি, একটু অন্ধকারের শীতলতাই দেখা যাক না। আর তোমাদের সভ্যতা তো ক্রমশই পিছু হেঁটে হেঁটে আলোক থেকে অন্ধকারের দেওয়ালে গিয়ে ঠেকছে।

আহা এ সব তো পুঁথির বুলি, প্র্যাকটিক্যাল কথা হচ্ছে জায়গাটায় এখনো ইলেকট্রিসিটি যায়নি।

খুব বেশী তফাৎ মনে হচ্ছে কি? তোমার এই সাধের শহরে সেই ইলেকট্রিসিটির দাক্ষিণ্য কতক্ষণ?

তবু প্রবাল আরো কত কি বলেছিল, বাড়িটা ভীষণ পুরনো, কাজ করার লোকজন আছে কি নেই কে জানে ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের মাথায় সুদত্তার এই প্রস্তাবটা তার কাছে পরম লোভনীয় মনে হলেও নিবৃত্ত করার বেশ খানিকটা চেষ্টা করেছিল প্রবাল। কারণ জানে তো এখনও পল্লী-সমাজ' বস্তুটা একেবারে তিরোহিত হয়নি। ওর সঙ্গে সুদত্তাকে দেখলে—

কিন্তু প্রবাল যত নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে সুদত্তার জেদ ততই প্রবল হয়ে উঠেছে। এটাই তার প্রকৃতি। ও বলেছে, তুমি ভাবছ অসুবিধেকে আমি ভয় খাই? যে কোন অবস্থার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেবার ক্ষমতা আমার আছে! শুধু নাম-করা শহর খুঁজে বেড়াতে যাব, নামী-দামী হোটেলে গিয়ে উঠব, গাড়ি চড়ে দ্রষ্টব্য দেখে বেড়াব, একে আমি বেড়ানোই বলি না। ছেলেবেলা থেকে এই নিয়ে মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় আমার। আমার ইচ্ছে হয় সেকালের

গা পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙোই, গ্রামে গ্রামে যা-হোক তা-হোক করে ঘুরে বেড়াই। তবে তোমার যদি আমায় তোমার মামাবাড়িতে নিয়ে যাবার কোন বাধা থাকে তো আলাদা কথা।

এরপর আর ঠেকাবার চেষ্টা করা চলে না।

এবং সত্যিই যখন মা বাপের অনুমতি আদায় করে সুদত্তা প্রবালের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, তখন অপূর্ব এক পুলক রসে মন কাণায় কাণায় ভরে উঠল।

সেই ভরা মনটাকে কি এখন ব্যাহত করবে প্রবাল সুদত্তাকে মনে করিয়ে দিয়ে যে, গ্রামে গ্রামে যেমন তেমন করে বেড়ানো রোদের আঁচ বাঁচিয়ে সম্ভব নয়।

- বরং বলল, আশ্চর্য, দূরে দূরে অত ঝোপ-জঙ্গল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; অথচ রাস্তায় একটাও ছায়াশীতল বৃক্ষতল নেই যে তার তলায় তলায় হাঁটা যাবে। তোমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

সুদত্তা ভুরু তুলে বলল, শুধু আমার? কেন, আমিই বুঝি মোমের পুতুল? নিজেরও যে এদিকে শার্টের পিঠ ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ফ্লাস্কের জলটা ট্রেনেই ফুরনো হল।

আমি ভেবেছিলাম স্টেশনে অরেঞ্জ স্কোয়াশ জাতীয় কিছু একটা খেয়ে নেওয়া যাবে। এতদিনে কি আর এটুকু উন্নতি হয়নি? তা দেখছি—

ওদের কথার মাঝখানে আবারও হঠাৎ সেই লাল শার্ট-বাহী সাইকেলটা বোঁ করে ঘুরে এসে এদের কাছে দাঁড়াল।

সুদত্তা নীচু গলায় বলল, দুর্বৃত্ত বলে মনে হচ্ছে।

প্রবাল হাসল। তাকাল লাল শার্টের দিকে।

লাল শার্ট বলে উঠল, পলুদাদাবাবু তো?

হুঁ। তুমি কে?

আমি বাচ্চু! মণিরাম পালের নাতি।

আরে তাই নাকি? তা তুমি আমায় চিনলে কি করে?

বাচ্চু একটু আত্মতৃপ্তির মধুর হাসি হেসে বলল, অনুমানে।...

ইস্টিশান মাস্টারের লোক গিয়ে বুড়ো দাত্তুকে খবর দিল, সে যাক! কথা পরে হবে। এখন রেক্‌শোটায় চড়ে পড়ুন।

রেক্‌শো! এই অভাবিত শব্দটি শুনে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখল এরা, সত্যিই একটা সাইকেল রিক্‌শা চলে আসছে স্টেশনের দিক থেকে।

প্রবাল বলল, এটিকে কোথায় পেলে হে?

আজ্ঞে দাদাবাবু ইস্টিশানের ওধার থেকে।

কই, আমি তো একখানার ছায়াও দেখতে পেলাম না।

ইদিকে আর কোথায় পাবেন দাদাবাবু? ইদিকটা তো ওঁচা দিক। উই দোক্‌খিন দৌলতপুরের দিকে যা কিছু বোলবোলা। উদিকে সিনেমা হল রয়েছে তো। ইলেকটিক্ এয়েচে।

সুদত্তা মুচকি হেসে নীচু গলায় বলল, শুনে প্রাণে ভরসা পাচ্ছি। দেখ তোমার আর আক্ষেপের কিছু নেই, সভ্যতার আলোক যথেষ্ট পরিমাণেই এসে পোঁচেছে। সাইকেল রিক্‌শায় উঠে পড়ল ওরা।

বাচ্চু রিকশাওলাটাকে বলল, নন্দদা, তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি।

আর রিক্‌শাওলাটা নিজের আসনে উঠে বসতে বসতে বলল, কাপড়ের আঁচলটা সাবটে নিন বৌদি, পুরাতন গাড়ি, পেরেক ফেরেক আচে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

সুদত্তা বিরস গলায় বলল, বৌদি মানে?

বাঃ, আমি কি করে জানব? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

ওর ভুল ভাঙাতে হবে কিনা?

প্রবাল নড়ে চড়ে বসল। সুদত্তার রাগ রাগ মুখের দিকে তাকাল। তারপর উদাস অবহেলার গলায় বলল, পৃথিবীতে কত লোক তো কত ভুল ধারণা নিয়ে জীবন কাটিয়ে ফেলছে, তখন তুচ্ছ এই নন্দদার এই ক্ষণিকের ভুলটুকু ভাঙল আর না ভাঙল তাতে ক্ষতি কী?

ক্ষণিকের মানে?

মানে আর কি! ও তো আমাদের লাহিড়ীবাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে দিয়েই, আবার সেই ওর দোক্‌খিন দৌলতপুরে ফিরে যাবে।

তাই বলে ও এই সব যাতা বলবে?

ওঃ যাতা! প্রবাল একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার অবশ্য তা মনে হয়নি। আচ্ছা দিচ্ছি ভুল ভাঙিয়ে। বলে গলাটা একটু বাড়িয়ে ডাক দিল, ওহে শুনছ, ও নন্দদা—

সুদত্তার এখন অস্বস্তি হল। কি না কি বলে বসবে কে জানে। বিশ্বাস নেই ওকে। তাড়াতাড়ি ওর পিঠে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আচ্ছা থাক, আর হৈচৈতে দরকার নেই।

প্রবাল কান দিল না ওর কথায়, আবার ডাক দিল, ও নন্দদা!

সুদত্তা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। যা ছেলে, সুদত্তাকে জব্দ করতে হয়তো বলে বসবে, শোন, একে বৌদি বলায় ভীষণ চটে গেছেন। আসলে তো বৌদি নয়।

নাঃ ওই বিরক্তি দেখানোটা ঠিক হয়নি। ভাবল সুদত্তা, যাচ্ছি তো এক রিক্‌শায় দিব্যি পাশাপাশি। পাড়াগাঁয়ের লোক, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে আবার কি ভেবে বসবে কে জানে! ইস!

নন্দ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, দাদাবাবু কিছু বলছেন?

হ্যাঁ বলছিই তো, না হলে ডাকব কেন? বলছি—

সুদত্তার বুক ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। সুদত্তা জোর করে হালকা হবার চেষ্টা করে। আর তখনই শুনতে পায় প্রবালের গলা, বলছি দেশলাই আছে তোমার কাছে? আমারটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল।

দেশলাইটা বাড়িয়ে ধরে নন্দ বলল, থাকছেন তো ক'দিন?

ক'দিন আর কি? দিন চার পাঁচ।

নন্দ আস্তে আস্তে প্যাডেল করতে করতে পরিচিতের ভঙ্গীতে গ্রাম্য অন্তরঙ্গ সুরে বলল, থাকলে পাত্তেন দু-দশ দিন! জন মনিষ্যি তো আসে না। ওই ভগ্নো অট্টালিকেয় শুদু দুটো বুড়ো মনিষ্যি। আপনাকে পেয়ে বত্তে যাবে।····ক'দিন আগে শুনেচি আসচেন। বৌদির কতা শুনি নাই, তো ভালই হল। শহরের মেয়ে, গাঁ ঘর

দেকুন একবার। তা এসে য্যাখোন পড়েচেন, বুড়ি সহজে ছাড়লে হয়।

বোঝা যাচ্ছে নন্দ একটু বাক্যবিলাসী। কিন্তু ব্যাপার তো বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। প্রবাল ভয়ে আর সুদত্তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না। নন্দকে থামানোর জন্যেই আলগা গলায় বলে, উপায় নেই। ছুটি নেই বেশী।

ওই তো—নন্দ দার্শনিক গলায় বলে, এই তুরন্তো যুগে এক তিল ছুটি তো নাই কারো। রাতদিন শুত্থু ছুটোছুটিই আচে। কে কার মুক চাইতে আসচে। তুদ্দশা শুত্থু জেবন ফুরিয়ে যাওয়া বুড়ো বুড়ি গুলানের। জেবনও নাই, মরণও নাই এই সসেমিরে আবস্থা।

তা ঠিক! প্রবাল নন্দর উৎস-মুখে পাথর চাপা দেয়, তা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

কতক্ষণ আবার? নন্দর রেক্‌শো রকেট গাড়ি!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুট মারে নন্দ এখন।

সুদত্তা তীক্ষ্ম গলায় বলল, ব্যাপারটা কী হচ্ছে?

'মানময়ী গার্লস স্কুল' নয়। স্রেফ ভাগ্যচক্র।

কলকাতায় ফেরার ট্রেন কখন?…সুদত্তার কণ্ঠে ছুরির ধার।

প্রবালের অমোঘ গলা, রাত তিনটেয়।

রিক্‌শা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল। ওয়েটিং রুমে বসে থাকব।

ওয়েটিং রুম! প্রবাল নিরীহ গলায় বলল, সেটা কি রকম দেখতে?

ওঃ! কেন মরতে আমি—

প্রবাল আসতে ওর হাতটা একটু ছুঁয়ে বলল, ওই একটা বোকা বুড়োর ভুল ধারণা নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কি আছে?

আমার খুব খারাপ লাগছে।

মন থেকে ঝেড়ে ফেল। ওই নন্দ রিক্‌শাওলা তো ক্ষণিকের ব্যাপার।

নিশ্চয় ও সকলকে গৌরব করে বলে বেড়াবে—

কী বলে বেড়াবে?

রাগ বাড়িও না। বুঝতে পারছ না যেন। বলে বেড়াবে শহর থেকে বৌদি এসেছে। আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম—এই সব।

প্রবাল হঠাৎ হেসে ওঠে, কার কাছে বলে বেড়াবে? ওর সার্কেলে তো? তাতে তোমার কি এসে যাচ্ছে?

থাম! বেশ মজা দেখা হচ্ছে, না?

ঠিক ধরেছ তো! প্রবাল আবার হেসে ওঠে।

কাঁচা পাকা চুল নন্দ এই হাসির শব্দে একটু পাকা হাসি হাসে।···· ভাবে নতুন বে, নতুন ভালোবাসা, এখন ফী কথায় হাসি।

সুদত্তা একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, তুমি যে বলেছিলে তোমার ওই নেবুমাসি বালবিধবা?

বলেছিলাম তো, কিন্তু সেটা নাকচ করলাম কখন?

ওই নন্দ না কে যে বলল, তুই বুড়ো বুড়ি—

প্রবাল ঠাট্টার গলায় বলল, তাহলে দেখছ, হাঁদা নন্দ রিক্শাওলা আর রিসার্চ স্টুডেন্ট সুদত্তা মুখার্জি একই ভুল করতে পারে। বুড়ো বুড়ি হলেই যে তাদের কর্তাগিন্নীই হতে হবে তার কী মানে? ঢ্যাঙাদাদু তো আসলে এই লাহিড়ী বংশেরই কেউ নয়।

সুদত্তার ভুরু উঁচিয়ে ওঠে, কী দাদু?

ওহো হো। ওটা একটা মজা।

নন্দকে আরও একবার নাড়া দিয়ে হেসে উঠল প্রবাল, বেচারী ভদ্রলোক একটু বেশী লম্বা বলে নেবুমাসি ওকে ঢ্যাঙা বলে ডাকতেন। আমরা ছোটরাও শুনে শুনে বলতাম ঢ্যাঙাদাদু। এখনও সেই অভ্যেসে—

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশাটা থেমে যায়।

রাশিকৃত ভাঙা ইট-পাটকেলের বোঝা রাস্তা আটকে রেখেছে। আসলে একটা জঙ্গল-সদৃশ ব্যাপার।

বোঝা যাচ্ছে নন্দ বর্ণিত 'ভগ্নো অট্টালিকা'র সামনের অংশটার স্মৃতিচিহ্ন ওই ইট-পাটকেলের স্তূপ। তারই খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়ে জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে নন্দ সবিনয়ে বলল, এখেনেই নামতে হবে দাদাবাবু। চাকা আর চলবে না।

প্রবাল বিপন্ন গলায় বলল, এটা কী ব্যাপার বল তো? এমন অবস্থা তো ছিল না।

কত দিন আসেন নাই?

প্রবাল সাল তারিখটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, তা অনেক দিন। তখনো তো এই ঠাকুর দালানে—

অল্পে অল্পে ধ্বসছিল। গেলবারের বন্যে বর্ষায় ভূমিস্যাং হয়েচে। এই দু' বছর ভেতর বাড়ির ঠাকুরঘরে নমো নমো করে পূজো হয়েছে।

প্রবাল আস্তে আস্তে ওই স্তূপ বাঁচিয়ে নেমে পড়ে সুদত্তাকে নামার সাহায্যকল্পে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সুদত্তা অপর দিক দিয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ে শাড়ির ধূলো ঝেড়ে নিল। এবং বেশ সতেজ ভাবে এবড়ো খেবড়ো ডিঙিয়ে এদিকে চলে এলো।

প্রবাল মনে মনে হেসে নন্দকেই উদ্দেশ্য করে বলল, পূজো এখনো হয়?

তা হয় দাবাবাবু। বুড়ির গোঁ। বলে, বাপের বিষয়টি খাব বসে বসে আর বাপের কুলকম্মোটি পালব না?

হুঁ, তা করে কে?

নন্দর গলায় আবার দার্শনিকতার সুর, ও যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে ন্যান। চেরকালের নোকেরা-ঠিক ঠাক সময়ে আপন আপন কাজ করতে এসে যায়! তো আসেন, কলকেতা থেকে কেউ কেউ আসেন নেমন্তন্ন খেতে আসার মতন। এই যে ইদিক দিয়ে চলে আসুন। অ্যাখোন পাশদোরই সদর-হয়েছে। আসুন, আমি এগুয়ে গিয়ে খপরটা দিইগে—

তুমি আগে প্রথম সম্ভাষণ করোগে যাও—সুদত্তা তার টান টান করে গোঁজা, সিল্কের শাড়ির আঁচলটা আলগা করে ছেড়ে দিয়ে রুমালে ঘাড় গলা মুছে নিয়ে বলল, আমি এই বাইরের রকে আছি। তুমি আগে আমার সঠিক পরিচয়টা দিয়ে ডাকবে, তবে যাব।

কিন্তু অতখানি অবকাশ হতভাগ্য প্রবালকে দিচ্ছে কে ?

সুদত্তার কথা শেষ হবার আগেই তো চাঁচাছোলা গলায় সোল্লাস বাণী উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এসেছেন বিখ্যাত নেবুমাসি।

কইরে পলা কোতায় ? দেকি মুখখানা। বলি বে করেচিস তা এই বুড়িকে অ্যাকবার খপরও দিতে নেই ?....তা তোরই বা দোষ কী ? টুনু চলে গ্যাচে, তা যাক সতীনক্ষ্মী হাতের নো সিঁতের সিঁদুর নে। অ্যাগে গ্যাচে, ভালই গ্যাছে। কিন্তু জামাই ? তোর বাপ ? তার কতা একটু মনে পড়ল না ?....না কি অ্যাকোনকার মতন 'লবম্যারেজ' করেচিস ? তাই—

পুরুষালী ধরণে হা হা করে হেসে ওঠেন নেবুমাসি। পোশাকী নাম যার শরদিন্দুনিভাননী। এ নামটা আবিষ্কার করেছিল প্রবাল কত যেন বয়েসে। দোতলার বড় ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো একখানা জীর্ণপ্রায় কার্পেটের ছবিতে লতাপাতা মণ্ডিত বর্ডারের মধ্যে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'পতি পরম গুরু'। আর তার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 'শ্রীমতী শরদিন্দু-নিভাননীদেবী।'

বাবা রে, কত বড় একখানা নাম! প্রবাল লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ওই নেবুমাসিকেই জিজ্ঞেস করেছিল, ওপরে ওই কার্পেটের ছবিটা কে করেছে গো নেবুমাসি ? শ্রীমতী শরদিন্দুনিভাননী দেবী কে!

নেবুমাসি হেসে উঠেছিলেন হাহা করে। পুরুষালী ভঙ্গীতে। চিরকাল এক ধরণ। তারপর ডাক দিয়ে বলেছিলেন, অ টুনু, তোর ব্যাটার কথা শোন। আমায় শুদোচ্ছে কার্পেটের ছবিতে কার নাম! হ্যাঁ লা, এত কালেও ছেলেকে বলিসনি মাসির নামটা কি।

হ্যাঁ মাসিই বলেছিলেন। কারণ শরদিন্দুনিভাননী প্রবালের নিজের মাসি নয়, মায়ের মাসি। তাও নিজের মাসি নয়, বোধ হয় জ্ঞাতি গোছের।

নেবু তো তার মা বাপের সবেধন নীলমণি।

কিন্তু টুমুর জীবনে বাপের বাড়ি বলতে তো এই দৌলতপুরই। প্রবালদেরও তাই মামার বাড়ি বলতে এটাই। ছেলেবেলায় যখন আসত প্রবালরা, আরো অনেক সমবয়সী ছেলেমেয়ে দেখতে পেত, তাদের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রশ্ন ছিল না, খেলাটা উদ্দাম হত, সেটাই মজা।

তা ওই শরদিন্দুনিভাননী অপভ্রংশে 'নেবু' তিনিই ছিলেন সেই অপোগণ্ড বাহিনীর আশ্রয়স্থল। সম্পর্ক যার যা থাকুক, সবক'টাই ওই একই নামে ডাকত। তাদের মায়েরাও।

প্রবাল এই কথার তোড়ের মুখেই প্রণাম করে ফেলে বলে উঠল, তুমি তো দেখছি একটুও বদলাওনি নেবুমাসি। ঠিক যেমন ছিলে তেমনি আছো।

নেবুমাসি তেমনি হাহা করে হেসে উঠে সতেজ গলায় বললেন, বদলাবো কেন? ভদ্দরনোকের অ্যাক কতা। বুজলি? তা তুই মস্তান আসল কতাটি চেপে রেকে চিটি দিছলি কেন? নিকবি তো একা যাচ্চিনে, জোড়ে যা'চ্ছি। মহারাণীর উপযুক্তো ব্যবস্তা করতাম। যাক্ যা করেচিস বেশ করেচিস, দেকাতে যে নিয়ে এলি এই ঢের। এসো ভাই, রাজরাণী হও।

সুদত্তা রুষ্ট মুখে একটা প্রণামের মতো করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে দেখে প্রবাল মরীয়া হয়ে বলে উঠল, যা প্রাণ চায় বলে তো চলেছ, যা ভাবছ তা নয় বাবা! নাতবৌ দেখবার কপাল তোমার হয়নি এখনো। এ আমার সঙ্গে পড়ে, পাড়াগাঁ দেখাতে নিয়ে এসেছি।

অ! নেবুমাসি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলেন, বান্দবী? তা ওকেই আমরা হবু বৌ বলি। যাক এনে দেকিয়ে যাবার বুদ্দি হয়েছে তাও ভাল। সত্যি তো আর নেবুমাসি অমর বর নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি। যখন বে করবি, তখন হয়তো থাকব না। এসো ভাই। পাড়াগেঁয়ে বুড়ির কতায় কিছু মনে কোরো না। অনেক দিন পরে ছেলেটাকে দেকে প্রাণে বড় আহ্লাদ হল তাই।···

হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে ধিক্কারের গলায় বলে উঠলেন নেবুমাসি, কী রে ঢ্যাঙা, তুই যে অমন সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি? আয় ইদিকে? মুকচোরা লজ্জাবতী! চিরটাকাল অ্যাক রকমে গেল। তোদের ঢ্যাঙা দাদুকে কেমন দেকচিস রে পলা? হাড়বুড়ো হয়ে গেচে না?

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন এখন। তাকিয়ে দেখল প্রবাল।

হাড়বুড়োর কোন লক্ষণ দেখল না। দিব্যি সোজা সতেজ ঋজুভঙ্গী। গড়নটা একহারা বলেই লম্বাত্বটা চোখে পড়ে। বিশেষের মধ্যে দেখল মাথা ভর্তি চুলগুলোর খাঁজে খাঁজে যে কালোর ছিটে ছিল, সেগুলো সব নির্মল শুভ্র হয়ে উঠে, মাথার ওপর একটা সাদা পশমের টুপির মতো বিরাজ করছে।

প্রবাল এখন সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করছে, কারণ খুব গুরুতর একটা কাজ সে করে ফেলেছে, আর সুদত্তার কিছু বলার নেই। যদিও নেবুমাসির পরবর্তী কথাগুলো খুব স্বস্তিদায়ক নয়। তবু প্রবালকে তো আর দোষ দিতে পারবে না সুদত্তা।

তথাপি সুদত্তার দিকে না তাকিয়েই, সরোজমোহনকে, যিনি ঢ্যাঙা নামে অভিহিত, প্রণাম করে বলল, কই, আমি তো তা দেখছি না। দাদুও তো একই রকম রয়েছেন।

সরোজমোহন মৃদু হাস্যে বললেন, ওনার মতন লম্ফঝম্প করতে না পারলেই সে হাড়বুড়ো। তো বুড়ো হব নাই বা কেন? আশী বছর বয়েস তো হল।

সরোজমোহনের দাঁত বোধ হয় নতুন বাঁধানো, অতএব প্রকৃতির নিজস্ব মাধুর্যের সঙ্গে বাড়তি ও শুভ্রতার যোগ হয়ে হাসিটি শুভ্রমধুর।

কিন্তু নেবুমাসির তো বাঁধানো দাঁত নয়। নীচের দিকের একটা দাঁতের অনুপস্থিতির শূন্যতা তার প্রমাণ দিচ্ছে। সারি দিয়ে সাজানো এই মুক্তোর মতো দাঁতের পাটিকে এখনো অটুট রেখেছেন নেবুমাসি!

সুদত্তা দেখছিল। নাঃ, বয়েসকালে ছিলেন বটে একখানি।

আচ্ছা, চুলও তো এখনো বারো আনা অংশ কালো। রেশম মসৃণ

ঈষৎ কোঁকড়ানো ওই চুলের গোছাও অবাক করে সুদত্তাকে। এই পরিবেশে, এই বয়েসে মহিলা নিশ্চয় চুলে কলপ দেননি। কে জানে বয়েস কত। ওই বুড়ো ভদ্রলোককে তো তুই তুই করছেন। কোন্ সম্পর্কে ?

এতক্ষণের বিরক্ত বেজার মনটা হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাছাড়া আর প্রবালের ওপর রাগ রাখা উচিত নয়। ওর পক্ষে যথেষ্ট করেছে। আমাকেই ফ্রী হতে হবে। সুদত্তা এগিয়ে এসে সরোজ-মোহনকে প্রণাম করে বলে উঠল, গাড়া-গাঁ আমার দেখা হয়নি কখনো, তাই চলে এলাম।

বেশ করেছ দিদি! নাম কি ?

সুদত্তা। সুদত্তা মুখার্জি। বলেই দুষ্টু হাসি হেসে বলল, আপনার নাম তো জেনেই ফেললাম। ঢ্যাঙা। তাই না ?

সরোজমোহন হেসে উঠলেন হো হো করে।

হাসল সকলেই। সুদত্তা আরো একবার ওই মুক্তোর সারি দেখে নিঃসংশয় হল। নাঃ, বাঁধানো নয়। বাস্তবিকই কালে রীতিমত রূপসী ছিলেন। কিন্তু জীবনের কী অপচয়! কী অপচয়!

হাসি থামিয়ে নেবুমাসি ঠোঁটে একটি অপরূপ ভঙ্গী করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এখন তো শুদ্হু নাম জেনে ফেলেচ। রূপও দেখলে। এরপর গুণ বুঝবে।

ঢ্যাঙা অবলীলায় বললেন, তোর গুণ ছাপিয়ে চোখ অন্যত্র যাবার অবকাশ পেলে তো বুঝবে! বলি এদের এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু বাকতাল্লা মারবি ? এসো তো ভাই তোমরা। সুখীর মা, ভেতর বাড়ির নাইবার ঘরের চৌবাচ্চাটা চটপট ভরে দাও তো। আর তোমার সুখীকে ডেকে দিয়ে যাও, এই দিদিমণিকে কোথায় কি রাখবে দেখিয়ে দিতে।

ওঃ খুব হে কত্তব্যগ্যান! নোক দেকিয়ে আর বাহাদুরী দেকাতে আসিসনে ঢ্যাঙা। তোকে আর ও সব ব্যবস্তায় নাক গলাতে হবে না। ....এসো ভাই আমার সঙ্গে....ইয়ে, কি যেন নাম বললে ?

সুদত্তা।

কী বললে? সু—

দত্তা। সুদত্তা।

সু-দ-ত্তা। তা এ নামের মানে কী রে পলা?

প্রবাল গম্ভীর গলা করে বলল, এ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামিয়ে দেখিনি।

শোনো কতা! যা বলে ডাকচি, তার মানেটা কি সেটা ভাবতে হবে না?

আবার-কথা? ঢ্যাঙা তেড়ে ওঠেন, ছেলে মেয়ে দুটোকে হাত-মুখ ধুতে দিতে হবে না? চা-টা খাবে না? এখন পুঁথি খুলে বসল, নামের মানে কী? বলি তোর নামটারই বা মানে কি? বোঝা ওদের।

নেবু মাসি ঝঙ্কার দিয়ে হেসে উঠলেন, ওর আবার বোজবার কী আছে? নেবু মানে জানে না? তবে হ্যাঁ, কি নেবু, সেটা অ্যাকটা কতা! তা বাপু কাগজি নয়, গন্ধরাজ নয়, পাতিও নয়, একেবারে মোক্ষম মান—গোঁড়া নেবুই। টকের জ্বালায় ভূত পালায়।

নেবুই বুঝি তোর নাম? ঢ্যাঙা প্রায় খেঁকিয়েই উঠলেন, আসল নাম নেই?

আসল নাম!....শোনো কতা! জন্মো গেল নেবু নামে, এখন আসল নামের খোঁজ। সে নাম তাঁবাদি হয়ে গ্যাচে।

সুদত্তা ঈষৎ হেসে বলল, তা কেন? আপনার আসল নাম আমি জানি। তার মানেও জানি। এখন প্রমাণও পেলাম যাঁরা নাম রেখেছিলেন, তাঁরা বাজে কথার মানুষ ছিলেন না।

ও বাবা, মেয়ের তো খুব কতার বাঁধুনি। চল বাছা, চল।

নেবু মাসি ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, থমকাতে হল। বাইরে সাইকেলের কিড়িং কিড়িং শব্দ জানান দিল সেই লাল শার্টের আবির্ভাব ঘটল।

নেবুমাসি গলা তুলে বললেন, কে বাচ্চু? তা পেলি কিছু?

বিরিঞ্চি মুখপোড়া এখনো ঝাঁপ বন্দ করে ঘুম মারচিলো ?

বাচ্চু ইট-পাটকেল বাঁচিয়ে সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে এগিয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর উঠোনে ঢুকল। তার সাইকেলের দু' হ্যাণ্ডেলে দুটো বড় সড় মাটির হাঁড়ি ঝোলানো। আর পিছনে ক্যারিয়ারে একটা পদ্মপাতা ঢাকা চ্যাঙারি।

নামবো কোথায় এগুলো ?

নেবুমাসি চড়া গলায় বললেন, নতুন হসনে বাচ্চু! জুতো খোল্, দালানে ঢুকে যা। বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রাক। রেকেই যেন বাইসাইকেল উড়িয়ে হাওয়া হয়ে যাসনে। চা হলে গিলে তবে যাবি।

বাচ্চু বলল, সে আপনি না বললেও থাকতাম। মিষ্টি-মাষ্টি এনে রাখলাম, কচুরি এখনো ভাজেনি। কড়া চাপা করিয়ে তবে এলাম। যাব আবার একটু বাদে।

প্রবাল এতক্ষণ উঠোনের চারধার ঘুরে ফিরে গাছপালা বেড়া ইদারাটা, বাড়ির ভগ্নদশা দেখছিল, এখন বলল, এত সবের কি দরকার? বাড়িতে কি রাক্ষস এসেছে? যা মাল তোমার ওই হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে এলে তা তো দশ কুড়ি জনের মতো।

পোড়া কতা কসনে পলা। কলকেতয় থেকে থেকে খুব কলকেত্তাই হয়েচিস। কলকেতার নোক তো নিখাগী! ছাড় ও সব কায়দা। এই দৌলতপুরের ছানার জিলিপি কী ভালোই বাসতিস! মনে আচে—যকন তকন বলতিস, এত সব কুটনো তরকারি ভাত-ডাল করে কি হয় নেবুমাসি? শুদু ছানার জিলিপি খেয়ে থাকলেই তো হয়।

বলতাম বুঝি? প্রবাল হেসে ওঠে। এখন তো আমার ওই মিষ্টি-ফিষ্টি বেশী দেখলে ভয় লাগে।

তা 'নাগবে বৈ কি। শহুরে হয়েচিস তো! আচ্ছা, আমার হাতে পড় না, দেখব অখন। সুখীর মা চায়ের জল চাপা। সু—সুদত্তা এসো ভাই। পলা, তোকেও কি দেকিয়ে দিতে হবে?

ঢ্যাঙা বললেন, তা হবে না? আগের মতো সব আছে? বারবাড়ি তো জবাব দিয়েছে। বাচ্চু দাদাবাবুকে নতুন দিকে টিউবওয়েলের ধারে নিয়ে যা।

বাড়ির বাইরের চেহারা দেখে ধারণা করা সম্ভব হয়নি ভিতরে এমন একখানি মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

দোতলায় বারান্দায় চায়ের আসরে এসে অবাক হয়ে গেল সুদত্তা। ইতিপূর্বে অবাক হয়েছে দোতলার চওড়া দালানের ধারের সারি সারি ঘর দেখে। বৃহৎ বৃহৎ শার্সি খড়খড়ি সম্বলিত জানালা দরজা বহুল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ঘর, তালা চাবি খুলে দেখিয়েছেন নেবুমাসি। চাবির গোছা অবশ্য সুখীর মা'র হাতে।

দরজায় দরজায় লাগানো ভারী তালাগুলো খুলে খুলে দেখাবার কাজটা তার। নেবুমাসি আছেন সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঘরে পুরনো আমলের আসবাবপত্রও আছে অনেক।

এই সব ঘর দোরে আগে লোক ধরত না। একন মানুষ বিহনে পড়ে আচে। নেবুমাসি আক্ষেপের গলায় বলেন, কাকাদের ছেলেপুলে নাকি কলকেতায় অ্যাতোটুকুন ফেলাটে অ্যাতো অ্যাতো টাকা ভাড়া দে বাস করচে।

সুদত্তা ইতিমধ্যেই বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। সে হেসে বলে, এই বাড়িটা যদি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বসিয়ে ফেলতে পারতেন, কত লাখ টাকা যে দাম হত কে জানে। উঃ, ভাবা যায় না যে এক সময় এখানে লোক ধরত না।

সেই তো। নেবুমাসি বললেন, এ সব দেকে দেকে ভাবতে বসলে মনে হয় কত কাল পৃথিবীতে এয়েচি। নচেৎ—মনেও পড়ে না এতখানি বয়েস হল। ছোটকালে যখন শুনতুম কারুর আশী বছর বয়েস মনে হত ও বাবা! একনো বেঁচে আচে কী করে। হাটচে চলচে খাচ্চে দাচ্চে কেমন করে? এখন তাই ভেবে হাসি পায়। অনুমানে দেকি, সেই তো সক্কাল হলেই ওই বাঁশঝাড়ের ওধার থেকে

সূয্যি উঁকি মারে, সন্দেয় ওই দত্তবাড়ির চিলেকোটার পিছনে ডুব মারে, সেই তো বোশেকে বোশেকী ফুলে বাগান ভরে যায়, বর্ষায় কদম গাচে ফুল ধরে। শীতে গ্যাঁদা গাচ সোনা ঢালে। শীতের পর বসন্ত আর বসন্তর পর গ্রীষ্মি বর্ষা আসে।....কোতা দিয়ে যে অ্যাতোগুলো দিন কেটে গেল ভগবান জানে।

সুদত্তা অবাক হয়ে তাকায়।

নেবুমাসির পরণে ধবধবে ফর্সা মিহি থান আর ধবধবে ফর্সা মিহি সেমিজ। নেবুমাসির ঈষৎ কোঁকড়া কাঁচা পাকা খাটো চুলের গোছা রেশমের মসৃণতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে মুখের পাশে কাঁধে ঘাড়ে। আর নেবুমাসির চোখে অধুনা দুর্লভ সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। নেবুমাসির কাঁচা হলুদ রঙা মুখে পাতলা টিকটিকে নাকের ওপর এই পুরনো স্টাইলের চশমাখানাই যেন ঠিক। এ ছাড়া আর কিছু মানাতো বলে মনে হচ্ছে না।

সুদত্তার হঠাৎ মনে হল, অভিজাত চেহারা বলে যে একটা শব্দ আছে, সেটার মানে পাচ্ছি। অথচ--

হ্যাঁ, অথচ একটা আছে। কথাবার্তায় তো স্রেফ গ্রাম্যভঙ্গী!

নইলে বাচ্চু নামের ছেলেটাকে খেতে দিয়ে—তুই শুদ্দু যদি 'আর দিও না আর দিও না করিস বাচ্চু তো তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।

বাচ্চু তার সামনে পদ্মপাতায় রক্ষিত একরাশ মুড়ির সঙ্গে বেশ কিছু কচুরি মিহিদানা ছানার জিলিপি আর গজার মুখোমুখি বসে করুণ স্বরে বলেছে, আমাদের বাপ ঠাকুদ্দার মতন খাবার ক্ষ্যামতা কি আর আছে ঠাকুমা? ঠাকুদ্দা তো শুনি আপনাদের পুরনো বাগানের ঢাকাই কাঁঠালের গাছের একটা আস্ত কাঁঠাল একাই খেত! সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আপনি একদিন দিচ্ছেন তাই, নইলে আমাদের এ যুগে না খেয়ে খেয়ে পেটের খোল শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে।

নেবুমাসি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সরোজমোহন বলে ওঠেন,

সেই রাম অযোধ্যা যে আর নেই, এ কথা তোদের ঠাকুমা মানতে রাজী নয় রে বাচ্চু।

তবে আর কি, তুইও ওদের দেকাদেকি বলতে বোস আর দিও না অত দিও না। আজ আমার পলা এয়েচে, কত আল্লাদের দিন। আয় রে, তোরা বোস।

খালি খালি ঘরগুলো দেখে মনটা কেমন এক রকম বিষণ্ণ বিষণ্ণ লাগছিল সুদত্তার, এই চা খাবার বারান্দায় এসে যেন মনটা একটা আনন্দের স্বাদে ভরে গেল।

জীর্ণদশাগ্রস্ত হলেও জোড়া জোড়া থামের মধ্যে মধ্যে রেলিঙে লাইন ঘেরা মার্বেল মোড়া বারান্দাটা যেন একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য।

চায়ের টেবিলও অভিনব। মাটিতে শতরঞ্জ পাতা, আর তার ওপরে কারুকার্য করা কাঠের পায়াদার পাথরের টপ বসানো নীচু নীচু চারটে চৌকী ঈষৎ দূরে দূরে। তার ওপরেই চা খাবার রক্ষিত।

সুদত্তা মোহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী চমৎকার! চা খাবার জন্যে এমন সুন্দর জিনিস! দেখিনি কখনো।

নেবুমাসি হেসে ওঠেন, চা খাবার জন্যেই বটে! যে কালে এ সব বানানো হয়েচিল, তখন চায়ের পাট ছিল না কি? ছেলেদের পড়তে বসার জন্যে দশখানা করিয়ে রেকেছিলেন, বাবা বলতেন মাদুরে বই' শেলেট রেকে ঘাড় গুঁজে বসে নেকাপড়া করলে পিটের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। এতে খাড়া থাকবে।

প্রবাল ঢ্যাঙা দাদুর সঙ্গে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় কী আলোচনা করছে, তাকিয়ে দেখল সুদত্তা। পড়ন্ত বেলায় আলো পড়ে ঝকঝক করছে ওর মুখটা। হওয়াই স্বাভাবিক। রূপ আছে যৌবন আছে।

কিন্তু ওই বৃদ্ধের মুখটাও সে আলোয় এমন ঝকঝক করছে কী করে? যেন একটা অলৌকিক মাধুর্যের আভা এসে পড়েছে দুজনারই মুখে। কিসের আলোচনা হচ্ছে?

সুদত্তা বলল, আচ্ছা, এরা তো শুনছি মাঝে মাঝে মামার বাড়ি

আসত, আর আপনি আপনার মা বাবার একমাত্র মেয়ে, তাহলে এত সব ছেলেমেয়ে কারা ?

এই দ্যাকো, 'মেয়ে' আবার কখন বললাম গো। মেয়েরা বসবে শিরদাঁড়া খাড়া করে টুল নিয়ে পড়তে ? ছেলে। সবই ছেলে। যত জ্ঞাতি গুষ্টির ছেলের পাল। বাবার আমার যে সদাব্রতর ব্রত। নিজের একটা মাত্তর সন্তান তাও মেয়ে সন্তান। কপাল-ক্রমে বাপের ঘর আগলে বসে আছি। নচেৎ তো পরঘরী হয়ে যাবার কতা। লাহিড়ী বংশের কুলপিদ্দিমদের মানুষ করতে হবে না ? তাছাড়া আমার নিজের কাকা ছিল দুজন, তাদের ছেলেরা।···সবক'টাকে পড়িয়েছেন বাবা, সব মেয়েগুলোর বে দিয়েছেল। যেমন তেমন করেও দেননি, ঘটাপটাই করেচেন মোটামুটি। তবে কি আর আমার বে-র মতন ?

পুরুষ দুজন রেলিঙের ধার ছেড়ে চায়ের সেই অভিনব টেবিলের ধারে বসেছে আসন পিঁড়ি হয়ে, শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছে একটা খিলেনের মধ্যে দিয়ে। সকলের মুখেই কনে দেখা আলো।

নেবুমাসির সেই শানানো গলা খানিকটা খাদে নামা। মুখে স্মৃতি রোমন্থনের পরিতৃপ্তির ছাপ।

বয়েস তখন দশ, জগৎপুরের রাজবাড়ি থেকে সম্বন্ধ এল। কোতা থেকে কার মুখে নাকি শুনেচে দৌলতপুরের লাহিড়ীবাড়িতে এক রূপের ধ্বজা মেয়ে আচে বে'র যুগ্যি—পাটিয়ে বসল ঘট্‌কী। বাবা তাকে কুটুমের মতন আদর যত্ন করলেন, একজোড়া কাপড় আর সিদে দিয়ে বিদেয় দিলেন, কিন্তু বিয়ের মত দিলেন না। রাজবাড়িতে মেয়ে দেওয়া মানে মেয়েকে জন্মের শোদ বিলিয়ে দেওয়া। জামাই-মেয়ে নিয়ে আদর আহ্লাদ করতে পারব না, মেয়েকে ইচ্ছে মতন আনা নেওয়া করতে পারব না, একটা সন্তান, মায়ের প্রাণ বোধ মানচে না। মায়ের দোহাই-ই দিলেন ভদ্দরতার দায়ে।···ঘট্‌কী না কি হেসে বলেছিল, তার মানে ঘরজামাই রাকতে মন ? বাবা বলেছিলেন, তা কক্‌খোনো না। ঘরজামাইয়ে আমার ছেদ্দা নেই। কথায় বলে,

কালো বামুন কটা শুদ্দর বেঁটে মোছলমান, ঘরজামাই আর পুষ্যিপুত্তুর সবকটা সমান।

হঠাৎ ঢ্যাঙা বলে ওঠেন, তা আমিও তো কালো বামুন—আমাকেও ওই দলে ফেলছিস তো?

নেবুমাসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, তোর আবার বেশি বেশি বিনয় ঢ্যাঙা! তুই আবার কালো কোতা? এখনই দিন দিন পোড়াকাটের মতন হয়ে যাচ্ছিস। ছোটকালে দিব্যি ঘিওলো ঘিওলো রং ছিল। বাতিকে বাতিকেই গেলি তুই। দুধ খাব না, ঘি খাব না, অধিক মিষ্টি খাব না—এতে কি আর চেহারায় শরীরে লাবণ্য থাকে?

ঢ্যাঙা চড়া গলায় বলেন, খাব না বললেই রেহাই দিস যে? জোর করে খাইয়ে খাইয়ে আমাশার ধাত জম্মিয়ে দিলি। আশী বছরের বুড়োর চেহারায় আবার লাবণ্য।

নেবুমাসি তেড়ে উঠলেন, সেই ইস্তক আশী বচর আশী বচর করচিস ক্যানরে ঢ্যাঙা? বলি, আমি বড় না তুই বড়?

ওঃ, ভারী তো বড়! তিন মাসের বড়, তার আবার বড়াই!

তিন মাস নয়, সাড়ে তিন মাস। নেবুমাসি দৃঢ় গলায় বলেন, আমি আশ্বিনের পয়লা, আর তুই পৌষের মাঝামাঝি। তা যে যাই হোক, বড় বৈ তো ছোট নয়? তবে আমার আশী না হতেই তোর আশী হয় কী করে?

তোরই বা হতে কতক্ষণ?

নেবুমাসী আরো দৃঢ় গলায় বললেন, যতোক্ষণ না সামনের আশ্বিন আসবে, ততক্ষণ।···হচ্ছিল লাহিড়ীবাড়ির সবেধন নীলমণি মেয়ের বিয়ের ঘটার গপ্পো, দিলি তো ভণ্ডুল করে? দিবি বৈকি! হিংসের জ্বালা! নিজের তো ও গুড়ে বালি! তা বুঝলে বাছা—আঃ তোমার নামটি বাপু কেমন যেন পেটে আসে মুখে আসে না। বলি ডাক-নাম নেই?

সুদত্তা কিছু বলার আগে প্রবাল বলে ওঠে, আছে। জানি।

সুদত্তা রেগে বলল, আছে! জানো? কোথা থেকে জেনেছ শুনি?

কোথা থেকে ? নাঃ সোর্সটা বলব না, তবে জেনেছি—বলি ?

না বলে ছাড়বে ভেবে কি আর প্রসঙ্গটা তুলেছ ?

রেগে যাচ্ছ মনে হচ্ছে। তবে থাক।

সুদত্তা বলল, থাক-এর কিছু নেই। মা বাবা খুকু বলে ডাকে। একেই যদি ডাক নাম বলতে চাও বল।

খুকু! নেবুমাসি এক গাল হেসে বললেন, আহা, এমন মিষ্টি নামটি থাকতে আমি হোঁচট খেয়ে মরচি! তা বুজলে বাছা খুকু! আমার বাবা ওর বে দেবার জন্যে কম ব্যস্ত হননি, কিন্তু বাবুর এক গোঁ, ঘর নেই বাড়ি নেই বৌ এনে রাকবো কোতায়।···বাবা শেষ অবদি রেগেই গেলেন, বললেন, অ্যাতো বড় বাড়িখানায় তোর একটা বৌয়ের জায়গা হবে না? তবু গোঁ ছাড়ল না। নিজের পায়ে দাঁড়াব বলে কোতায় যেন চলে গিয়ে কত দিন কাটিয়ে এলো।···তারপর বাবার মৃত্যুকালে বাবা—

সরোজমোহন রেগে বললেন, হচ্ছিল জমিদার কন্যে শরদিন্দু-নিভাননীর বিয়ের ঘটার গল্প, তার মধ্যিখানে এ হতভাগার জীবন কাহিনী ফাঁদতে বসছিস কেন? হ্যাঁ, ঘটা একখানা হয়েছিল বটে। ···পলা তোরা ছোটবেলায় সে কাহিনী শুনেও থাকবি।

অসতর্কে নিজেই তিনি গল্পের খেই হাতে তুলে নিয়ে বসলেন। এবং চালিয়েও গেলেন। অবশ্য নির্বিঘ্নে নয়। প্রতি ধাপে প্রতিবাদের ধাক্কা খেতে খেতে।

তবু প্রবালের শোনা গল্প আবার ঝালানো হল আর খুকুরও শোনা হল—

নেবুমাসির বিয়েতে নাকি সেই পাকা দেখার দিন থেকে বিয়ের অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত রোজ দুবেলা যজ্জি চলেছিল। পাকা দেখা উপলক্ষে দিক-দিগন্তর থেকে যত আত্মীয় কুটুম্ব এসেছিল, শশাঙ্ক লাহিড়ী তাদের আর ফিরে যেতে দেননি, আটকে ফেলেছিলেন। একমাসের আগে আগে ছাড়েননি।

শ্রোতারা বলে ওঠে, চমৎকার। তিনি না হয় আটকে ফেললেন,

লোকেরাও আটকে গেল ? কাজ ছিল না কারুর ?

তা একেবারেই ছিল না কি ? ছিল। তবে তখনকার মানুষের এই এ যুগের নূতন এমন কাজ কাজ বাতিক ছিল না। থাকুক কাজ, তা বলে মান্যিমান একটা লোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে ? শশাঙ্ক লাহিড়ী সবাইকে হাত জোড় করে বলেছিলেন না—আমার জীবনে এই একটাই কাজ ! এই প্রথম, এই শেষ ! হবে না হবে না করে সাত ঠাকুরের দোর ধরে বুড়ো বয়েসে এই মেয়ে। প্রাণ ভরে সাধ আহ্লাদ করব এই বাসনা।

তবে ? এমন একটা আবেগময় অনুরোধের সামনেও লোকে নিজের কাজ দেখাবে ? যাদের আপিস ইস্কুল, তারা কামাই করবে। চুকে গেল সমস্যা। তাছাড়া আসল কাজটি তো সমাধা হবে।

শ' দুই লোক বাড়িতেই ছিল, এ বাড়ি, কাছারী বাড়ি, জ্ঞাতিদের বাড়ি সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে খাবার ব্যবস্থা এইখানে। বিরাট বিরাট দুটো চালা বানানো হয়েছিল, একটা মেয়েদের একটা পুরুষের। তাতে সকাল থেকে রাত অবধি পাত পড়ার বিরাম নেই। জনা দশ কাজের লোক মোতায়েন ছিল সারাক্ষণ পাতা ফেলতে আর পাতা পাততে।

এখানে ঠিকরে উঠেছিলেন নেবুমাসি, হাঁদার মতন কতা বলিসনে ঢ্যাঙা। যারা পাত ফেলছিল, তারাই পাত পাতছিল ? বলি এ বাড়িতে এমন মেলেচ্ছ কাণ্ড কবে দেকেচিস ? পাত পেতেচে স্বজাতির মেয়ে পুরুষে।

তোর তো বিয়ে, তুই সব দেখতে গিয়েছিলি ?

না যাই। জ্ঞানগম্যি তো আচে একটা !. গোয়াড়ি না হাঁসখালি কোতা থেকে যেন এক কুড়ি হালুইকরকে এনে স্থাপনা করিয়ে রাকা হয়েচিল, তারা কি ঘোড়ার ঘাস কাটচিল ?

তবে তুইই বল।

কেন, এটুকু বলতেই তোর মুক ব্যথা হয়ে গেল ? তো আমিই বলচি। বুঝলে খুকু, ওই ওদিককার মাঠে চালা তুলে জোল কেটে

নেই বানানো হয়েছিল আটটা দশটা।

আটটা দশটা? তবে তো খুব বললি। এদিকে জলপানির দিকে রো চারটে উনুন কাটা হয়নি? ফি দিন সকাল না হতেই ঝোড়া ড়া কলাই ডালের বোঁদে ভাজা হচ্ছিল না? তার সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি স্তা নিমকি?

হ্যাঁ সে খবর তো তোরই বেশী জানবার কথা—নেবুমাসি হি হি করে সে উঠলেন, সেইখানেই তো পড়ে থাকতিস সকাল থেকে!

অকৃতজ্ঞতা করিসনে নেবু, শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে বানিয়ে চুপি পি সাপ্লাই করা হত না তোর কাছে? বুঝলি পলা, বিয়ের দিন সকালে মকি খাব বলে কি ঝুলোঝুলি! বলে কিনা শেষ রাত্তিরে খানিকটা চিঁড়ে গিলিয়ে গেল, আমার গা কেমন করছে।…দোহাই ঢ্যাঙা, দু' রখানা নিমকি এনে দে চুপি চুপি। যা সুবাস ছাড়ছে। ওই মাঠে ড়া চাপিয়েছে, এখানে ঘিয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। কোথা থেকে যেন আনিয়েছে।

ওঁদের কথার ভঙ্গী শুনলে মনে হতে পারে, ঘটনাটা বুঝি এখনই টছে। সত্যিই বুঝি সেই কোথা থেকে আনানো ভালো ঘিয়ের গন্ধ ভসে আসছে।

থাক, ওই নিয়ে আবার অত বিশদ কিসের রে ঢ্যাঙা? দিয়েছিলি?

বাঃ! সেদিন না তোর উপোস করার কথা! দিয়ে অমঙ্গল করি ার কি!

আহা, না দিয়েও কি মঙ্গলের বাহার! হেসে গড়িয়ে পড়লেন নবুমাসি, বচর না ঘুরতেই তো ঘরের মাল ঘরে ফিরে এলো।

এলো, সে বিধাতার লিখন। কিন্তু তখন তো আর সে বুদ্ধি হয়নি। র্থাৎ মনে হত বিয়ের দিন খেয়েই এই কাণ্ডটি হল। আর নিজেকে হাপাপী ভেবে—ঢ্যাঙা হাসলেন। চিরদিনের মজ্জাগত কুসংস্কার। হলে বুদ্ধি! কেবল মনে হয়েছে নিশ্চয় কোথাও কোন দোষত্রুটি টেছে।

নেবু ঝঙ্কার দিলেন, ছেলেবুদ্ধি আবার কী? বুড়ো বুদ্ধিতেও তো।

ওই কথা বলছে। কেউ বলল, রাজার মুখের ওপর না করায় অপমা শাপ দিয়েছে রাজা তাই এই দশা। দ্বিরাগমন না হতেই কপ পুড়ল মেয়ের। ছি ছি ছি, আমার কিন্তু তখন কি মনে হয়েছিল জা রে পলা, বাঁচলাম বাবা! আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না।

চমৎকার! এদিকে তো কার্পেটে 'পতি পরম গুরু' ঝুলিয়ে হয়েছিল।

ও মা! শোন কথা! সে তো একটা শিল্পকাজ শিকচি ব ঘরে গুণে গুণে বুনলেই তো কতাটা নেকা হয়ে যায়। 'বন্দেমাত ছিল 'জননী জন্মভূমিশ্চ' ছিল। যে যেমন প্যাটার্ণ ধরেছিল। অ ওটা নিয়েছিলাম সোজা বলে। তা হটাৎ যকন খবরটা এলো, ি চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এসে বলল, 'ওরে নেবু, তুই এখারে প্যায়রা গ চড়ে বসে আছিস। তোর যে কপাল পুড়ল।' শুনে চমকে ি তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেকচি আগুনের ধারে কাচে আসি পুড়ল কি করে! অবিশ্যি সেকালের তুলনায় আমি কিছু খুকী ছি না, কিন্তু বরাবরই ডাকাবুকো ছিলাম, আর যত বেটাছেলের মত খেলায় ছড়িয়ে বেড়াতাম, তাই মেয়েলি কথা বেশী শিখিনি তখনে তা আমার সকল ডানপিটেমির আজ্ঞাবাহী ছিল ঢ্যাঙা।

!! ২ !!

আকাশের আলো কখন বিদায় নিয়েছে, কখন কোন্ ফাঁকে যেন একটা হ্যারিকেন জ্বেলে বসিয়ে রেখে গেছে— খেয়াল নেই কারো চলছে এই ভাবেই। দীর্ঘ দিন পরে দুটো সহিষ্ণু শ্রোতা পেয়ে যে স্থানকালপাত্র হারিয়ে ফেলেছে মানুষ দুটো। হারিয়ে ফেলেছে বয়েসে ভার।

সুদত্তা অবাক হয়ে দেখছে, একশোবার বাদ প্রতিবাদ চালালে গল্পও এরা এমন ভাবে চালাচ্ছে, যেন এই ক'দিন আগের ঘটনা।

প্রবাল অবশ্য হেসে হেসে বলেছে, কি সুদত্তা, কেমন গল্প শুনছ

চ যে রাজা, 'থামনা দাদা! রাজা নয় সে রাজপেয়াদা' মনে পড়ে চ্ছে না?

সুদত্তা হাসল, কিন্তু সে হাসি কৌতুকের মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়, কেমন ন অন্যমনস্ক ভাবে।

প্রবাল বলল, কি যেন ভাবছ মনে হচ্ছে?

হুঁ ভাবছি।

কী?

নিজেও এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি বুঝতে পারছি।

তাই বুঝি?

হুঁ। ভাবছ তো, এই ভাবে এরা জীবনটা কাটাচ্ছে কী করে? র কেনই বা কাটাচ্ছে।

সুদত্তা একটু হাসল। বালকের কথায় বিজ্ঞরা যেমন হাসে।

এভাবে হাসলে যে?

এমনি।

আমার ব্যাখ্যাটা অর্বাচীনের মতো লাগল মনে হচ্ছে?

আচ্ছা থাক।

খেতে বসে তিনজনেই রেকাবির মিষ্টি আলাদা থালায় তুলে খেছিল, বাদে নেবুমাসি। এখনকার ছেলেমেয়েদের খাওয়া নিয়ে ক্কার দিয়েছেন নেবুমাসি, এবং অধিকতর ধিক্কার দিয়েছেন তৃতীয় ক্তিটিকে। আধুনিকদের দেখাদেখিই যে ঢ্যাঙার এমন অধঃপতন, টি সরবে ঘোষণা করে। নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে চারখানা ছানার লিপি, দুটো কাঁচাগোল্লা, দুটো খাস্তা গজা ও খানকয়েক হিংয়ের চুরি সহযোগে চা খেয়ে বাড়তিগুলো ঘরে তুলতে গেছেন। ঢ্যাঙা ছেন তাঁকে আলো ধরতে। আলো অবশ্য আধুনিকতার পাপে লঙ্কিত টর্চ।

এই অবকাশে এরা কথা বলে নিচ্ছে।

প্রবাল সুদত্তার হাতটা একটু ছুঁয়ে বলল, ভাবছি এঁদের ভ্র নিরসন না করলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

তার মানে?

মানে হচ্ছে, ইয়ে আর কি, নন্দর ধারণা মতো থাকলে মন্দ হত? আমাদের একটু নিজস্ব গল্প-টল্প করার সুযোগ সুবিধে জুটে নেবুমাসির বিচক্ষণতা আমাদের সাহায্য করত। তা তুমি যা খেপচুরিয়াস হয়ে উঠলে।

ওঃ। তুমি বলছ, সেই অসভ্যতাটা চালিয়ে যাওয়াই ঠিক ছিল

ওই আর কি! মানে ক্ষতিটা আর এমন কি হত!

থামো! শেষ পর্যন্ত জল কোথায় পৌছত তা খেয়াল আছে?

প্রবাল মাথা চুলকে বলল, সেটা কোন ভাবে ম্যানেজ করা না? ধর আমি আবদার করে বললাম, ঢ্যাঙাদাদু, আজ তোমার আমি একঘরে শোব, গল্প-টল্প করব।

আজ! তা বেশ! কাল? পশু? তশু?

আচ্ছা আচ্ছা, ভুল হয়েছে। তুমি অমন অগ্নিমূর্তি হয়ো না। বসে সত্তর বছর আগের এক বিয়ের ঘটা-পটার গল্প শোন। যা দে সেই রাজসূয় যজ্ঞে কোন্ দিন কী রান্না হয়েছিল তাও শুনতে আমাদের।

সুদত্তা বলল, হোক না। সেটাই বা মন্দ কী? এও তো ধরণের ইতিহাস। শতবর্ষ পূর্বের বাঙালীর সমাজজীবনের ইতিহাস

তুমি যে এমন হার্টলেস্, আগে অনুভব করিনি।

অথচ তুমিই আমার কাছে তোমার নেবুমাসির গল্প করেছ।

সে আলাদা! এখন ওই দুই বুড়ো-বুড়ির বোকার মতো ঝগ দেখে—

থামতে হল। কারণ অভিযুক্ত আসামী যুগল' সেই একই অপর করতে করতেই এসে পড়ল।

তোর ক্ষুরে আমি নমস্কার করি ঢ্যাঙা। বাচ্চুকে মাংস আন

কতা বলে রাকতে ভুলে গেলি ? ও কি আর ভোর সকালে আসবে ? হয়তো বেলায় অ্যাকেবারে মাচ নিয়েই চলে আসবে। এরা এয়েচে— শুধু মাচ দিয়েই চালাবার মতলব, কেমন ?

প্রবাল তাড়াতাড়ি বলল, ওই মাছই তো ভালো নেবুমাসি। আবার মাংস-ফাংস কেন ? ওখানে তো কেবলই ওই খাওয়া হয়। বরং তোমার ঘরের সেই সব ঘণ্ট নাকি, আর পোস্তর বড়া, ছেলেবেলায় যেগুলোয় দারুণ আকর্ষণ ছিল—সেই কর না।

নেবুমাসি হেসে উঠে বললেন, সে সব থেকেই কি আর বঞ্চিত হবি ? শহুরে নাতনীকে কি আমি মোচার ঘণ্ট, গুঁড়ো মশলার সুক্তো, বড়ি-পোস্ত না খাইয়ে ছাড়ব ? তবে শুধু তাই দিয়েই কাজ সারব নাকি ? সকালে মাচ ভাত, পাঁচটা বেঞ্জন হোক, রাত্তিরে নুচি মাংস, পায়েস, মিষ্টি—

নেবুমাসি, তোমার রান্নাঘরের বারোমাসের অতিথি হয়ে থেকে যাব না কি ? যা লোভ দেখাচ্ছ।

আহা রে। সবাই অমন বলে। বেণুও সেবার এসে বলেছিল, দৌলতপুরে এখনো যা দৌলতের নমুনো দেকচি, থেকে যেতে ইচ্ছে করচে। ওই দু-চার দিনই ভালো লাগে রে। কাজের তাড়ায় ছুট ছুট।

ওইতো ! 'কাজ' বলে একটা কড়া মনিব আছে। সে যাক, তুমি আর ওই মাংস-টাংসর জন্যে লোক ছুটিও না।

নেবুমাসি আত্মস্থ গলায় বললেন, ছোটাতে বাকি আচে নাকি ? ঢ্যাঙা চলে গেল দেকলি না ? গিয়ে নন্দর বৌকে বলে রাকবে, সে নন্দকে দিয়ে বাচ্চুকে খবর দেবে। ও হয়ে যাবে।

কী আশ্চর্য ? এত ঝঞ্ঝাটের কী দরকার ছিল মাসিমা ? সুদত্তা বলল, ভীষণ লজ্জা করছে আমার। আমি এলাম বলেই তো এত ব্যস্ত করা।

নেবুমাসি হঠাৎ গলা খাটো করেন। বলেন, এই ছুতোয় ওরও একটু খাওয়া হবে, তাতেই আরো ব্যস্ত করা, বুজলে না ? এদিকে ওই

জিনিসটিতে খুব মন। কিন্তু আমার অসুবিধে হবে বলে কিচুতে আনতে দেবে না। বলে, একটা মানুষের জন্যে এত হ্যাঙ্গামা। আমি যদি বাচ্চুকে বলে রাকি, তলে তলে বারণ করে রাকে। তা এই কেউ এলে গেলে তার সুবাদে হুকুম করি। নচেৎ মিচে করে বানিয়ে বলি, বাচ্চু খেতে চেয়েচে, নন্দ মুক ফুটে বলেচে একদিন একেনে পাত পাড়বে। ওই করে ওর একটু হয়। পেটে খিদে মুকে লজ্জা, এই মানুষকে ভাল-মন্দ একটু খাওয়ানো দুস্কর। আগে কেবলই বলত বসে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্চি কোতাও চলে যাই। একদিন আচ্ছা কবে তুলো ধোনা করে গাল্ দিতে তবে সে বাতিক ছেড়েচে। জম্মোকাল এ বাড়িতে রইল, তবু পর পর ভাব গেল না। ওই যে আসচেন বাবু!

হুকুম তামিল করে আসা হয়েছে—বেশ প্রাবল্যের সঙ্গে কথাটা বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন সরোজমোহন।

সঙ্গে সঙ্গেই নেবুমাসি বলে উঠলেন, কেতাত্ত হলাম। একটু বেশী করে আনতে বলা হয়েচে কি? বাচ্চু ছোঁড়াটাও খাবে তো। সুখী সুখীর মা রয়েচে।

ও সব জানি না। আনতে হবে সেটাই বাচ্চুকে বলে এলাম। ওর সঙ্গেই দেখা হল।

ঠিক আচে। বললেন নেবুমাসি, বাচ্চুর আন্দাজ বুদ্ধি তোর থেকে বেশী আয় খুকু, তখনকার গপ্পোর বাকিটা শেষ করি আয়।

সরোজমোহন ব্যঙ্গের গলায় বললেন, বাঃ, চমৎকার! এখুনি ভদ্রলোকের মেয়েটাকে তুই-তোকারি আরম্ভ করা হয়ে গেছে?

গেচে! আমি গাঁইয়া ভূত, ওই রকমই ব্যাভার। তোর সাধ হয়, আপনি আজ্ঞে কর। নয়তো বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসে থাকগে। একেনে থাকলেই তো কতায় কতায় ফোড়ন কেটে গপ্পো এগোতে দিবি না।

ঢ্যাঙা জেদের গলায় বলে উঠলেন, ঠিক আছে। আয় পলা, আমরা বেটাছেলেরা বৈঠকখানা ঘরে গিয়েই বসিগে।

নেবুমাসি কথার ডানা মেলে এক ঝাপট মারেন, কেন? পলা

যাবে কেন? ও বলে পুরনো গপ্‌পো শুনতে কত ভালোবাসে।

ও ভালোবাসে কিনা জানি না, আমি কিন্তু ভীষণ ভালোবাসি মাসিমা। বলল সুদত্তা।

ও পাগল মেয়ে! মাসি কেন? বল দিদিমা। পলা ছোঁড়া মায়ের দেকাদিকি নেবুমাসি বলে তাই। নচেৎ দিদিমা হই তো।

বলায় কি আসে যায়? সুদত্তা বলল, একটা কিছু বললেই হল।

শোন কতা! একটা কিচু বললেই হল? নেবুমাসি নিজস্ব ভঙ্গীতে হি হি করে হেসে ওঠেন, যাকে তাকে তুই প্রাণেশ্বর বলতে পারিস? যাকগে তামাশার কতা, পুরনো অট্টালিকায় বসে পুরনো কালের কাহিনী শোন। একেনে বাতাস বইচে দেক কী প্রাণ জুড়ানো। একেই কবিরা বলে মলয় বাতাস, তাই না রে পলা?

অতঃপর সেই মনোরম মলয় বাতাসের স্পর্শে উদ্বেলিত হৃদয়টি নিয়ে পলাকে শোনা গল্পই বসে বসে শুনতে হয়, গাঁ-সুদ্ধু লোকের কারো ঘরে ওই একটি মাস উনুন জ্বলেনি। বাবার হুকুম। জ্বলতে দেওয়া হয়নি। সব এই যুক্তিবাড়ি থেকে হবে। মায় কচি ছেলের দুধটা বার্লিটা পর্যন্ত।....

দেখা যায় ঢ্যাঙা তাঁর লম্বা ছায়া নিয়ে এই আসরেই বসে আছেন একটি গোলালো তাকিয়া কোলে নিয়ে, এবং যথারীতিই কথার মাঝে মধ্যে ফোড়ন কেটে চলেছেন।

যে সব জ্ঞাতি গোত্র ওই এক মাস ধরে ভোজ খেলো, তারাই শেষে বলে বেড়াতে লাগল—মেয়ে বছরের মধ্যে বিধবা হবে এ আর আশ্চর্য্যি কী, এত বাড়াবাড়ি ভাগ্যে সয়? ভাগ্যেরও একটা সহ্যশক্তির সীমা থাকে।

নেবুমাসি বললেন, তা কেন? সেই সোনার কড়ি নিয়ে কড়ি খেলার—

সোনার কড়ি! সুদত্তা অবাক হল।

ওই তো। আমার মায়ের উদ্ভুট্টি শক। তাঁর এত আদরের মেয়ের এত সাধের বিয়ে, মেয়ে বাসরে বরের সঙ্গে কড়ি খেলবে সোনার কড়ি

নিয়ে। তাই নিজের আঠারো ভরির গোট ভেঙে সওয়া পাঁচগণ্ডা কড়ি গড়িয়ে রেকেছিলেন। তাই দেকে সব গিন্নীরা রাগারাগি করতে লাগল—পয়সার গুমোরে শাস্তর নিয়ম উল্টানো…বাপের কালে কেউ শুনেচে সোনার কড়ি দিয়ে শুভকাজ হয়!…শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করে সবাই আবার সমুদ্দুরের কড়ি এনে খেলাল, আর কোন্ ফাঁকে কে যে সেগুলো সরিয়ে ফেলল!

আবার হঠাৎ হেসে ওঠেন নেবুমাসি, সত্যি কতা বলি ভাই, সেই কড়ি ক'টা হারানোয় যত দুঃখু হয়েছিল, কপাল পোড়ায় তত নয়। এমন খাশা গড়েছিল যেন সত্ত কড়ি। আমাদের সেই শশীস্যাকরার যা হাত ছিল—

এলোমেলো কথা বলছিস কেন নেবু? তোর বিয়ের সময় আবার শশীস্যাকরা কোথা? তখন তো শশীর বাবা তারাপদ—

তুই বড় জানিস, না? বলি তুই বড় না আমি বড়?

তোর তিন মাসের বড়-গিরি তুলে রাখ নেবু। তুই বিয়ের কনে, তুই এত সব খবর জানতিস?

আর তুই যেন মস্ত গার্জেন ছিলি। তাই সব খবর রেকে বেড়াতিস।

তা বেড়াতামই তো। ফাঁকে ফাঁকে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে তোর কাছে সব খবর সাপ্লাই করতে হত না?… ঢ্যাঙা জোর গলায় বলেন, তখন কী খোসামোদ! বুজলি পলা? হেই ঢ্যাঙা লক্ষ্মীছেলে, কোতায় কী হচ্চে আমায় বলে যা। জিগ্যেস করলে লোকে বেহায়া বলবে। এদিকে আমার প্রাণ ছটফট করচে। বাবা যদি আর কারুর বিয়েতে এমন ঘটা করত, আমি প্রাণ ভরে আমোদ করতে পেতাম।

প্রতি পদে এহেন বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও, সুদত্তার সেকালের ঐশ্বর্যশালী বাঙালীর সমাজ জীবনের ইতিহাস একটু একটু করে জানা হয়ে যায়।…সুদত্তা বলে, ঐশ্বর্যটা তারা কেবল মাত্র স্ত্রী-পুত্রের উপভোগের গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতেন না। ভাগ করে ভোগ করতে জানত।…

সবাই তাই করত না হাতী—নেবুমাসি ঝঙ্কার দিয়েছেন, বাবার

আমার জমিদারীর আর কোলিয়ারির পয়সা সব বারো ভূতে খেয়েচে।

কিন্তু সেই ঝঙ্কারের মধ্যে শুধু শব্দ ঝঙ্কারই দেখা গেছে, আক্ষেপ নয়।

॥ ৩ ॥

আমি কিন্তু খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি নেবুমাসি। রাত্রে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে সুদত্তা বলল।

না, আর মাসিমা নয় যথাযথ নিয়মে দিদিমাও নয়, সেই নেবুমাসিতেই এসে পৌঁছে গেল এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। হয়তো সেটাই আশ্চর্যের কারণ।

এই পুরনো বাড়ির ঘরে ঘরেই কালো কালো পালিশ উঠে যাওয়া বড় বড় জোড়া খাট পাতা, তবে নেবুমাসির ঘরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। একখানা সরু চৌকিতে নেবুমাসির স্বল্প উপকরণ যুক্ত বিশুদ্ধ শয্যা।

সেই ঘরেরই ফাঁকা দেওয়ালের ধারে অন্য কোন ঘর থেকে একটা সরু খাট আনিয়ে পাতা হয়েছে, এবং ফর্সা চাদর বালিশ সম্বলিত বিছানা পাতা হয়েছে।

ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সুদত্তা—শূন্য শূন্য ঘরগুলোর দেয়ালেও বড় বড় এক একখানা আর্শি বসানো আছে, এ ঘরে তার কিছুই না। এ ঘরের আসবারের মধ্যে একটা মাত্র আলনা, তাতে নেবুমাসির দু-একটা থান ও ধুতি ও সেমিজ লম্বমান।

নেবুমাসি বলেছিলেন, পাশেই আয়না-টেবিলওয়ালা সাজানো ঘর রয়েছে ভাই, কিন্তু এই বুড়ো বুড়ো জানলা দরজাওলা বৃহৎ পুরনো ঘরে একা তোর ভালো লাগবে না, ভয় লাগবে। তাই এই বুড়ির ঘরেই স্থাপনা করলাম তোকে।

তারপর দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিলেন, তোরা যে আমার আশায় ছাই দিলি। নাতবৌ এলো বলে আহ্লাদে ভাসছি, তা নয় এখনো হবু। এখনকার যে সব কায়দা হয়েচে নেকাপড়া না শেষ করে বে

করব না। ইদিকে নেকাপড়ারও শেষ হবার নাম নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই বিদ্যের জাহাজ হবে এই পণ! তা যাক, এই বুড়ি বেঁচে থাকতে থাকতে শুভ কাজটা সেরে ফেলে একবার আসিস ভাই। সাধ মিটিয়ে —চুপ করে গেলেন।

সুদত্তা এই নিশ্চিত বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেনি, তুমি যত সিওর নেবুমাসি আমরা নিজেরা এখনো ততো নই। এখনো আমরা নিজেদের মন বুঝতে পারছি না।

সুদত্তা তাই ও পথ এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, বেঁচে থাকতে থাকতে মানে? একশো বচ্ছরের আগে আপনাকে পৃথিবী থেকে নড়তে দিচ্ছে কে?

নেবুমাসি হাসলেন, তা অসম্ভবও নয়। বাল্যবিধবার পরমায়ু পাথর দিয়ে বাঁধানো থাকে টসকাতে জানে না। নইলে ছ্যাক এই আশী বচর বয়সেও তোদের মতন যুবিদের থেকে তিন গুণো খাচ্ছি, তিন টপ্‌কায় সিঁড়ি ভাঙছি। তবে মরতেও তো পারি।

ঘর বিছানা দেখিয়ে দেবার সময় এ সব আলোচনা। এখন শুতে এসে সুদত্তা খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, আমার কিন্তু খুব অবাক লাগছে নেবুমাসি।

নেবুমাসি বললেন, কেন বল তো?

ভাবছি আপনারা তো পুরনো কালের লোক, পুরনো সংস্কার, এ ভাবে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একসঙ্গে ঘুরতে দেখে রাগ করলেন না, বিরক্ত হলেন না, নিন্দে করলেন না বরং এত ভালোবাসছেন—

নেবুমাসি হেসে উঠে বললেন, যে কালে যে ধর্ম, আমরা পুরনোরা রাগ করলে আর নিন্দে করতে বসলেই কি কাল তার স্বধর্ম হারাবে? আমাদের আমলে সাহেব মেমরা কোর্টশিপ করত, এ আমলে তোরা করচিস। জিনিসটা আমাদের অজানা নাকি?

আমরা কিন্তু মোটেই এটা ভাবিনি নেবুমাসি। একসঙ্গে পড়ি, বেড়াই-টেড়াই এই পর্যন্ত।

নেবুমাসি ঈষৎ গভীর গলায় বলেন, ও কথা বলিসনে ভাই, ছেলেটার মুখ চোখ দেখতে পাসনে ? তোর পানে তাকালেই বিভোর—

সর্বনাশ ! নেবুমাসি এই সব দেখছেন আপনি ? ধ্যেৎ ! কক্ষনো না।

দেকব বলে কি আর দেকচি রে বাপু। চোকে পড়ে গেলে করব কি ? যাকগে। একটা কতা ভাবচি সারাদিন—

কি ভাবচেন ? কাল সকাল থেকে রাত অবদি কি কি খাওয়াবেন আপনার আদরের অতিথিদের ?

নেবুমাসি হেসে ফেলে বললেন, তাও ভাবছি, তবে আরো একটা কতা ভাবছি, থাক কাল বলব।

প্রবালের আশ্রয় জুটেছিল সরোজমোহনের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর উচ্চ হাসি আর উচ্চ রবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, সুদত্তা ভাবছিল এই ভেঙে পড়া প্রাসাদের মধ্যে এই জীর্ণ বিবর্ণ সব আসবাব পত্রের আবেষ্টনে, দিনরাত্রির খাজনা জুগিয়ে চলা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই বুড়ো ভদ্রলোকের—তবু এত প্রাণশক্তি আসে কোথা থেকে ?

মহিলাটির কথা তবু আলাদা। তিনি তাঁর পিতৃকুলের কুলমর্যাদা, বংশমর্যাদা, আচার-আচরণ সবকিছুর দায়িত্ব বহন করে চলে আসছেন, তার মধ্যে কর্তৃত্ব গৌরব রয়েছে। রয়েছে সংসার করার সুখও।

হলেও সে সংসারের সদস্য সুখী, সুখীর মা, চিরকালের প্রজা ঘর, বিনা ভাড়ায় বাসিন্দা রিকশাওলা নন্দ, আর পুরনো সরকার মণি পালের নাতি বাচ্চু। সংসারের ঠাট তো আছে। বাড়িটাই সংসার।

তবে প্রকাণ্ড এক প্রশ্নচিহ্নের মতো বিরাজ করছেন ওই বৃদ্ধ।

অনেক রাত্রে শুনতে পেল সুদত্তা, নেবুমাসি গলা তুলে কাকে যেন বলছেন, আজ রাতে কি আর ঘুমুতে-টুমুতে হবে না ? বলি ঘুমের কমতিতে ছেলেটার শরীর বিগড়ালে ?

কত রাত এখন ? প্রবাল এখনো জেগে ছিল ?

হঠাৎ খুব একটা ব্যাকুল আবেগ অনুভব করল সুদত্তা। ইচ্ছে করলেই সুদত্তা স্বর্গলোকের একখানি টিকিট কিনে ফেলতে পারে।

॥ ৪ ॥

ঘুম ভাঙল সুদত্তার রিকশাওলা নন্দর ডাক-হাঁকে।

দাদাবাবু গাঁ দেখতে বেরোবেন নাকি? গাড়ি মজুত আচে।

নেবুমাসি কখন উঠে গেছেন কে জানে। দেখল ওঁর বিছানাটি পরিপাটি করে ঝাড়া ঠিক করা। আস্তে বেরিয়ে এসে ভিতর দালানের জানালার ধারে দাঁড়াল সুদত্তা। দেখতে পেল উঠোনের ওপারে বারান্দায় প্রবালও সদ্য নিদ্রোত্থিত ভাবে দাঁড়িয়ে।

অপূর্ব একটা আনন্দরসে ভরে উঠল মন। নিজেকে হঠাৎ নব-বিবাহিতা বধূর মতোই মনে হল সুদত্তার। প্রবালের মুখে চোখেও বুঝি সেই একই অভিব্যক্তি। ইশারায় বলল, যাচ্ছি ওদিকে।

আর এই সময় নেবুমাসির চড়া গলার প্রশ্ন শোনা গেল—এই অতি সকালে গাঁ দেকাতে নিয়ে যেতে এসেচিস মুকপোড়া? একটু বোধ-গ্যান নেই? বলি বিচানা থেকে তুলে নিয়ে যাবি নাকি? অ্যাঁ!···কাগে এখনো বাসা ছাড়েনি। এখন এসেচ গাড়ি নিয়ে!

নন্দ সতেজে বলল, আমার কি দোষ? দাদু কাল বলে থুয়েছে ভোরে আসবি নন্দ। বেলা করে বেরোলে ফিরতে রোদ চড়া হয়ে যাবে।

অ তাই বল। আমিও তাই ভাবচি, নন্দ এমন সাতসকালে কাঁথা মাদুর ছেড়ে এয়েচে! যা, এখন যা, এক ঘণ্টা বাদ আসবি।

খোয়া খাপরা রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চলার শব্দ শোনা গেল। এবং নন্দ বিদায় পর্ব সমাধা হতে না হতেই সরোজমোহনের বিরক্ত গলা শোনা গেল, দেওয়া হল তো বিদেয় করে? নাও দেখ এখন কোন্ বেলায় আসে। ওদের এক ঘণ্টা মানেই তিন ঘণ্টা।

সুদত্তা আর প্রবাল দুজনে দু'দিক থেকে ঝুঁকে একই দৃশ্য দেখতে পায়।

লাল টুকটুকে সিমেণ্টের দাওয়া বোধ হয় সদ্য ধোওয়া হয়েছে, ঈষৎ

দূরত্ব রেখে মুখোমুখি দুখানি আসন পেতে চা খেতে বসেছেন। সদ্যস্নাতা নেবুমাসির পরণে কেটে থান, গায়ে একটা মটকা চাদর।

নেবুমাসির সামনে একটি উচু পাথরের গেলাসে চা। ঢ্যাঙার সামনে অবশ্য কাঁচের গ্লাশ। চায়ের আসল সরঞ্জাম নামেনি। তার মানে এটি ওঁদের বলতে গেলে বেড-টী।

আচ্ছা, মুখের ভাবে তো পরিতৃপ্তির কোন অভাব নেই। তবে গলার স্বর এই সক্কালবেলাতেই এমন কড়া কেন? নেবুমাসিরই অধিক।

তবে আর কি, হাত মুক ধোবে না, চা জল খাবার খাবে না, বিচানা থেকে উটেই গাঁ দেখতে বেরোবে। কী একেবারে তাজমহল দেকবার দেশ!

তাহলে আর ঘটা করে দেখতে যাওয়াই বা কেন? সরোজমোহন প্রায় খিঁচিয়ে ওঠেন, ফেরার সময় রোদ চড়বে সেটাই বলা হয়েছে। গোঁসাইবাগানে যাবে, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে যাবে—

যাবে তাতে আর কী? তোর সব তাতেই উটোন সমুদ্দুর ঢ্যাঙা। আমি এই নিত্য দিন সদ্দেশ্বরীর মন্দিরে যাই, তোর বচরে অ্যাকদিন হয়ে ওটে না! রিশকোয় যাবে আসবে—বলি ওটা হচ্চে যে?···· গেলাশটা পাত। বাটিতে চা আচে আরো।

বা হাতের কাছে একটা ঢাকা দেওয়া বাটিতে বোধ হয় বাড়তি চা মজুং। ঢ্যাঙা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, ওই তো ওইটুকু, থাক ও থেকে আর তোর দাতব্য করতে হবে না, নিজের গলায় ঢাল।

রাগ বাড়াসনে ঢ্যাঙা। কেন? সবটুকু আমার গলায় ঢালতে হবে কেন? মরুভূমি হয়ে আচে বলেচি?

তবে দে বাবা দে! গেলাসটা পাতলেন সরোজমোহন।

নেবুমাসি আঁচলের কোণ দিয়ে বাঁ হাতে বাটিটা ধরে দুটো গেলাশেই একটু একটু ঢেলে নিলেন।

সরোজমোহন একটু কোমল হাসি হেসে বললেন, এই সকালের চা-টুকুই চা! এ চায়ের সঙ্গে সুখীর মা'র হাতের চা। হুঁঃ!

চা সাঙ্গ করেই উঠে গলা তুললেন সরোজমোহন, ওহে প্রবালবাবু,

উঠেছেন নাকি ?

উঠে পড়ে নেবুমাসিও গলা তুললেন, হল ডাক-হাঁক শুরু ? কাল তো মাজ রাত্তির অবদি বকবক করে ছেলেটাকে ঘুমুতে দাওনি—

তবে ঘুমোক। যা বরং নাতির গায়ে আঁচল চাপা দিয়ে বসগে যা। এই মেয়েছেলেগুলোই হচ্ছে দেশের সর্বনাশের মূল। মায়ায় মরে গিয়ে বেটাছেলেদের আর বেটাছেলে হতে দেয় না।

নেবুমাসির হি হি হাসি ধ্বনিত হয়, ওঃ, কী আমার পণ্ডিতমশাই বুদ্ধি চুড়োমণি এলেন গো! তো বলি, তোর জন্যে তো জম্মোজীবনে কেউ মায়ায় মরেনি ঢ্যাঙা, তুই কেন ইয়া বীরপুরুষ হয়ে যুদ্ধে গেলি না। ঘরকুনো কুড়ের সর্দার।....নে, ওষুদটুকু খেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে করগে যা।

রোজ রোজ কিসের ওষুধ ? খাব না, যাঃ।

মহু দিয়ে মেড়ে ফেলেচি ঢ্যাঙা, আজ খেয়ে নে। কাল থেকে খাসনে।

এ কথা তো রোজ বলিস।

কি করব ? হাঁপানির টান উটলে আমারই তো দুদ্দশা! এই ব্যাধিটি যদি না থাকত, নেবু এই দৌলতপুরের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকত ? চাটি-বাটি উটিয়ে কাশীবাস করতাম গিয়ে।

সরোজমোহনের বিদ্রূপের গলা আকাশে ওঠে, থাম নেবু, আর বাকতাল্লা মারিস না। তুই নইলে তার কাশীবাসী হবে কে ? বলে একটা তেল মাখার বাটি হারালে বাড়ি মাথায় করিস, এই বৃহৎ পুরী দু'বেলা ঝাড়ু না পড়লে রাজ্য রসাতলে যায় তোর, আবার বৈরিগী বুলি ! ....আমার ব্যাধি আমার আছে, তোর কি ?

তা তো নিশ্চয়। নেবুমাসি গম্ভীব ভাবে বলেন, কতাতেই আছে মামার শালা পিসের ভাই তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। তা এ তো আবার পিসের ভাইপো। ওদের ছোট কাল থেকে দেকচি বলেই অ্যাকটা বিবেক-বোদ।

ওরে বাপ! শুধু বৈরাগ্য নয়, আবার বিবেক। যাত্রা পালা একেবারে। আর এক গেলাশ চা গলায় ঢাল নেবু। নইলে মাথা

পরিস্কার হবে না। বলে হা হা করে হেসে ওঠেন সরোজমোহন।

গোঁসাইবাগানের পথে যেতে যেতে নন্দ বলে, আজন্মো এক ঠাঁই রইল তবু দুটো মনিষ্যি যেন সাপে নেউলে। দেকতেচেন দাদাবাবু?

দেকতেচি।

ব্রেদ্ধ হয়েচে, এখনো সেই ছোটকালের ঝুটোপুটি ঝগড়ার অব্যেস গেল না। আমরা দেকি আর হাসি। অথচ এমনিতে দুটো মানুষই খুব ভালো। বাচ্চু বলে দুজনারই বোধ হয় কোঁদল লগ্নে জম্মো!

হাত চালাও নন্দদা। মানে পা চালাও। প্রবাল বলল, আগে যখন বাড়িতে আরো লোকজন ছিল। তখন এমন ছিল না বাবা। কে কোথায় থাকত। এখন ফাঁকা বাড়িতে চেঁচামেচির খুব সুবিধে হয়েছে।

সুদত্তা অদ্ভুত হেসে বলল, চেঁচামেচির সুবিধে নয়, চেঁচামেচিটাই সুবিধে।

তা চেঁচামেচিও থাকল, হাসি গল্পও থাকল পুরো দমে। খাওয়া দাওয়ারও মহোৎসব চলল। যাওয়ার আগের দুপুরে নেবুমাসি সেই কাল বলব বলে তুলে রাখা কথাটি ব্যক্ত করেন।

কবে আছেন কবে নেই তিনি বলা তো যায় না। তাই প্রবালের ভাবী বৌয়ের আশীর্বাদ পর্বটা সেরে রাখবেন তিনি। অতএব—

হ্যাঁ সেই অতএবটাই আসল। শরদিন্দুনিভাননীর বাবার দেওয়ালে পোঁতা চোরাসিন্ধুক থেকে তাঁর গহনার বাক্সটি বার করে দিতে হবে।

আমার সেই গিণির মালাটা আমি মনে মনে পলার বো'র জন্যে তুলে রেকেচি। নেবুমাসী বললেন।

গিণির মালা, প্রবাল লাফিয়ে ওঠে। ক্ষেপেছ না পাগল হয়ে গেছ? নাকি আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছ নেবুমাসি? আজকালকার দিনে গিণির মালা! ঢ্যাঙা দাদু, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

নেবুমাসি সতেজে বলেন, আমার জিনিস, আমি যদি স্বেচ্ছায়

কাউকে উপহার দিই, তাতে থানা পুলিশের কথা আসে কেন রে ?

কেউ বিশ্বাস করবে না নেবুমাসি ! গিণির মালা ! এক একখানা গিনির এখন কত দাম জানো ?

জানিনে। জানতে চাইওনে। আমি তো কিনতে যাচ্চিনে। বাবা দিয়েছিল, ও তো আমার স্ত্রীধন। যাকে ইচ্ছে দেব। দিইনি কী ? কতজনাকে কত দিয়েচি আগে আগে। গহনা তো কম ছিল না। বুঝলি খুকু, ওজন করে তু'সের সোনা দিয়েছিল বাবা—

তু'সের ! সুদত্তা হেসে উঠে বলল, সোনার সের !

তোদের একালে ভাতের চাল ভরি দরে বিকোয় আমাদের সেকালে অবস্থাপন্নের ঘরে সোনার হিসেব ওই রকমেই হতো বাছা। মাতা থেকে পা অবদি সোনায় মোড়া বৌ গিয়ে তুধে আলতার পাতরে গিয়ে দাঁড়াল।....আর তো যাইনি, সকল সোনা বাবার ওই চোরা সিন্দুকের মধ্যে। তো একে একে বিলিয়েচি অনেক। যতজনের বে হয়েচে, একেকখানা করে গহনা দিয়েচি। চর বাজুবন্দ, চিক সিঁতিপাটি, সীতাহার, পুষ্পহার, গোট, বিছে, অনন্ত, তাগা, ইয়া মকরমুকো বালা, ফাঁস হার রতনচুর—

নেবুমাসি ! প্রবাল বলে ওঠে, এই সব তুমি দাতব্য করেছ ? শুনে আমার মাথা ঘুরছে। দিলে কোন্ প্রাণে ?

হেসে ওঠেন নেবুমাসি, কি ছেলেবয়েসের বুদ্ধি। বিধবা মানুষ গহনা নিয়ে কী করব ? তা যাক, একনো যা আচে অনেক। পালিশপাতের চুড়ি, বারোমেসে গোখরিচুড়ি, মানতাশা, ওই গিণির মালাটা—তো বাক্সটা তুই আমায় বের করে দে দিকিন ঢ্যাঙা।

ঢ্যাঙা অম্লান মুখে বলেন, কত কাল থেকে বলছি না, চাবিটা হারিয়ে গেছে। লোকজন ডেকে চাবি বানাও।

নেবুমাসি ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, শুনছিস পলা বেআক্কেলের কতা ! লোকজন ডেকে আমি চোরাসিন্দুক দেকাই। পর দিন বাড়িতে ডাকাত পড়বে না ?

ঢ্যাঙা অবিচল, তবে আমি নাচার !

নাচার বললেই নাচার? আমি বড় মুক করে বললাম গিণির মালা দিয়ে আশীর্বাদ করব পলার হবু বৌকে—

তুমি দিলেই কি আমি নিতাম নেবুমাসি? প্রবাল বলে।

নিতিস না?

পাগল তো নই! তাছাড়া তুমি তো স্বপ্নে বাগান বানাচ্ছ। তোমার ওই খুকু আমার বৌ হতে রাজী হবে কিনা সে-গ্যারান্টি আছে?

বটে? নেই গ্যারান্টি? ডাকত দেকি তাকে—খুকু!

থাক থাক– ঢ্যাঙা বলে ওঠেন, জিনিসটা যখন দিতেই পারছ না—

দিতেই পাচ্ছি না? সাফ জবাব? তুই বুড়ো ধাড়ি ছেলে, সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে বসে আছিস। তা, একটু হায়া লজ্জা নেই? চাবি না থাকে পলাতে তোতে চাড় দিয়ে খোল।

প্রবাল আর সরোজমোহনের চোখে চোখে একটা ইশারা খেলে যায়। এবং প্রবাল প্রবল স্বরে বলে, চাড় দিয়ে? সেকালের বিলিতি কোম্পানির দেয়ালে গাঁথা আয়রণ সেফ চাড় দিয়ে খুলবে তুমি নেবুমাসি? বরং তোমার বাবার এই বাড়িখানা চাড় দিয়ে খুলতে পারতে পারো—ওটিকে পারবে না।

তবে কি তোরা বলতে চাস, আমার সেই গহনার কাঁড়ি, সেই গিণির মালা দেয়ালের মধ্যে গুম্‌খুন হয়ে মরে পচবে? ও সব শুনতে চাই না ঢ্যাঙা, গিণির মালা আমার চাই-ই চাই।

চাই বললেই চাই? আজ দশ বছর ধরে তো সেই চাবি খুঁজছি রে বাপু। না পেলে?

পাশের ঘরে সুদত্তা। শুনতে পেরেছে সবই।

স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবে, তাকে কেন্দ্র করে এ কী ভয়ানক একটা কলঙ্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে পড়ল? সুদত্তা কি ছুটে গিয়ে বলবে, আমি এক্ষুনি চলে যাব। ফুল ভেবে যা ধরতে যাচ্ছিলাম, সেটা এমন ভয়ঙ্কর একটা সাপ?

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক! কিন্তু তাই কি সম্ভব? এত বড় ভয়ানক অপরাধ করে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকতে পারে কেউ?

চাবি তুই হারালি কেন?

ইচ্ছে করে কেউ হারায়? তুই আমায় দিতেই বা গিয়েছিলি কেন? নিজে রাখলেই পারতিস।

আমি ও সব কলকব্জা জানি? ইংরিজি ইংরিজি অক্ষর সব ঘোরাতে হয়, কতা তৈরি করতে হয়, সে কি আমার কম্মো?

তবে যেমন কম্ম তেমনি ফল ভোগ কর। বাপ ভাইকেই লোকে বিশ্বাস করে চাবি দেয় না, আর আমি একটা পরস্য পর, আমার হাতে চাবি দিতে এলি। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। এখন কী করবি কর। পুলিশ ডেকে হাতকড়া দিতে ইচ্ছে হয়েছে!

বলেছি আমি সে-কতা?

পাকে প্রকারে বলচিস। চাবি হারিয়ে গেছে। গিণির মালা পাওয়া যাবে না, ব্যস—বলে সরোজমোহন নামের ব্যক্তিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

নেবুমাসি চেঁচাতে থাকেন, এত অহঙ্কার ভালো নয় ঢ্যাঙা। আমার মনিষ্যি বলেই মনে করচিস না। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলি—

প্রবাল এ ঘরে এসে বলে, সত্যি কথাটা বলে ফেলুন না দাদু! দারুণ চটেছেন নেবুমাসি।

সরোজমোহন একটু রহস্যের হাসি হেসে বলেন, সত্যি কথাটা শুনলে আরও চটবে রে পলা। যখন শুনবে ওর জন্যেই আমার এই অকম্মো তখন—

কিন্তু আপনার এই ডিসিশান নেওয়াটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত ঢ্যাঙা দাদু।

সরোজমোহন গম্ভীর ভাবে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলেন,

উপায় কী বল? রাজকন্যের যে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবার জো নেই। বাড়ি ভেঙে ওয়ার হচ্ছে, তবু ঠাক-বাটটি বজায় থাকা চাই। দোল-দুর্গোৎসব চাই, গোটা চারেক দাসদাসী চাই—এখনো লোক-লৌকিকতার বাহারটি সমান রাখা চাই। পাড়ায় কারো বাড়িতে ভাত পৈতে বিয়ে হোক না, এ বাড়ি থেকে সেরা মাল যাবে। আকাশ থেকে পড়বে টাকা? কিন্তু এতদিন বেচারা জানতেন তার বাক্সভর্তি গহনা আছে, হঠাৎ যদি টের পান সব হাওয়া, হার্টফেল করে বসবেন না? সেই ভয়েই তো চাবিটাকে হারাতে হয়েছে রে ভাই।

কিন্তু ভয়টার কি সত্যিই কোন মূল্য ছিল? না অমূলক?

নইলে এরা যখন চলে আসছে, তখন কি না বলে ওঠেন নেবুমাসি, থাক হয়েছে। আর চাবি খোঁজা চাবি খোঁজা খেলা খেলতে হবে না ঢ্যাঙা। এরা এগোচ্চে, বেরিয়ে আয় ঘর থেকে। চাবি বেরোলেই কি আর আমার সেই গিণির মালা বেরোবে? ও নির্ঘাৎ তুই তলে তলে বেচে খেয়েচিস! নচেৎ দশ বচর ধরে নাকি লোকে চাবি খুঁজে মরে পায় না।···সন্দ আমার হয়েচে কবে থেকেই, এত লপচপানি চলচে কোথা থেকে? নেবু যখন যা হুকুম করচে তামিল হচ্চে। নেবুর বাপের জমিদারী তো ওদিকে ঢুঁ ঢুঁ হয়ে এয়েচে।···অমনি হচ্চে? কত ধানে কত চাল বোজে না নেবু? কিন্তু তোর দুঃসাহসকে বলিহারী দিই ঢ্যাঙা। এ বার্তা পাঁচ কান হলে লোকে তোকে কি বলবে ভেবে দেকেচিস?

ঢ্যাঙা বিশ্ব নস্যাতের ভঙ্গীতে বলেন, দেখব না আবার কেন? তুই যা বলছিস, তাই বলবে। বলবে চোর।

কি? কি বললি? আমি তোকে চোর বলেচি?

চোর না হয়, জোচ্চোর বলেছিস।

নেবুমাসি চড়া গলায় বলেন, তা বলবই তো, জোচ্চোরকে জোচ্চোর বলব না তো কি মহাপুরুষ বলব? বল তো পলা—বল তো বাছা খুকু?

সুদত্তা প্রণাম করছিল। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে

বলে, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নেবুমাসি!

রিক্‌শায় চলতে চলতে প্রবাল বলল, আসার সময় ওই কথাটা বলা তোমার ঠিক হয়নি সুদত্তা। শুনতে খারাপ লাগল।

কোন্ কথাটা? সুদত্তা সচকিত হয়।

ওই নেবুমাসির সঙ্গে একমত হওয়া।

সুদত্তা হেসে উঠে বলে, সত্যি কথাগুলোই সব সময় শুনতে খারাপ লাগে প্রবাল। চিরদিনই তো লোকটা জোচ্চুরী করে এসেছে। নিজের সঙ্গে, ভালোবাসার লোকের সঙ্গে।

অনিন্দিতা

নতুন গজিয়ে ওঠা শহরতলী নয়, শহর থেকে মাইল কতক দূরে কতকালের ঘুমিয়ে থাকা এক নিথর গ্রামের নবজাগ্রত সংস্করণ। এই জাগ্রত সংস্করণের মলাটটা দস্তুরমতো জমকালো। সেই মলাটের নক্সার শুরু স্টেশনের গায়ের কাছেই গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ানো আলো ঝলমল সিনেমা হল দিয়ে। ভঙ্গীটা উদ্ধত, নামটি কাব্যিক। এখানকার হাটুরে লোকরাই শুধু নয়, বাবু ভদ্দর লোকেরাও প্রথমে বুঝতে পারেনি 'প্রহাসিনী' নামটার মানেটা কি।

তা' ক্রমশঃই এদের উন্নতি হচ্ছে, দ্রুত উন্নতি। সেই উন্নতির পরিচয় মেলে ওই 'প্রহাসিনী'র লাইন ধরে এগিয়ে আসা টিউবলাইট আর পালিশ চকচকে কাউণ্টার শোভিত দোকানের সারিতে, এবং শহুরে নক্সায় গড়া কিছু কিছু নতুন বাড়ির বাহারে।

দিনের শুরু 'স্টেশনারি শপ,' 'তুষারগিরি লণ্ড্রী' 'কেশকান্তি হেয়ার কাটিং সেলুন' 'দেহশোভা' 'চরণরক্ষিণী' 'শাড়ি সমুদ্র' 'ব্লাউস মহল' ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সভ্যতার এই অগ্রগতি যেন সহসা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে জিরিয়ে নিতে বসেছে 'পীরের কালীর' প্রাঙ্গণ প্রান্তে।

পীরের কালী এ তল্লাটের একটি সদাজাগ্রত দেবতা। কালীর সেবাইত যখন যেমনই থাকুন কালী তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। দূর দূর গ্রাম থেকেই শুধু নয়, বড় বড় শহর থেকেও বিস্তর লোক আসে। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কলকাতার যাত্রীতে ভরে যায় কালীর প্রাঙ্গণ।

পীরের কালীর কোনো মন্দির নেই, প্রকাণ্ড জঙ্গলের মাঝখানে বিরাট এক পাকুড় গাছের তলায় বাঁধানো চত্বরে খোলা জায়গায় তাঁর অবস্থান। সম্বলের মধ্যে মাথার উপর ছাতার আকারে একখানা গোলপাতার ছাউনী। কার্ত্তিক পূর্ণিমার পরই ওই ছাউনীটার একবার করে সংস্কার হয়। নিয়মমাফিক ওই সংস্কার তিথিতে কখনো কখনো একমুঠো নতুন গোলপাতা এনে পুরনো ছাউনীর উপর চাপিয়ে দিয়েও কাজ সারা হয়। তাছাড়া আর কিছু নয়।

ওইটুকু আচ্ছাদনের আশ্রয়েই দেবী রোদ বৃষ্টি ধূলো ঝড়, প্রকৃতি সর্ববিধ প্রকোপ সহ্য করেও প্রসন্ন মহিমায় অবিচল দাঁড়িয়ে আছেন।

কে জানে এই থাকাটা কতদিন থেকে।

কোনকালে কোন পীরসাহেব এক একটা গণ্ডগ্রামে এসে আস্তানা গেড়ে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং জমিদারের কাছে বিনা খাজনায় ওই পঞ্চাশ বিঘে জমি দান পেয়েছিলেন, তার সাল তারিখ এ তল্লাটের কারুরই জানা নেই। নিতান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও বলে থাকেন তাঁদের পিতামহ প্রপিতামহরাও নাকি এই 'কালীর জঙ্গলে' খেলে মানুষ হয়েছিলেন। হয়তো তখন জঙ্গল এমন প্রবল ছিল না, খেলে বেড়াবার ঠাঁই ছিল, এখন যেটা নেই।

তবে দেবীকে ঘিরে কিম্বদন্তী আছে অসংখ্য, পীরসাহেব সম্পর্কেও প্রচলিত কিম্বদন্তী কিছু কম নেই। শুধু সাল তারিখটাই বলতে পারে না কেউ। কল্পনাকে যথেচ্ছ বিস্তৃত করে পাঁচশো থেকে হাজার বছরের দরজায় ঠেলে দেয়।

সত্য হিসেব থাকলে সাল তারিখটা কোথায় থাকতো কে জানে।

এতদিনের বিগ্রহ, তবু তাঁর কোনো মন্দির নেই। কেন নেই, এ প্রশ্ন বহিরাগতেরা করে থাকে, তার উত্তরও আছে।

ওটা দেবীর স্বপ্নাদেশ।

মন্দিরের মধ্যে বন্ধনে থাকতে রাজী নন উনি। নচেৎ সম্পত্তির তো তাঁর অভাব নেই। ভক্তেরও অভাব নেই। এমন ভক্ত অনেক আছে যারা একটি 'মানৎ উদ্ধার' করতে একাই একটা মন্দির নির্মাণ করে দিতে পারে। আর মানত করে সফল হবার নজীরই তো বেশী নেহাৎ ভাগ্যের কোপ আর গ্রহবৈগুণ্য না থাকলে কেউ চেয়ে বিফল হয় না।

তাছাড়া দেবী তো এই বিরাট জমিটিরও মালিক। গ্রামে শহরের ছায়া পড়ার দরুণ যার দাম আগের তুলনায় বিশ পঁচিশ গুণ। হয়তো তারও বেশী। ওই জমির সামান্য অংশ মাড়োয়ারীদের বেচে দিলে (যারা নাকি প্রস্তাব দিয়েই রেখেছে) মোজেক মেজে দিব্যি মন্দির হয়ে যায়।

কিন্তু হবার জো নেই দেবী মন্দিরে অরাজা।

এমন কি দেবীর জঙ্গলের একটি লতাগুল্মে পর্যন্ত কোপ বসানোর হুকুম নেই।

কার হুকুম নেই?

দেবীর। আবার কার?

অতএব ওই 'কালীর জঙ্গল' অনড় হয়ে আছে গ্রামটার বক্ষস্থলে। জঙ্গলই। বাগান বললে ভুল বলা হবে। যদিও ভালো ভালো ফলের গাছ আছে অনেক, বারো মাসের পূজার প্রয়োজনে বারমেসে ফুলের গাছ আছে প্রচুর, আব যাকে বলে 'ঔষধি বৃক্ষ' তাও আছে বেশ কিছু। তথাপি লতাগুল্মের জটে সবটাই প্রায় অন্ধকার, ঢুকতে গেলে গা ছমছম করে। আর দেখলে মনে হয় স্টেশনের ধারে নতুন গজিয়ে ওঠা সভ্যতার অগ্রগতিটা যেন সহসা এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে মরেছে, বেরোবার দিশে পায়নি।

তাই কালীর জঙ্গল পার হবার পরই গ্রামের চেহারাটা কেমন অগোছালো আর শিথিল শিথিল। গ্রামের রূপটা আছে, তার ছন্দটা গেছে। প্রথম ছন্দপতন ঘটিয়েছে একটা কর্কশ স্বর গম ভাঙানো চাকী। এ জিনিসটা গ্রামের চিরন্তন দৃশ্যের অন্তর্গত নয়। ওটা বিজাতীয়, তারপর কয়েকটা জীর্ণ বাড়ির পরে একটা কেরোসিনের ডিপো, করোগেট টিনের শেড্ এর নীচে এই যে ডিপোটি, গ্রামের দৃশ্যের মাঝখানে ওটা যেন একটা কালির ছাপ। কুশ্রী, ছন্দহীন। অথচ ওই ডিপোটা এখানে হওয়া পর্যন্ত গ্রামের লোক বেঁচেছে। নচেৎ এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুটির জন্যে প্রচুর হাঁটতে হতো লোকদের। সেই নিউ টাউনের এলাকা পর্যন্ত বোতল হাতে ছুটতে হতো। এখন লোকে লণ্ঠনটা, জনতা স্টোভটা অবধি হাতে করে নিয়ে এসে ভর্ত্তি করে নিয়ে যায়, যেমন নিয়ে যায় গঙ্গা থেকে জল।

কেরোসিনের ডিপো থেকে খানিকটা এলোমেলোর পর একটা খড়কাটা মেশিন খাটে চারিদিকে খড়ের কুটোর ঘূর্ণি তুলে। এটাও গ্রামের দৃশ্যের সঙ্গে খুব খাপ খায় না, লোকেরা তো চিরদিন করাতি বঁটি দিয়েই খড় কেটেছে। এই তিনটে জিনিসই কোথা থেকে যেন

বহারীরা এসে বাসিয়েছে, ভাগ্যান্বেষণে ওরা স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সর্বত্র যেতে পারে তো। তা' ওরা বাঙালী হোক আর অবাঙালী হোক, গ্রামের লোক ওদের ছু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে।

কম দুর্ভোগ বেঁচেছে লোকেরা?

এখন সুবিধে এসেছে, আরাম এসেছে, সেই আরামের পথ ধরে এসেছে—কিন্তু সেকথা থাক। মোট কথা, ওই এলোমেলো ছু' একটা দৃশ্যের পর প্রায় সমস্তটাই পূর্ববৎ। সেই পানাপুকুর, সেই জরাজীর্ণ ভিটেবাড়ি, সেই ভাঙাচোরা ঠাকুরদালান, আর আলকাতরা মাখা ক্যানেস্ত্রা কাটা টিন জুড়ে জুড়ে তৈরী গোয়ালের দৃশ্য।

তবু ওরই খাঁজ খন্দ থেকে টেরিলিন প্যাণ্ট পরা ছেলেরা সাইকেল চেপে বেরিয়ে এসে স্টেশনের দিকে ছোটে ড্যালহাউসীতে গিয়ে আছড়ে পড়বার জন্যে, ছাপা সিল্কের শাড়ি পরা মেয়েরা বইয়ের গাদা বুকে করে সাইকেল রিক্সায় চেপে স্টেশনে ছোটে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভিড় করবার জন্যে। মা ঠাকুমা ভাঙা দেয়াল জুড়ে ঘুঁটে ঠুকছে, আর মেয়ে এম. এ. পড়তে ছুটছে এ ঘটনা এখন আর এখানে বিরল নয়। মেয়েগুলো ছেলেদের মতই দৌড়ঝাঁপ করে লেখাপড়া করতে যাচ্ছে এমন কথা এখানে কয়েক বছর আগেও ভাবতে পারতো না, এখন সহজেই মেনে নিচ্ছে। ট্রেন ফেল করে বসলে গঙ্গায় খেয়া পার হয়ে অন্য লাইন ধরেও পৌঁছে যাবার কলাকৌশলেও রপ্ত হয়ে গেছে তারা।

গঙ্গা আছেন। কারো কারো প্রায় খিড়কির পুকুরের মতই ঘরের দোরেই আছেন। যদিও চেহারাও তাঁর প্রায় ওই খিড়কির পুকুরের মতই হয়ে এসেছে, তবু মাহাত্ম্যটা অটুট আছে।

এখনো এরা, কালীর জঙ্গলের একদিকের লোকেরা বিশ্বাস করে এক ছিটে গঙ্গা জল মাথায় ছিটোলেই শুদ্ধ হওয়া যায়, বিশ্বাস করে ওই গঙ্গাই যোগে যাগে মন্দাকিনী হয়ে ওঠেন।

ডুবে মরবার মতো জল না থাকলেও বিশ্বাসটা আছে। কালীর জঙ্গলের ওধারের লোকেরা বোধ করি ঠিক এদের মতো নয়, ওরা স্বচ্ছন্দে অনেক কিছুই অবিশ্বাস করে বসে। কারণটা হয়তো এই,

ওদের মধ্যে বহিরাগতের মিশেল আছে, মিশেল আছে ভাগ্যান্বেষী ঝানুদের। ওদিকে ভিটেবাড়ির থেকে ভাড়াটে বাড়ির সংখ্যাই বেশী।

ওরা পীরের কালীকে ভয় ভক্তি করলেও, অসুখ বিসুখ করলে শুধু মানত করেই ক্ষান্ত হয়ে বসে থাকে না, ডাক্তারবাড়িও ছোটে, এদের মত 'মা, তুমিই ভরসা' বলে ধূলোয় বুক দিয়ে প'ড়ে থাকে না।

জঙ্গল মধ্যবর্তিনী মা যেন তাঁর বাম দক্ষিণ দুই নেত্রে দু'দিকের হৃদয় রহস্যের এই পরম কৌতুকটি নীরবে উপভোগ করেন।

তবে মায়ের যিনি প্রতিনিধি, তল্লাটের ভক্তবৃন্দের দৃষ্টিতে যিনি মায়েরই সমকক্ষ, দেয়াশিনী-মা, তিনি আদৌ নীরবে উপভোগ করেন না! তিনি সরবে ধিক্কার দেন, কেন, তোরা আবার এখানে কেন? তোরা এখানে কেন? তোদের বড়ো বড়ো ডাক্তার রয়েছে। বিলেত ফেরৎ 'পেশালিষ্ট', তোরা কি করতে? মাকে পরীক্ষা করতে? বেরো বেরো, মায়ের থান থেকে দূর হয়ে যা।

আবার এদেরও বলতে ছাড়েন না, বিপদে পড়লে তখন 'মা মা' কেমন? বলি সাঁজ সন্ধ্যেয় ক'বার স্মরণ করিস মাকে? মা আমার ছেলের চাকরী করিয়ে দাও, মা আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, মা আমায় মামলায় জিতিয়ে দাও, মা আমার স্বামী পুত্তুরের রোগ সারিয়ে দাও' চব্বিশ ঘণ্টা কেবল দাও আর দাও। বলি 'নাও' বলতে জানিস একবারও? মা আমার প্রাণের ভক্তি নাও, শ্রদ্ধা নাও, যা কিছু ভাল তা নাও, এসব কথা বলেছিস কোনো দিন?

তবে কটু কথায় 'ভক্ত' তাড়ানো যায় না। বরং আরো বিগলিত হয় তারা, আকুল হয়ে আরো প্রার্থনা জানায়। অনায়াসে নিজেদেরকে 'সংসারের পোকা' 'নরকের কীট' 'অধমের অধম' বিশেষণে ভূষিত করে, কান মলে নাক মলে পায়ে ধরে।

দেয়াশিনী-মা! পীরের কালীর সেবিকা, পীরের কালীর প্রতিনিধি।

এ নামের অর্থ কি, অথবা শব্দটা কিসের অপভ্রংশ, সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, ওই প্রচলিত শব্দটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে বিপদ-তারিণী বলে।

আর 'স্মরণ করে না' এটাও মিথ্যা অপবাদ। এ পথ দিয়ে

যাতায়াতের কালে হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকায় না, এমন কেউ নেই এখানে। তা সে সিনেমা দেখতেই যাক্, আর জুতো কিনতেই যাক। স্কুল কলেজ অফিসের উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরতে যেতে তো বটেই।

ছোট ছোট বাচ্ছারাও জ্ঞানাবধি আপন কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে 'মাইরি মা পীরের কালীর দিব্যি' বলতে অভ্যস্ত হয়। কম বয়সী বৌ মেয়েরাও মা-ঠাকুমা-শাশুড়ী পিসশাশুড়ীকে লুকিয়ে মানত করতে শেখে। হয়তো বরের চিঠি আসার তাগিদ নিয়ে, হয়তো পরীক্ষায় পাশ করা নিয়ে।

ভারতীয় কিন্তু এসব তাগিদের কিছু নেই, আর ভারতী মানত করতেও আসে না।

তবু ভারতী যখন তখনই এখানে এসে হাজির হয়। আর দেয়া-শিনী-মার সামনে ডান হাতের চেটোটা মেলে ধরে বসে।

মেয়েদের নাকি ডান হাতের রেখা অকেজো, তাদের যা কিছু ভাগ্যরহস্য নাকি বাম হাতের তালুতেই ধরা থাকে, কিন্তু জেদী এক বগ্গা মেয়ে ভারতী জোরে জোরে বলে, 'ওসব আমি মানতে রাজী নই। তোমার ওই রবি শশী গ্রহ-নক্ষত্রের কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে পৃথিবীর এই কোটি কোটি লোককে ভাগ্যের ফলাফল দেবার সময় হিসেব করতে বসবেন, কে মেয়ে, কে ছেলে, কাকে বাঁ হাতে দেবো, কাকে ডান হাতে। ডান হাতই দেখো আমার, ফললে তাতেই ফলবে।

দেয়াশিনী-মা অনেককে বকা ঝকা কটুকাটব্য করলেও, কেন কে জানে এই মেয়েটাকে—যেন এঁটে উঠতে পারেন না। হয়তো বা ভিতরে ভিতরে কোথাও একটু স্নেহের প্রশ্রয় আছে, হয়তো বা ওর প্রখরতাকে সমীহের চোখে দেখেন। অথবা, হয়তো ওই মেয়েটার ওপর ভবিষ্যতের কোনো আশা পোষণ করেন।

কারণ যাই হোক, মোটকথা মেয়েটা ওই দেয়াশিনী-মাকে আদৌ ডরাত না। ওর কোনো প্রশ্ন থাকলে জোরালে গলায় বলে, তোমার ওই শনি মঙ্গল কাইলের আদেশটাদেশ বুঝি না। আমার এখুনি

জবাব চাই। জিজ্ঞেস করো তোমার মাকে। ওনার ঘরের দেয়ালে উনি কি ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে রেখেছেন? আর বার তিথি দেখে দেখে তবে সিদ্ধান্ত করছেন জবাব দেবো, কি দেবো না, এই কথা বিশ্বাস করবো আমি? মা যদি তোমার নিত্য জাগ্রত তো শনি মঙ্গল ছাড়া 'আদেশ' পাওনা কেন?

বলে আর দেয়াশিনী-মার ঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে গেঁটিয়ে বসে।

এ পরিবেশে দূর দূর করা সম্ভব হয় না। আর দূর দূর করলেই যে উঠে যাবে এমনও মনে হয় না। অতএব দেয়াশিনী-মাকে মা কালির কাজে বিশেষ আর্জি করে বিশেষ আদেশ নিতে হয়। আর মেয়েমানুষের ডান হাতের করতল নিয়েই তার করকোষ্ঠি বিচার করতে হয়।

অথচ হতভাগ্য মেয়েটা চলে যাবার সময় স্বচ্ছন্দে বলে যায়, 'ছাইয়ের আদেশ! তোমার মা ছাই কথা শোনেন তোমার। ঘোড়ার ডিম!'

আর আশ্চর্য, দেয়াশিনী-মা হাসিমুখেই বসে থাকেন।

কিন্তু ভারতী কি এ গ্রামের মেয়ে?

উঁহু। এই গ্রামের তো দূরের কথা, এ তল্লাটেরই নয়। এমন কি বাংলা মুলুকের মানুষই নয়। মা-বাপ-ভাই-বোনহীন একটি নির্বান্ধব মেয়ে। দূর সম্পর্কের এক জ্যেঠতুতো দাদার বাড়িতে মানুষ হয়েছে মধ্যপ্রদেশের কোন 'একটা' জায়গায়।

জ্যেঠতুতো দাদা অবশ্য আগ্রহ করেই ওকে কলকাতার আত্মীয়-সমাজ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল, এবং সে বাবদ অনেক ধন্যি ধন্যিও কুড়িয়েছিল। কিন্তু আগ্রহটা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলো না। দাদার কুচোকাঁচা ছেলেমেয়েগুলো যতদিন কুচোকাঁচাই ছিল ততদিন ছিল আগ্রহ, তাতে ভাঁটা পড়লো ওই কুচোগুলো বড় আর কাঁচাগুলো পাকা হয়ে ওঠার কাল থেকে।

বৌদির মেয়ে তিনটে দস্যি হয়ে ওঠার পর থেকে বৌদি ক্রমশঃই সংসারে ভারতীর অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে সক্ষম হলেন, তাই খবরের কাগজের 'পাত্রী চাই'য়ের বিজ্ঞাপন দেখে ওর একটা পাত্র খুঁজে ফেলে

বিয়েটা সেরে দিয়ে দেশছাড়া চোখছাড়া করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ভারতী এ গ্রামের মেয়ে নয়, বৌ মাত্র।

আশ্চর্য! বৌ মানুষের এত দাপট!

তাছাড়া এতো ঘন ঘন আসারই বা দরকার কি তার?

ভগবান জানেন, কিসের দরকার, আসে, সেটুকুই দৃষ্টিগ্রাহ্য।

অথচ শ্বশুরবাড়ির বৌ, আর দেশটার ওই অনগ্রসর অংশের বৌ। হলেও দেবস্থানে, যখন তখন এমন হট্‌হট্‌ করে এসে হাজির হওয়ার অধিকার অর্জন করা আশ্চর্য বৈ কি!

তবে 'অর্জন' শব্দটা রহস্যময়। সেই রহস্যময়তার মধ্যে থেকেই হয়তো ভারতীর এই অধিকার।

অবশ্য শুধুই যে অধিকার অর্জন তাতো নয়, অবকাশও তো আহরণ করতে হয়? তা সে ব্যাপারেও ভারতী ওস্তাদ। বড়লোকের বাড়ির বৌ তো নয়, আবরণ আচ্ছাদন দেখলে বরং মনে হয় দৈন্য-দশাগ্রস্তের বাড়ির, কাজেই সে বাড়ির বৌ মানুষের অখণ্ড অবসর হবার হেতু নেই। তবু সে অবকাশ করে নেয়। নইলে বাড়িটাও তো তার নেহাৎ কাছে নয়।

কিন্তু কেমন করে যেন এই কালীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আবিষ্কার করে নিয়েছে সে, সেইখান দিয়েই যাতায়াত তার। তা' সেই যাতায়াতটা ভর দুপুরেই হোক আর ভর সন্ধ্যাতেই হোক।

ওই বুনোবুনো গন্ধ আর ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকতে জোয়ান মানুষেরও গা ছমছম করে, এ মেয়েটার করে না।

আজও এসেছে সন্ধ্যে পার করে।

হাতে একটা লণ্ঠন অবশ্য আছে দেশের রীতি অনুযায়ী, কিন্তু লণ্ঠনটাকে এতো দোলাতে দোলাতে এসেছে যে সেটা দপ্‌দপ্‌ করতে করতে আলোর চাইতে ছায়ার আমদানী বেশী করে হঠাৎ এক সময় নিভে গেছে।

নেভা আলোটাকে দাওয়ায় ঠক্‌ করে বসিয়ে রেখে ভারতী স্বভাব-

সিদ্ধ জোরালো গলায় বলে, তোমার মায়ের ভোজন টোজন চুকেছে? এখন একটু নিশ্চিন্দ হয়ে বসতে পারবে?

দেয়াশিনী-মাকে 'তুমি' করে কথা অনেকেই বলে থাকে, গিন্নীরা তো বলেই থাকেন, কিন্তু ভারতীর মতো বৌ টৌরা কদাচ 'তুমি' করে না। কিন্তু ভারতী করে। ভারতী স্বচ্ছন্দে বলে 'মা তুমি।' এখনো বললো, একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে বসতে পারবে?

দেয়াশিনী-মা কিন্তু ওর কথার জবাব দেবার ধারও ধারেন না, বলে ওঠেন, মরবি মরবি, একদিন সাপের কামড়েই মরবি তুই। অন্ধকারে এলি তুই ওইখান দিয়ে?

ভারতী তিরস্কারের উত্তরে হেসে উঠল, বলে, মন্দ কি? মানুষের কামড়ের থেকে খারাপ কিছু নয়। তাছাড়া—অমর হবার বাসনাও তো পোষণ করছি না বাবু।

তা বলে ইচ্ছে করে সাপের মুখে পড়তে হবে?

পড়লেও কিছু হবে না।

ভারতী দুটো হাঁটু জড়ো করে সে দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে গুছিয়ে বসে বলে, অবিশ্যি তোমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি সত্যি হয়। তুমিই তো বলো, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা, এ একেবারে জন্মকালে কপালে লেখা থাকে। ও আর খণ্ডাবার নয়। তাহলে? লেখা থাকলে লোহার বাসরেও সর্প দংশাবে।

তোর সঙ্গে কুতর্কে কে পারবে? বলে দেয়াশিনী-মা ঘন ঘন হাতের জপের মালাটা ঘোরাতে থাকেন।

দেয়াশিনী-মার রং তামাটে, চেহারা দোহারা বলিষ্ঠ, মুখের গড়ন শক্ত চৌকো।

দেয়াশিনী-মার পরণের গেরুয়া থানটি লালচে আভাযুক্ত গেরুয়া। দেয়াশিনী-মার হাতের জপের মালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের। এক কথায় দেয়াশিনী-মার চেহারাটি ওঁর এই জঙ্গল মধ্যস্থিত এই একখানি মেটে ঘরের পরিবেশে রীতিমত ভীতিকর।

দাওয়ার কোণে একটা চৌকো লণ্ঠন জ্বলছে বটে, তা সেটা যেন জোনাকীর আলো জ্বালা আলো জ্বালা খেলার সমগোত্র।

রাতবিরেতে পথ চলতি কেউ ওই টিমটিমে আলো জ্বালা ঘরখানার দিকে তাকিয়ে ফেললে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মায়ের নাম করে নমস্কার করে চোখ বুজে পার হয়ে যায়।

অথচ ভারতী একেবারে ভয়শূন্য।

যেন 'নির্ভয়ের' বর পেয়েছে কোথাও।

তাই দেয়াশিনীর এক প্রস্থ মালা ঘোরানো শেষ হতেই বলে ওঠে, 'আমাকে তো বলা হচ্ছে। আমি তো তবু লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম, বাতাসে নিভে গেল তাই। আর নিজে কী? নিজে এই বাঘ লুকনো জঙ্গলের মধ্যে এই মেটে দাওয়ায় বসে রাত কাটাও কী করে শুনি?

দেয়াশিনী বোধ করি কৌতুক গোপন করেই রাগরাগ গলায় বলেন, আমার সঙ্গে তোর তুলনা?

ভারতী এ তিরস্কারেও লজ্জিত হয় না। বরং সমান তেজে বলে, গুণের তুলনা করছি না, কিন্তু তোমার কি মনে হয় বাঘ ভালুক সাপ খোপেরা গুণের কদর বোঝে?

দেয়াশিনী মালাটা আর একবার কপালে ঠেকিয়ে বলেন, আমি তোকে আমার গুণের কথা বলেছি হারামজাদি? আমি কে? আমায় মা রক্ষা করেন।

দপ্‌ করে যেন এক চিলতে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে ভারতীর চোখে। তারপর সেই বিদ্যুৎটা যেন তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার মুখের চামড়ায়। ভারতী চড়া গলায় বলে, মা যদি তোমায় রক্ষা করতে পাহারা দিয়ে মরেন, আমাদেরই বা রক্ষা করবেন না কেন শুনি? আমরা কি ওনার সতীন ঝি?

ওর এই তাল ঠুকে ঝগড়া করার ছেলেমানুষীতে দেয়াশিনীর হাসি আসে। তবু তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টায় চাপা ভারী গলায় বলেন, তোরা কি, সেটা বরং মাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসা করবো? তোমার মতন, তোমার ওই পাথরের মায়ের সঙ্গে গাল-গল্প করার অভ্যাস আছে আমার?

দেয়াশিনী এবার বোধ করি জপে সমাপ্তি টানতেই মালাটা হাতে

জড়িয়ে রেখে বলেন, তবে আর ঝগড়া করে মরছিস কেন? বুঝেই দেখ্।

বুঝলাম।

ভারতী হাঁটু দুটোর উপর চিবুকটা রেখে বলে, বুঝলাম তোমার মা-টি হচ্ছেন পয়লা নম্বরের বেণে।

বেণে?

তবে না তো কি? যে লোক বসে বসে শুধু সাধন ভজন করবে, তাকেই উনি কৃপা করবেন। আর যাদের গলায় সংসারটি গেঁথে দিয়ে পাথরচাপা করে রেখে দিয়েছেন, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নেবেন না? সেখানে কৃপার ঘরে স্রেফ শূন্যি। একে বেণেমি ছাড়া আর কি বলবে? এ যেন সেই ফেলো কড়ি মাখো তেল, আমি কি তোমার পর?

দেয়াশিনী মালাটা ঘরের মধ্যে কোথায় তুলে রেখে এসে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে বলেন, এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার নরকেও ঠাঁই হবে না।

বলেন বটে, কিন্তু ভাষাটার সঙ্গে গলার সুরের খাপ খায় না।

ভারতী হেসে উঠে বলে, নরকে ঠাঁই পাবার জন্যে কে মরছে? আমার জন্যে বৈকুণ্ঠে সিংহাসন 'পাতা' আছে।

বাঁচলাম। আমার একটা ভাবনা ঘুচলো। বলে দেয়াশিনী দাওয়ার চালে তুলে রাখা একটা চুপড়ি পেড়ে এনে, তা থেকে কয়েকটি ভালো ভালো ফল নিয়ে বলেন, আঁচলটা বিছো।

ক্ষীণ শিখা সেই চৌকো লণ্ঠনটার আলোতেও বোঝা যায় কলা দুটি সুপুষ্ট, আমটা নীটোল, পেয়ারাটা চকচকে তাজা, আর শশা দুটি কচি ঠাণ্ডা।

ভারতী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আঁচল বিছোয় না, বরং বেজার গলায় বলে, আবার তুমি আমার জন্যে এইসব জমিয়ে তুলে রেখেছো?

দেয়াশিনী বলেন, তোর জন্যে তো নয়, আমার জামাইয়ের জন্যে। গাছের ভালো ফলটি মাকে দিয়ে যায় লোকে—

তা' তুমি তো রাঁধো বাড়োনা, ফল খেয়েই থাকো। হাতের সুখ করে বিলোলে পেটে কী দেবে শুনি?

সে চিন্তায় তোর কি দরকার শুনি?

ওরকম করে বললে ভালো হবে না বলছি। বলে ভারতী আঁচলটা ছড়িয়ে ধরে আরো বেজার গলায় বলে, বেশ বুঝছি রাজা ভরতের দশা ঘটবে তোমার। এই এক হরিণ ছানার মায়ায় পড়ে—

হুঁ। এবার গুরুগিরি ধর! অনেক জ্ঞান জন্মেছে তো। বলি ছোঁড়াটা আছে কেমন?

দিব্যি আছে। মনের সুখে আছে। মরণের নামটি নেই।

আবার? আবার ওই পাপ কথা? লক্ষ্মীছাড়ি হারামজাদি!

ভারতী ফল ক'টা আঁচলে বাগিয়ে নিতে নিতে বলে, তা' যে কথা মনে হচ্ছে, তাকে মুখে প্রকাশ করলেই দোষ? আমার দ্বারা ওই সব পেটে এক মুখে এক হবে না বাবা, বলে দিলাম এই সাদা বাংলা।

বলে তো দিলি, মুচকি হেসে কথাটা শেষ করেন দেয়াশিনী-মা, অথচ করছিস তাই। নে ওঠ, বিদেয় হ। রাত দুপুর অবধি জ্বালাস নে আর।

ভারতী ভারী মুখে বলে, তোমার মতন মহাস্বার্থপর যদি আর দুটো থাকে। ওই পাথুরে মায়ের সঙ্গদোষে পাথর হয়ে বসে আছো একেবারে। জানো দু'দণ্ডের জন্যে আগুনের আঁচ থেকে পালিয়ে আসি, তবু দূরদূর বেরো বেরো। কী জ্বালাতন করছি তোমায় আমি?

ভারতীর অভিমান স্ফুরিত অভিযোগটা বুঝি মিথ্যেও নয়, নচেৎ এ হেন অভিযোগেও তো এতোটুকু বিচলিত হন না দেয়াশিনী-মা। সমান তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, তোর এই বসে থাকাই আমার জ্বালাতন।

বেশ আর আসবো না।

দেখবো, কেমন না এসে পারিস, বলে হেসে উঠে বলেন, রাত বিরেতে আসিস কেন? তোর সেই 'দয়াময়ী' ননদটা তো মরেনি।

মরবে?

ভারতী দাওয়া থেকে নেমে বলে, ওরা দুই ভাই বোন দধিচির হাড় দিয়ে তৈরী। ওদের মৃত্যু নেই।

ওদের মৃত্যু হলে তোর বুঝি খুব সুবিধে?

তা' আর বলতে।

বলে ভারতী কয়েক পা এগিয়ে বলে, পীরের কালীকে এইখান থেকেই পেন্নাম করে গেলাম। ঘুরে আর সামনে যেতে পারছি না।

হুঁ! এতো পারিস্ আর ওইটুকুতেই পায়ে ঘুণ ধরে। তোর কপালে যে কী আছে!

যা আছে তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি— ভারতী যেতে যেতে বলে, ওরা আমার হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে, আর তুমি বসে বসে দেখবে।

তোর আসপদ্দা এবার আকাশে উঠেছে--বলে দেয়াশিনী দ্রুত হাতে ওর লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়ে মাটিতে নেমে এসে বলেন, আলোটা না নিয়েই গট গটিয়ে চললি যে?

ভারতী আলোটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলে, ভারী তো তোমার লণ্ঠনের আলো, ওতে কতটুকু অন্ধকার ঘুচবে?

বলি সাপ খোপটা তো দেখতে পাবি।

ভারতী আবার লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে বলে, আর আমি ভেবে ভেবে অবাক হই, এই গহন অরণ্যে একটা সাপও থাকে না গো! যে বেটা আমায় মুক্তির টিকিট কিনে দিতে পারে।

তুই বিদেয় হবি?

এই হলাম।

বলে, আলোটা দোলাতে দোলাতেই বলে ভারতী, আবার নিভে যাবার ভয় তুচ্ছ করে। হয়তো মনেই পড়ে না।

যতটা পর্যন্ত দেখা যায় তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দেয়াশিনী-মা, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, আশ্চর্য!

কোনটা আশ্চর্য তা বোঝা যায় না।

দেয়াশিনী-মার পূর্ব ইতিহাস কারো জানা নেই। থাকেও না।

পীরের কালীর সেবিকাদের দেয়াশিনী-মা বলা হয়। এবং তাঁদের উপরই মায়ের ভর হয়। শনি মঙ্গল হচ্ছে ভরের দিন। অমাবস্যায় মার বিশেষ 'আদেশ' আসে।

এই দেয়াশিনীরা যে কোথা থেকে আসেন, কে তাঁদের আনে, সে কথা না কি কারো জানা নেই, অথচ প্রয়োজনের সময় না কি ঠিক আবির্ভাব ঘটে। চিরকাল ধরে এই চলে আসছে। যখনি উপস্থিত সেবিকাটির বয়েস হয়ে যাচ্ছে, অথবা শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, 'অকস্মাৎ' কোথা থেকে যেন একজন এসে হাজির হন। নবীনা বৈরাগিনী, লালচে আভা গেরুয়া পরা, গলায় পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা। সন্দেহ নেই যে, বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের।

কিন্তু পাঠায় কে?

উত্তর জানা নেই।

কিন্তু কিম্বদন্তী কখনো নিরুত্তর প্রশ্নে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, উত্তর সে আবিষ্কার করে ছাড়ে।

সে উত্তর হচ্ছে, আর কে পাঠাবে?

পীরসাহেবের আত্মা ছাড়া?

প্রয়োজনের সময় এলেই ঊর্দ্ধলোক থেকেও তাঁর টনক নড়ে, তখনই সেবিকার সন্ধান করে তাকে পাঠিয়ে দেন?

উত্তর পেয়ে লোক হাঁফ ফেলে বাঁচে।

অবশ্য আপাততঃ যারা আছে, তারা বর্তমান দেয়াশিনী-মাকেই দেখছে, এবং তিনি এখনো বেশ শক্ত পোক্ত কর্মঠই আছেন, অতএব আশা করা যায় পীরসাহেব আরো কিছু দিন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারবেন।

তবে মুস্কিল একটা হয়েছে অন্য ব্যাপারে।

যে জঙ্গল বাগানটি একদা সেই পীরসাহেবকে আকৃষ্ট করে এখানে স্থিতু করে ফেলেছিল, এবং তদানীন্তন কালের গ্রামাধিপতিকে শিষ্য করে ফেলে ওই ভূখণ্ডটি কালীর নামে উৎসর্গ করিয়ে নিয়েছিল,

এতকাল পরে নাকি সেই গ্রামাধিপতির জমির মালিকানা সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উঠেছে।

শোনা যাচ্ছে দানপত্র যিনি করেছিলেন, আসলে তিনি জমিদারই ছিলেন না। ছিলেন জমিদারের নায়েব।

জমিদার নাকি ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। সুদূর রাজস্থানে না কোথায় গিয়ে কোন রাজপুত্রদের মাষ্টারী করে রাজার হালে বাস করতেন, নিজের গ্রামের জমিজমা দেখা শোনা করতো নায়েব আর গোমস্তা।

তাদের 'যুগল মিলনেই' এই অনধিকার চর্চ্চাটি ঘটেছিল। প্রভুর সম্পত্তি তারা উভয়ে যোগ সাজস করে গুরুকে দান করেছিলো।

এই ব্যাপার।

অন্ততঃ এই কাহিনীই শোনা যাচ্ছে এখন। এতদিন পরে নাকি প্রকৃত মালিকের বংশধর এসে দাবি জানাচ্ছেন, ও জমি তাঁরা নিয়ে নেবেন।

মা কালী আছেন থাকুন। কাঠা কয়েক জমি নিয়ে থাকুন। তাঁরা বরং দেবীর মন্দির বানিয়ে দিতেও রাজী আছেন, কিন্তু বাকী জমিটা ছেড়ে দিতে হবে। গঙ্গার দিকে একদিক, ওই জমিটা কোনো কারখানা বসাবার পক্ষে আদর্শ। সেই প্ল্যান নিয়েই এসেছেন তাঁরা।

এখন একদিকে মালিকের দাবি, অপর দিকে পীরের কালীর অগণিত ভক্তের সতেজ প্রতিবাদ। যদিও ব্যাপারটা এখনও বিশেষ দানা বাঁধেনি, তবে বাঁধলে আরো যে কী বাঁধতে পারে বলা কঠিন। খুনোখুনি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

দাবিদারটি এখন গ্রামের ওই নবজাগ্রত অংশটার কোথায় যেন অবস্থান করছে, এবং গ্রামের লোকের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে।

এখন আবার শোনা যাচ্ছে ওই সিনেমা হলের জমিটাও নাকি এদেরই, হলের মালিক ইজারা নিয়েছে, এবং—'শাড়ি সমুদ্রের' গা ঘেঁসে যে তিনতলা ম্যানসনটা তৈরী হয়েছে বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হতে, সেটাও নাকি এরাই করিয়েছে কণ্টাক্টার লাগিয়ে।

জমিদারী প্রথা লোপ হওয়ার সময় অনেক জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেলেও, এসব জমি ছিল।

কিন্তু ওরা কারা ?

কারা আর, গোস্বামীরা !

একদা যারা এ গ্রামের জমিদার ছিল। এখনো যে পোড়ো বাড়ির স্তূপটা গঙ্গার দিকে মুখ করে তীরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ো আছে, সেটাকে তো সবাই গোঁসাইদের ভিটেই বলে।

তবে আপাততঃ গোস্বামী বংশের যে বংশধরটি উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে এখানে আনাগোনা করছে, ওই ভাঙাভিটের প্রতি তার সহানুভূতির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, ওর লক্ষ্যস্থল ওই কালীর জঙ্গল। যেটা থেকে নাকি ভবিষ্যতের ছবি আঁকা চলে।

বোঝাই যাচ্ছে রাজস্থানের রাজার হালটা খতম হয়েছে। গোস্বামীদের গোঁসাইগিরি শেষ হয়েছে। রাজবংশের যারা একদার সম্মানের স্মৃতি বহন করে রাজকুমারের গৃহশিক্ষকের বংশধরদের পর্যন্ত 'ঠাকুরবাবু' সম্বোধনে সম্মানিত করতো, তারা নিজেরাই হয়তো কোথায় হারিয়ে গেছে।

অতএব গোস্বামী বংশধরেরা ভাগ্যান্বেষণে ঘোরাঘুরি করতে করতে আবার পুরনো কেন্দ্রে চোখ ফেলে চমকে উঠে দেখছে তাদের নিজের ঘরেই সোনার খনি। লেগে গেছে সোনা তুলতে। সিনেমা হলকে জমি লীজ দিয়ে, ভাড়া খাটাবার জন্যে ম্যানসন বানিয়ে, এখন তাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে ওই দেবী অধিকৃত জায়গাটায়।

ওই গঙ্গাতীরবর্তী জায়গাটায় নাকি একটা রবারের কারখানা খোলবার বাসনা তাদের, কারণ কর্তার ছোট ছেলে সম্প্রতি টাকাপয়সা খরচা করে বিদেশে গিয়ে ওই বিদ্যেয় পারদর্শী হয়ে এসেছে। সেই ছেলেই দেখতে এসেছে জমিটা, কণ্ট্রাক্টারকে নিয়ে এবং আইনের পরামর্শদাতাকে নিয়ে।

না, দেবীকে একেবারে উচ্ছেদ করবার মতো পাষণ্ড ওরা নয়। তবে কেবলমাত্র দেবীর নামেই অকারণ অপচয়কে বরখাস্ত করবে,

একটা বেআইনী ব্যাপারকে নীরবে মেনে নেবে, এতটা ভাবালুও নয়। মোটামুটি সাধারণই ওরা।

এইতো ছেলেটা তো বিদেশ ফেরৎ হয়েও মায়ের নির্দেশে মা কালীকে পূজো চড়িয়ে গেছে সকালে। আবার সন্ধ্যে আরতিও দেখবো দেখবো করেছে। কারণ মা নাকি বলে দিয়েছে, কালীর আসল পূজো রাত্তিরে। তা সকালে পূজো দেবার সময় প্যাণ্ট শার্ট পরেও আসেনি, এসেছিল ধুতি চাদর পরে, অতএব পাষণ্ড কিছুতেই বলা যায় না।

পাষণ্ড বরং এই গ্রামেই আছে। পীরের কালীর সন্নিকটেই আছে। ঠাকুরের নামে যে মুখ বাঁকায়, আর ঠাকুরের প্রসাদী ফল পা দিয়ে স্যুট করে।

লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে আবার দপদপ করে উঠেছিল, ভারতী তাই অপেক্ষাকৃত শান্ত ভঙ্গীতে হাঁটতে আরম্ভ করে জঙ্গলটা পার হয়ে গঙ্গাতীরবর্তী পথে পা দেয়।

বাড়িটা ওর এখান থেকে খুব কাছে নয়, গ্রামে এত রাত্রে এতটা পথ সহজে কেউ একা পাড়ি দিতে সাহস করে না। বিশেষ করে মেয়েরা। আর কালীর জঙ্গলে তো প্রশ্নেরই অতীত।

অথচ ভারতী এমন কাজ প্রায় রোজই করে, এবং রোজই বাড়ি ফিরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা খায়। অবশ্য ভারতীও ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়, তবু গলাটা ওর চড়ে না। যা বলে ঠাণ্ডা গলায়। আর তাতে ওর বর আর বরের দিদি আরো অগ্নিমূর্তি হয়।

আজও ভারতীর ওই বরের দিদি সুষমা অগ্নিমূর্তি হয়ে বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ভারতীর হাতের লণ্ঠনের শিখাটা দূর থেকে দেখা মাত্রই দরজা থেকে সরে এল। ওই লক্ষ্মীছাড়া বৌটার জন্যে যে সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন কথা যেন ও না ভাবে।

সরে এল বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো. বৌটা একা আসছে, না সঙ্গে কেউ আছে পৌঁছে দিতে। সুষমার বরাবরের ধারণা পীরের কালী, দেয়াশিনী-মা, এসব 'ছল'। নিশ্চয়ই

পাজীটার কোনো মনের মানুষ আছে, তার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অথচ ধরা ছোঁওয়ার উপায় নেই।

দেয়াশিনী-মার সাক্ষ্য তো আর অবহেলা করা যায় না। উনিই তো বলেন, রাত দুপুর অবধি আমার কাছে বসে থাকে, তাড়িয়ে দিলে যেতে চায় না, কোন্‌দিন যে সাপে কাটা পড়বে সেই আমার ভয়। ছুঁড়ির প্রাণে এক ফোঁটা ভয়-ডর নেই গো!

এর পর তো আর বৌকে ধরে জেরা করা যায় না। কোথায় গিয়েছিলি, কার কাছে ছিলি এতক্ষণ?

তথাপি সুষমা ভ্রাতৃবধূকে যা কটূক্তি করে, তেমনটি বোধ করি দ্বাপরে জটিলা দেবীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।

তাছাড়া সুষমার হাতে আরও একটা অস্ত্র, যেটা শানিয়ে শানিয়ে কোপটা বেশী দেওয়া যায়। সেই কোপটা হচ্ছে, লজ্জা করে না তোর অলক্ষ্মী মেয়েমানুষ, লজ্জা করে না যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আড্ডা দিতে? স্বামী যার অক্ষম অসহায় হয়ে বিছানায় পড়ে শুষছে, তার পরিবারের এত আহ্লাদ কিসে আসে?

আজও এমনি সব ভালো ভালো কথায় শান দিচ্ছিল সুষমা বসে বসে, আর আজ যেন রাতটা আরো বেশীই হচ্ছিল। অতএব আরোই জ্বলছিল সুষমা। বেশী দেরী করলে ভাইকে খেতে দেওয়ার ভারটা তাকেই নিতে হয়, কারণ সেই পঙ্গু অথচ পাজীর পা-ঝাড়া লোকটা খিদে পেলে আর রক্ষে রাখে না, চেঁচিয়ে মেচিয়ে বড় বোনকেও বাপান্ত করে ছাড়ে। কিন্তু ওই অনড়টাকে খেতে টেতে দেওয়া তো সোজা হাঙ্গামা নয়, সুষমা তাই ভারতীর দেরীতে এতো ক্ষ্যাপে।

অনেক নিরীক্ষণ করেও সুষমা ভারতীর আশেপাশে কোনো লোক টোক দেখতে পেল না, মেজাজে আশাভঙ্গের রাগটাও যোগ হল।

কিন্তু কী হল ওর?

আলোর শিখাটার এগিয়ে আসতে এত দেরী কেন? আসে তো দৌড়ে দৌড়ে লাফাতে লাফাতে, আজ যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসছে।

তা সুষমা নেহাৎ ভুল তুলনাও করেনি। ভারতী সত্যিই যেন

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসছিল। হঠাৎই যেন সে ঘুমের গভীরে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার মতই চিন্তার গভীরে নিমগ্ন হয়ে তলিয়ে গেছে তার মধ্যে।

আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে নাকি কালীর জঙ্গলটা মা পীরের কালীর সম্পত্তি নয়, ওর প্রকৃত মালিক এসে দাবি করছে, কেড়ে নেবে।

এমন ঘটনা কি সত্যিই ঘটা সম্ভব?

পীরের কালী রক্ষে রাখবেন তাহলে? আকাশের বাজ এসে মাথায় পড়বে না সেই দুঃসাহসিক ধৃষ্টটার?

কেমন সেই বেয়াদপ বেপরোয়া লোকটা, যে এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে? ভারতীর মুখোমুখি যদি পড়তো একবার তো, ভারতী আচ্ছা করে সমঝে দিত। শোনা যাচ্ছে নাকি বুড়ো কর্তা নয়, কর্তার ছেলে, খুব সাহস হবে ভারতীর, একবার দেখতে পেলে হয়। প্রথমে অবশ্য ভাল করেই জিজ্ঞেস করবে 'শুনতে পাচ্ছি তো গোঁসাইবাড়ির ছেলে, সেই দাবিতেই মায়ের পায়ের তলা পর্যন্ত লোভের হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু ভয় নেই আপনাদের প্রাণে? দেবীর কোপের ভয়? অভিশাপের ভয়? সর্বনাশের ভয়? এখানে এসে শোনেননি সে কাহিনী, একজন চুরি করে মায়ের বাগানের আম পেড়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে, তার ছেলে রেলে কাটা পড়েছিল। আর পুরনো কালে কবে নাকি একজন বলেছিল, পীর তো আর হিন্দু নয়? পীরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহও বিগ্রহই নয়।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তার জিভ এড়িয়ে বাক্-রোধ হয়ে গিয়েছিল।

তা এসব তো আর বানানো গল্প নয়? বানানো হলে আর হাজার হাজার লোক বিশ্বাস করতো না। এখন ভেবে দেখুন, মায়ের কোপে পড়তে সাহস আছে কি না।

আশ্চর্য! কালীর জঙ্গলের একটা আগাছায় পর্যন্ত কুড়ুলের কোপ বসানো নিষেধ, কারণ কোপ দিলে 'কোপে পড়া অনিবার্য' আর মূর্খেরা বলে কিনা স্রেফ্ জঙ্গল সাফ্ করে ফ্যাক্টরী বসাবে!

ভাবা যায় না! ধারণা করা যায় না।

যত ভাবছিল, হাঁটার গতি তত মন্থর হয়ে পড়ছিল ভারতীর।

আর সুষমা দেখে প্রথমটায় নিসপিস করলেও, ক্রমশঃ উল্লসিত হচ্ছিল। হয়েছে, জব্দ হয়েছে! নির্ঘাৎ অন্ধকার জঙ্গলে পা মচকেছে, কিম্বা কিছু কামড়েছে। না হলে সেই ছাগলছানার মত লাফিয়ে হাঁটুনি কচ্ছপের মত আস্ত হয়ে যায়?

উঃ মা পীরের কালী জন্মের শোধ ওর ঠ্যাঙ্‌টা খোঁড়া করে দেন তো—সুষমা মানতটা করতে গিয়ে থেমে পড়ে সুষমা, অপয়া হোক, লক্ষ্মীছাড়া হোক, আর বেহায়া, মুখরা, আস্পদ্দাবাজ যাই হোক, ওই মেয়েমানুষটা খোঁড়া হয়ে বসে থাকলে সংসারের অবস্থা যে খুব সুবিধেজনক হবে, এমন মনে হল না সুষমার। তাই মানতটাকে অর্দ্ধপথে স্থগিত রেখে ভারতীর জন্যে অন্য শাস্তি ভাবতে বসে সুষমা, আর ততক্ষণে অপরাধিনী এসে দাঁড়ায়।

সুষমা বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখে, পায়ের কোনো বৈলক্ষণ হয়েছে কিনা। কই? কোথায়? দিব্যিই তো হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে তাক থেকে একটা চুপড়ি পেড়ে আঁচল থেকে প্রসাদী ফল টল ঢেলে রাখছে।

সুষমা এগিয়ে আসে। নিজস্ব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ মিশ্রিত সুর এবং কটু কথায় ঝাল সংমিশ্রিত স্বরে বলে ওঠে, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই ধনীর বনবিহার শেষ হল?

ভারতী অবশ্য উত্তর দিল না। চুপড়ি থেকে কলা ছুটো তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বোঝা গেল, কদলী ছুটির এখনই সদ্ব্যবহার হবে।

ঘরের মধ্যে যে লোকটা শুয়ে শুয়ে রাগে ফুঁসছে আর শাপমন্যি করছে, খাওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহটা দ্রষ্টব্য। ছুটো বস্তুর আধখানাও যে অপর কারুর জন্যে রাখতে হবে না এ নিশ্চিত।

সুষমার অতএব গা জ্বলে যায় ছ' ছুটোই ওঘরে নিয়ে যাওয়া দেখে। অমন পুরুষ্টু কলা, একটা খেলে হয় না? না ছুটোই খেতে হবে? বিধবা মানুষ ঘরে রয়েছে একটা শশা কলা তার জন্যে রাখে না মানুষ? এত আক্কেলহীন? এত চোখের চামড়া খাওয়া?

সুষমা তার ভাই ভোলানাথেরই সহোদরা দিদি, দু'জনের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত।

অতএব—

অতএব সুষমা আরো তীব্র প্রশ্ন করে ওঠে, বলি কথার জবাব দেওয়া হল না যে? নবাব নন্দিনীর মতো মদগর্বে চলে যাওয়া হচ্ছে যে?

ভারতী ফিরে দাঁড়ায়, যেন অবাক গলায় বলে, ওমা, তুমি 'আমায়' কিছু বলেছো নাকি?

সুষমা ক্ষেপে উঠে বলে, তোকে বলবো না তো কাকে বলবো শুনি? কাকে বলবো রে লক্ষ্মীছাড়ি?

তা' কি জানি—ভারতী অম্লান গলায় বলে, বৃন্দাবন বৃন্দাবন করলে মনে হলো, আমি ভাবলাম তোমার শ্বশুরবাড়ির কেউ এসেছে বুঝি! সেই যে কে যেন সব আছে, গোকুল বৃন্দাবন।'

এই। এই একটি কথাতেই সুষমা ধেই ধেই করে ওঠে। কারণ ইহজীবনে সুষমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ কোনোদিন আসেনা, ভারতী জানেই না সুষমার শ্বশুরবাড়িটা কোথায়। তবু ভারতী মোক্ষম সময় ওই কথাটিই বলে বসে।

আমার শ্বশুরবাড়ি! আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছে? হারামজাদী, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ, আমার শ্বশুরবাড়ির লোক আসতে যাবে কী দুঃখে? তোর যমেরবাড়ি থেকে লোক এসেছে।

ভারতী আর একবার ফিরে তাকায়, হঠাৎ খুব আগ্রহ আর উল্লাসের গলায় বলে ওঠে, সত্যি? যমের তাহলে মনে পড়েছে আমায়! কোথায় গো দিদি, কোথায়? কোন ঘরে বসিয়েছ তাকে?

বলাবাহুল্য সুষমা আরো জ্বলে। বলে, ন্যাকরা হচ্ছে? ন্যাকরা? আমি তোর ইয়ার? সঙ্গে সঙ্গে আরো যে সব গালমন্দের শব্দগুলি উচ্চারণ করে, সেগুলি কেবলমাত্র সুষমার মুখেই মানায়।

আহা! ভারতী কোমল শান্ত গলায় বলে, মা বাপ মেয়ের কী নামই রেখেছিলেন! মেয়ের সর্বাঙ্গ দিয়ে নামের মানে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

কী ? কী বললি ? তুই আমার বাপ তুললি ? সুষমা দালান থেকে ভিতর ঘরের দরজায় গিয়ে রাক্ষসের মত চেঁচায়, শুনলি ? ভোলা শুনলি ? তোর বৌ আমার বাপ মা তুললো ? বলি আমার বাপ মা আর তোর বাপ মা কী আলাদা যে তুই সোনা হেন মুখ করে বসে বসে শুনছিস সে কথা ?

অবশ্য এ অভিযোগ সুষমার যুক্তিসঙ্গত নয়। বসে বসে শোনার ক্ষমতা ভোলানাথের নাই, যা কিছু শুনতে এবং দেখতে হয় তাকে শুয়ে শুয়েই। অপরাধিনী যতক্ষণ না ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ আর উপায় কি ? ঘরে এলে কিছু ছুঁড়ে মারা যায়। হাতের কাছে কিছু না থাকে বালিশটাও ছুঁড়তে ছাড়ে না তো ভোলানাথ।

সুষমাকে অনেক সময় অনুরোধ করেছে সে তুই চারটি ঢিল এনে আমার চৌকীর ধারে রেখে দিবি, ওকে শায়েস্তা করার ওই একটিই উপায়।

তা' সুষমা সে অনুরোধ রাখতে রাজী হয় না। বলে, আর কি। তুমি গোঁয়ার গোবিন্দ, একটা মারাত্মক কিছু করে বসো, তখন পুলিশ এসে, অনড় রুগী ঢিল কোথায় পেল, বলে আমায় হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাক।

কাজে কাজেই ঢিল নেই। বড় জোর জল খাওয়া গেলাসটা, ওষুধ খাওয়া খল নুড়িটা, কি তালপাতার পাখাটা। নচেৎ ওই বালিশ। আশেপাশে গোটাকতক বালিশ তো আছে তার।

ভোলানাথের মুখ সোনা হেন ছিল না, ভোলানাথ অনেক চেষ্টায় চৌকী থেকেই হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে একটা বাটি সংগ্রহ করেছিল, কাঁসার এই বাটিটা করে বিকেলবেলা মুড়ি খেয়েছিল সে, সেটা চৌকীর অদূরে জানালার ধাপে নামানো ছিল, সেটাই বাগিয়ে ধরে আছে ভোলা। ভোলার অবশ্য ভালো নাম একটা আছে, সেই নামটা হচ্ছে সুকুমার। সে নামে কেউ ডাকে না, অনেকে জানেও না। ভারতীই শুধু মাঝে মাঝে ওই নাম নিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসে, সু-কুমার ! সুকু-মার। আহা, কী খাপসই নাম রে।……কী দূরদর্শীই ছিলেন আমার শ্বশুরঠাকুর ! ছেলের বয়সে ছমাস যেতে না যেতেই বুঝেছিলেন

কী মালটি ঘরে এসেছে তাঁর! তাই তাড়াতাড়ি টিকে দিয়ে রেখে-ছিলেন। দিলে কী হবে, এ একেবারে পাতালফোঁড় শিব! চাপা দেয় কার সাধ্যি।

ভোলা শোনে আর পাগলের মত চেঁচায়, গাল দেয়।

এখন ভোলানাথ দাঁতে দাঁত পিষে ওই ভারী কাঁসার বাটিটা বাগিয়ে ধরে বসেছিল, দিদির অভিযোগে ভীষণ গলায় বলে উঠলো, তোমার চেঁচানি থামাবে? না থামাও তো একেবারে জোড়া খুন করে ফাঁসি যাব।

এই, এই এক পরম দোষ ভোলার।

বৌকে কোণঠাসা করে, দিদির সঙ্গে দল বাঁধতে পারে না, তুজনকেই সমান গাল দেয়। সময় বিশেষে দিদিকেও নিদেন হাতপাখাখানা ছুঁড়ে মারে। আজও ওর সুষমার উপর রাগ কম ছিল না, অনেকক্ষণ থেকেই আবেদন করছিল, ও মেয়েমানুষ আর আসবে না আজ রাতে, দিদি তুই আমায় খেতে দে।

সুষমা গা করেনি। খেতে দেওয়া মানে তো আর শুধু খেতে দেওয়া নয়, খাইয়ে দেওয়া আঁচিয়ে দেওয়া। গা ঘিনঘিন করে শুষমার বুড়ো ধাড়িকে আঁচিয়ে ফাঁচিয়ে দিতে। তাই সুষমা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। বেজার গলায় বলেছে, আমি তো দেব, তারপর তোর সোহাগী বৌ এসে বলবে, ওমা, সব তুধটুকু দাওনি? ওমা তাকের ওপর নাড়ু তোলা ছিল দাওনি? ওমা তরকারী বুঝি ঠাণ্ডাই দিয়েছো?

ভোলা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেছে, তা এ সব বলবার সুযোগই বা পাবে কেন? কোথায় কি আছে দেখেশুনে দিতে পারিস না?

এ সময় সুষমা ভাইকে ভয় করে। তাই বলেছে, পারবো না আবার কেন? তোদের সংসারে কী না পারছি। তবে ফলটা মিষ্টিটা কী নিয়ে টিয়ে আসবে, তখন খাওয়া হয়ে গেছে বলে আপসাবে।

এটা অবশ্য উড়িয়ে দেবার কথা নয়, ওই 'কী আসা'টার প্রত্যাশাতেই থাকে ভোলা, তবে সেটা স্বীকার পায় না; বলে, ওর কী তুটো শশাকলা, চিনির ঢেলা আসবে সেই খেয়ে আমি একেবারে বর্তে যাব।

এখন ভোলা জোড়া খুন করে ফাঁসি যাবার সংকল্প ঘোষণা করতেই সুষমা দরজা থেকে সরে এসে দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, মেজাজ একেবারে আগুন তুল্য হয়ে আছে। হবেই তো, রোগা মানুষ। সেই কোন বিকেলে দুটো মুড়ি খেয়েছে! ঘরে একটা মরণাপন্ন রুগী, আর ঘরের মানুষ নেচে বেড়ান।

ভারতীও দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলে, পাঁচ পাঁচটা বছর মরণাপন্ন হয়ে পড়ে থেকেও তো মরণের কোনো চিহ্ন দেখি না। ভয় নেই, আমাকে না খেয়ে ও রুগী মরছে না।

কী? কী বললি? সুষমা এবার সরাসরি যুদ্ধে নামে, স্বামীর নামে এই কথা বললি তুই? অনন্ত নরক তোলা আছে তোর জন্যে, এই বলে দিলাম ব্রাহ্মণ কন্যে। এই তো ভক্তি, এই তো চরিত্র, উনি আবার দুবেলা মায়ের মন্দিরে ছোটেন।

ছোটে, তাই তবু কলাটা মূলোটা বাতাসাটা সন্দেশটা রুগীর কপালে জোটে—

শান্ত গলায় বলে ভারতী, নচেৎ পুরুত ঠাকুর কিছু আর গামছা বেঁধে বয়ে বয়ে দিয়ে যেত না তোমার ভাইয়ের জন্যে।

ভারতীর হাতে সাজানো গোছানো থালা।

ভারতী এখন বাঘের গুহায় ঢুকতে যাচ্ছে। সুষমা তাকিয়ে দেখে।

আয়োজনটি নেহাৎ মন্দও নয়। ঘি মাখা একটি গোছা রুটি, এক বাটি কুমড়োর তরকারী, পাতে দুখানা বেগুন ভাজা। এছাড়া—দু দুটো মোটা মোটা কলা, এক বাটি দুধ, একটা সন্দেশ।

সুষমার আহার পাত্রের তুলনায় রাজকীয়। দু'খানা ডালডা ভাজা পরোটা আর ডেলা গুড়, এই তো সুষমার ব্যবস্থা। রাত্রে ডাল তরকারী সে খায় না বটে, কিন্তু দুধ, দুধ পেলে খেতে পারে না? চক্ষুলজ্জাহীন বৌটা এক পোয়া দুধের সবটুকু নিজের বরের পাতে ধরে দেয়। ছি ছি।

ওই ছিয়ের রাগে সুষমা বলে ওঠে, ওঃ তাই বলো। আদায়ের লোভে ভক্তি।

তবে না তো কী? বলে ভারতী বাঘের গুহায় ঢোকে।

আর পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার ধ্বনির সঙ্গে কাঁসার বাটি ঝনঝনিয়ে পড়ার ধ্বনি শোনা যায়।

সুষমা ভয়ে কানে হাত চাপা দেয়। সুষমার আতঙ্ক হয় এখনি একটা নারীকণ্ঠের মরণ আর্ত্তনাদ শুনতে পাবে। কিন্তু কই? ওই শব্দটার পরেই যে শব্দটা ঠিকরে উঠলো, সে কী আর্ত্তনাদ? এত হাসির শব্দ।

হি হি করে হেসে হেসে বলছে বৌটা, আহা! এতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট কোথায় তীর, কোথায় শিকার। ছেলেবেলায় কী কখনো পাখীর গায়ে গুল্‌তিও ছোঁড়নি। প্রকৃতি দেখে তো তা মনে হয় না।

অসহ্য! অসহ্য এই কথার ফুলঝুরি।

এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত হাসিই বা আসে কোথা থেকে রাক্ষুসীর! এত কথাই বা জোগায় কোথা থেকে!

আর ভোলাটাও কী তেমনি অপদার্থ? পায়েই না হয় বল নেই, জিভ কোথায় গেল? জিভ? আর কথা নেই কেন?

চ্যাচায় তো রাক্ষসের মত চ্যাচায়, কিন্তু বৌয়ের ওই হাসি টিট্‌কিরি শুনলেই কেমন যেন গুম মেরে যায়। আর কথা বলে না। ভগবান জানেন কেন। যেন ওই হাসিটা ওকে নস্যাৎ করে দেয়।

সুষমা ঠিক জানে, এখন মুখপোড়াটা নিঃশব্দে গব গব করে গিলে যাবে। হয়তো এমনও হতে পারে, চণ্ডিনী একটু পরেই আহ্লাদে গলায় হাঁক পাড়বেন, দিদি, দিদি গো, একটু কষ্ট করতে হবে। তু'খানা রুটি দিয়ে যেতে হবে। তাকের ওপর কৌটোয় আছে।

সুষমা দাঁতে দাঁত দিয়ে মনে মনে বলে, জানি জানি! চিরকালের জানা কথা, আমে তুধে মিশে যায়, আঁটি আঁস্তাকুড়ে যায়।

মা পীরের কালী ওর অহঙ্কার চূর্ণ করার কোনো চেষ্টাই করেন না! আশ্চর্য!

তা' সুষমার রাগটা হয়তো অন্যায়ও নয়। পাড়ার আর কোন বৌটা শাশুড়ী ননদকে এমন নস্যাৎ করে?

হ্যাঁ ঝগড়া কোঁদল অনেকেই করে, চ্যাঁচায়, বাদ প্রতিবাদ করে, ছেলে ঠেঙায়, রান্না না করে গোঁজ হয়ে বসে থাকে, অন্নজল বন্ধ করে পড়েও থাকে কত সময়। কিন্তু এরকমটা কেউ নয়। এরকম যা বলো তা গায়ে না মেখে, অম্লান বদনে জুতে থেকে চণ্ডী সব কিছুর দায় মাথায় নিয়ে, নিখুঁৎ করে সংসার করে, আর আপ্রাণ যত্নে বরকে দিদিকে সেবা করেও এমন নস্যাৎ করে না কেউ।

নইলে রাতে সুষমা শাসিয়েছে, ভারতী যদি দিন নেই রাত নেই, এ রকম বেরিয়ে যায়, সুষমাও চলে যাবে এ সংসার থেকে। দেখি কার ভরসায় ওই রোগা অনড় স্বামীকে রেখে যায় সে। আরো কত কি যেন বলেছে।

চুপ করে শুনেছে ভারতী, উত্তরটি দেয়নি। আর এখন কিনা রাত পোহাতে না পোহাতেই বাড়ি থেকে হাওয়া!

দিব্যি বড় গলায় বলে গেল, দিদি গঙ্গায় যাচ্ছি, ফিরতে দেরী হলে ভেবো না ডুবে মরেছি। ডুবে মরবার ইচ্ছে টিচ্ছে নেই বাবা। ফুলে ফেঁপে কুচ্ছিত হতে রাজী নই।

সুষমা না বলে পারেনি, কেন? দেরী কিসের জন্যে?

হাতের ছোট্ট মতন খালি ঘড়াটা দোলাতে দোলাতে ভারতী বলে, এই মরেছে! তাও জানো না? আজ সকালে যে জঙ্গলের জমি জরীপ করতে আসবে।

জরীপ করতে আসবে! এলেই অমনি হলো? সুষমা বিশ্বাস করে না ওকথা।

নিশ্চিত জানে কিছু একটা ঘটে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে সুষমা সে কথা বলে না। তেড়ে উঠে বলে, তা' আসবে, তো আসবে, তুই যাবি কী করতে? তুই বৌ মানুষ যাবি কি করতে?

ওইতো! জবাবটা তো দিয়েই দিলে নিজে।

ভারতী হি হি করতে করতে বেরিয়ে গেছে, বৌয়ের পিছনে একটা 'মানুষ' জুড়লে! মানুষ বলেই যাবে।

ভারতীর এই কথাটারই কি জবাব ছিল না সুষমার কাছে? ছিল

অবশ্যই, কিন্তু কাকে দেবে জবাব? ততক্ষণে তো সে মানুষ প্রায় উড়ে চলে গেছে।

হ্যাঁ, হাঁটাটাই দ্রুত ভারতীর। ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, চটপট এগিয়ে যায়। কিন্তু গঙ্গার তীরের পথটা পার হয়েই থমকে দাঁড়ালো ভারতী, বেশ কয়েকটা লোক ওই জঙ্গলটার সামনের দিকের পাতলা অংশটায় দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে। একজনের হাতে জরীপের ফিতেই মনে হলো। ইতস্তত করছে। তার মানে ভয় পাচ্ছে।

কীসের ভয়? দেবীর রোষের? না সাপ খোপের?

ওরা যে এখুনি এসে পড়েছে, এমন সন্দেহ করেনি ভারতী। আর এদিকটা দিয়েই সে ঢুকবে তাও জানা ছিল না। এদিকেই তো জঙ্গল গভীর, ওদিকে বরং রাস্তা আছে।

ভারতী এ গ্রামের বৌ, কিন্তু ভারতী সে পরিচয়ের ধার ধারলো না, দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর গলায় বললো, কী হচ্ছে এখানে?

নিয়োজিত ব্যক্তিরা উত্তর দিল না, শুধু ফিতেধারীটি ছড়ানো ফিতেটা একটু গোটালো। গ্রামের একটা বৌ, সাজসজ্জায় দৈন্যদশা, তার কথায় আবার কে উত্তর দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য, স্বয়ং মালিককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সেই 'রবার অভিজ্ঞ' গোস্বামী নন্দন। তা চেহারাটা ব্রাহ্মণ জনোচিত বটে। দীর্ঘ দেহ, ফর্সা রং, কাটের মুখ। পরণে ট্রাউজার আর বুশ শার্ট। ধুতি পাঞ্জাবী নয়।

ভারতী চোখ তুলে প্রায় নিষ্পলকে দেখলো।

এগিয়ে এসে ছেলেটা বললো, একটু কাজ হচ্ছে।

কাজ, না কুকাজ? তীব্র স্বরে বলে ওঠে ভারতী।

ও প্রায় চমকে উঠলো। ওর সঙ্গের লোকেরাও। ভাবলো কোনো মাথা খারাপ মেয়েছেলে।

তা আর কেউ কিছু বললো না, ওই ছেলেটাই মৃদু হেসে বললো, একই ব্যাপার হয়তো কারো কাছে মহৎ কাজ, আর কারো কাছে কুকাজ।

মহৎ কাজ? ওঃ! কী মহাপুরুষেরা এসেছেন দেশকে উদ্ধার

করতে। দেশে সিনেমা ঢুকিয়ে, আর একটা চালার নীচে একশো ঘর ভাড়াটে বসিয়ে দেশের তো পরকাল ঝরঝরে করে দিয়েছেন।

করতে এসেছে নিজের কাজ। এই মেয়েটাকে গ্রাহ্য করবার কোনো দরকারই ছিল না। তাছাড়া পদমর্যাদায় যোগ্যই নয়। তবু কেন যে গ্রাহ্য করলো কে জানে। বললো, দেশে কেবলমাত্র পচা ডোবা, পানাপুকুর আর কাঁচা রাস্তা, এই থাকলেই বোধ হয় দেশের পরকাল জমজমাটি থাকে? তাই না?

যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা ভাবলো, মিষ্টার গোস্বামীর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই ওই একটা আধপাগলা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বসলেন।

আধপাগলা ছাড়া আবার কি। কোনো সহজ সুস্থ ভদ্রঘরের মেয়ে এভাবে আসে, না লোকের সঙ্গে টিটকিরি দিয়ে কথা বলে?

কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ওরা নিজেরা নীচু গলায় বলাবলি করে, এ জমি সহজে দখল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। জোরালো কোনো বিবাদী পক্ষ নেই বটে, কিন্তু গ্রাম সুদ্ধু লোকই বিবাদী হবে।

এরা যা বলাবলি করছে, ওদিকে তারই প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। গ্রামের একজনই আপাততঃ মুখপাত্র। তাই বোধ করি তার গলায় জোর প্রবল।

তা যে দোষগুলো দিলেন, সেইগুলোই বরং সারান না দেশের? ভিখিরির ছেঁড়া নেকড়ার ওপর জরির ফুল কেটে কী হবে? পানাপুকুর পচা ডোবা, কাঁচা রাস্তা সবই রইল, সিনেমা বসলো, জমকালো শাড়ী জামার দোকান বসলো। তার মানে গরীবের মনে বিলাসিতার লোভ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তা' আপনি বুঝি গোঁসাইবাড়ীর ছেলে?

উত্তর না দিয়ে চলে গেলেই ওই ধৃষ্ট মেয়েটার ঔদ্ধত্যের উচিত জবাব দেওয়া হতো, তবু ও চলে গেল না। কথাই কইল। অবশ্য ব্যঙ্গ বাক্যই।

হ্যাঁ, ওই বাড়িরই ছেলে আমি। বিনয় গোস্বামীর ছেলে বিরাম গোস্বামী। আপনার বুঝি রাজনীতি-টিতি করা অভ্যাস আছে?

ভারতীর ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে। তীক্ষ্ণ গলায় বলে, তার মানে?

মানে যে রকম জোরালো মতবাদ দেখছি—যার নাম নাকি বিরাম, সে কথায় কিঞ্চিৎ বিরতি টেনে মৃদু হেসে বলে, মনে হচ্ছে রাজনীতির বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস আছে।

ভারতী ওর দিকে কেমন একরকম অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায়। ভারতী যেন হঠাৎ কোন একটা ছাপসা জগতের মধ্যে স্খলিত হয়ে পড়ে। ভারতীর উত্তর দিতে দেরী হয়।

তবে ভারতী তো আর নিরুত্তর হয়ে যাবার মেয়ে নয়। সে কথা যারা ভারতীকে জানে তারা সবাই জানে।

ভারতী তারপর গম্ভীর গলায় বলে, ওসব বড় বড় কথা বড়-লোকের জন্যে। আমরা গরীব লোক ওসবের কী বুঝবো? তবে এইটা জানি রোগ সারাতে হলে ভিতর থেকে সারাতে হয়, বাইরে থেকে চাকচিক্য দেখিয়ে নয়। কিন্তু—হঠাৎ ভারতী হেসে ওঠে। যে হাসি শুনলে তার বরের দিদির পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যায়, আর বরের তম্বি গম্বি গুটিয়ে যায়। পাড়াগাঁয়ের একটা বৌ, এই বেপরোয়া হাসিটা কোথায় পেলো কে জানে। বোঝা শক্ত।

তবে ভারতী তার সেই হাসিটা হেসে বলে ওঠে, কিন্তু আপনাকেই বা এসব কথা বলতে বসছি কেন? সত্যিই তো আর আপনারা গ্রামোদ্ধার করতে এতদিন পরে আসেননি। এসেছেন সাত পুরুষের ফেলে যাওয়া গ্রাম থেকে এখন কিছু কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখতে। কী বলুন ঠিক বলিনি?

বিরাম যেন হঠাৎ একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে যায়। বিরাম যে এই পীরের ভূতে পাওয়া গ্রামের মধ্যে কালীর জঙ্গলের ধারে এমন ধরণের কথা শোনবার আশঙ্কা করেনি, সেটা নিশ্চিত।

তাই বিরাম কেমন ঝাপসা ঝাপসা চোখে তাকায়। রং ফরসা নয়, কিন্তু নাক মুখ চিবুক চোয়াল সুগঠিত। সমস্ত গঠনে কেমন একটা ধারালো ভাব, এই মুখটা কি কোথাও দেখেছে বিরাম?

হাসির শব্দে যে অদূরবর্তীরা তাকিয়েছে, এবং তাকিয়েই আছে, সে খেয়াল করে না বিরাম, শুধু একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, ঠিক

বলেননি একথা বলবার মত মনের জোর অবশ্য খুঁজে পাচ্ছি না, তবে এর উত্তরও চট করে হয় না···আপনি কে? এখানকার সেবাইতদের কেউ বুঝি?

না না! ভারতী আর একটু ঠাণ্ডা হাসি হাসে, তা হলে তো সুখের সাগরে ভাসতাম। অনেক বছর ধরে হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভক্তির অর্ঘ কুড়িয়ে কুড়িয়ে মা কালীর বিষয় সম্পত্তিটি তো নেহাৎ কম হয়নি? তিন শরীক সেবাইতের ঘরেই তো তার উপসত্ব ওঠে। ওঁরা কে জানেন তো?

বিরাম মাথা নাড়ে।

জানেন না? হায় হায়। ওঁদের সঙ্গেই তো মামলা চালাতে হবে আপনাদের। ওঁরা হচ্ছেন আপনাদের সেই অতীত কালের নায়েবের বংশধর। যে নায়েবটি মনিবের সম্পত্তি দেবতাকে দান করে ফেলে পুণ্য অর্জন করেছিলেন। নিজেদের ভাগে ওইটুকু রেখেছিলেন।

বিরামের চোখটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে যেন। বিরাম আগ্রহের সঙ্গে বলে, আপনি তা'লে এ কথাটা বিশ্বাস করেন?

কোন কথা?

ওই যে তিনি নিবারণ ভট্টাচার্য না কে, বেআইনি কাজ করেছিলেন।

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে? বিয়ে হয়ে পর্যন্তই শুনে আসছি কথাটা। ইদানীং আরো শুনছি। তাই বললাম।

কথার স্রোত অন্য খাতে গড়িয়ে যায়।

বিরাম গোস্বামী নামের কেষ্ট বিষ্টু ছেলেটা আরে আগ্রহের গলায় বলে, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত? আপনি বুঝি এখানের বৌ?

হ্যাঁ ভারতী হেসে বলে, তবে ঘোমটা দিই না।

কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনার?

এই সেরেছে। আপনি স্রেফ্ পাড়ার গিন্নীদের মত প্রশ্ন করে বসলেন। হয়েছে একদিন। কে মনে রাখছে কতদিন। বিবাহ বার্ষিকীর ঘটা তো হচ্ছে না বছর বছর, তাই সাল তারিখ মনে থাকবে!

গাছের ফাঁক দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়ে ভারতীর ফিকে হলুদ রঙা শাড়ীটায়। যেন ছায়ার ছাপ বসিয়ে দিয়েছিল, ভারতীর মুখে গালেও মাঝে মাঝে সেই ছাপের কারুকার্য চলছিল নড়াচড়ার সঙ্গে।

কথা বলার সময় ভারতীর মুখটা বোধ হয় খুব উজ্জ্বল দেখায়। না হলে উজ্জ্বল দেখাবার মত কথাবার্তাই যে চলছিল তাও নয়।

ওদিকের ওরা প্রত্যেক আলাদা ভাবে মনে মনে যাই ভাবুক, মুখে বলাবলি করে, ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না। সেবাইতদেরই কেউ হবে বোধ হয়। খুব বাচাল ধরণের মেয়েছেলে! উনি তো নেহাৎ ইয়ে, কখনো আসেনওনি এখানে, কতদিন তো বাইরেই কাটিয়ে এলেন, ওঁকে ভুলভাল বুঝিয়ে কিছু সুযোগ নেবার চেষ্টা চলছে বোধ হয়—আমাদের কি, মাপতে এসেছি, মেপে চলে যাব। মাপতে না দেয়, এমনিই চলে যাব।—তবে ভেতরটায় ঢোকা শক্ত হবে। দিনের বেলাই তো অন্ধকার। ভারতীকে যদি বাচাল মেয়েছেলে ভেবে থাকে ওরা, খুব অন্যায় ভেবেছে কি?

কোন মেয়েমানুষ একটা সম্পূর্ণ বাইরের লোকের সঙ্গে এমন অদ্ভুত কথা বলতে পারে?

কিন্তু বিরাম অদ্ভুত ভাবছে না। বিরাম শুধু মুখটা দেখছে। হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা, আমি কি আপনাকে কোথাও দেখেছি?

ওমা! একি প্রশ্ন?

ভারতী এবার ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠে, আপনি দেখেছেন কি না আপনি জানবেন না আমি জানবো?

বিরাম প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এখন একটা হাত বার করে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অপ্রতিভ হাসির গলায় বলে, প্রশ্নটা একটু উল্টো হয়ে গেল না? আচ্ছা আপনিই বলুন আমায় কোনোখানে দেখেছেন কি না।

কস্মিনকালেও না।

অথচ, আশ্চর্য! বিরাম বলে, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে পর্যন্তই মনে হচ্ছে আগে যেন কোথায় দেখেছি।

পূর্বজন্মে হতে পারে—অম্লান বদনে উত্তর দেয় ভারতী।

তারপর বলে, আচ্ছা আপনি আপনার কাজ করুন। ওঁরা বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠছেন।

হাতের ছোট ঘড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে কথা বলছিল ভারতী, সেটা আবার উঠিয়ে নিয়ে হেসে বলে, আচ্ছা গেলাম! জরীপ টরীপ করুন। তবে এ কাজটা যদিও বা সহজে করে ফেলতে পারেন, দখলটা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মামলা তো হচ্ছে।

সে তো মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। কিন্তু পীরের কালীর ভক্ত সমাজ? তারা আপনাকে ছেড়ে কথা কইবে? কেটে কুচিয়ে এই জঙ্গলে পুঁতে ফেলতেও পারে।

বিরাম উত্তেজিত গলায় বলে, ভয় দেখাচ্ছেন?

ভয়? না, সাবধান করে দিচ্ছি।

বলে তরতর করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায় ভারতী এবং দু একটা বাঁকের পরই অদৃশ্য হয়ে যায়।

অথচ ওর নিজের বাড়ির সদর দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা বেশী হাঁটলেই সহজ আর নিরাপদ পথে দেয়াশিনী-মার কাছে পৌঁছনো যায়। যেটা পীরের কালীর সমুখ দিকের পথ।

ভগবান জানেন, সামান্য হাঁটা বাঁচাতে কেন ভারতী এই বিপদের পথটাই বেছে নিয়েছে। না কি ওই বিপদটাতেই ওর আকর্ষণ!

ওই গা ছমছমানিতেই ওর আনন্দ!

আমি নিশ্চয় ওকে কোথাও দেখেছি। ভাবলো বিরাম, নইলে এত দেখাদেখা লাগলো কেন? তারপর এদিকে সরে এসে বললো, 'দেখুন এই জঙ্গলটা সম্পর্কে আপনারা যত ভয় পাচ্ছিলেন, ততটা ভয় পাবার বোধ হয় কারণ নেই। ওই ভদ্রমহিলা তো স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেলেন।

এরা কণ্ট্রাক্টারের লোক, স্বয়ং কণ্ট্রাক্টার এখনও আসেননি, তাই এদের কণ্ঠ উচ্চ। ফিতে হাতে লোকটি বলে ওঠে, স্থানীয় লোকের কথা আলাদা। সাপ ব্যাঙেরাও ওঁদের পোষা। একটা হাসির রোল ওঠে।

কাজের চেষ্টা চলে।

কিন্তু বিরাম নামক সমস্ত কুসংস্কারকে নস্যাৎ করে দেওয়া ছেলেটার হঠাৎ উৎসাহটা স্তিমিত হয়ে যায় কেন? ওই বিচিত্র ধরণের কথা বলা মেয়েটার শেষ কথাটায়? বিরাম তাহলে ভয় পাচ্ছে পীরের কালীর ভক্তরা ওকে কেটে পুঁতে ফেলতে পারে ভেবে? না কি বিরাম কেবল স্মৃতির সমুদ্রের ঢেউ খাচ্ছে বলে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে?

একে আমি নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি? কতদিন আগে দেখেছি? বিয়ের আগে কোথায় ছিল ও?

প্রশ্নটা বারবার মুখে এসেছে, তবু সামলাতে হয়েছে। হয়তো এ প্রশ্ন শুনলে ওই কেমন একটা অপ্রতিভ করে দেওয়া হাসি হেসে বলে উঠতো, 'এমা, এ যে আপনি পাড়ার গিন্নীদের থেকেও এগিয়ে গেলেন।

কাদের বাড়ির বৌ কে জানে।

আচ্ছা—বনের মধ্যে গেল কেন? দেবী দর্শন তো রাস্তার সামনে দিয়েই ভাল। পথ চলতিরা তো যেতে আসতে ওইখান থেকেই দেবী দর্শন করে, কিন্তু এ মেয়ে জঙ্গলের পিছন দিয়ে কেন? আব্রু?

হাসির কথা। প্রথম নম্বরইতো বলেছে বৌ বটে, তবে ঘোমটা দিই না। তার মানে ইচ্ছে করে জঙ্গলে ঢোকে। তার মানে মাথাটা ঠিক সুস্থ নয়। কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক নয়? কিন্তু মুখটা কেন দেখা দেখা মনে হচ্ছে?

আর ভারতী? ভারতীও অন্যমনস্কের মতই এগোচ্ছিল।

না দেখিনি আমি ওকে সাতজন্মেও। ঠিকই বলেছি, কস্মিনকালেও না। কিন্তু নামটা কেন শোনা শোনা লাগছে? নামটা খুব সচরাচরেরও নয় যে আর কারও শুনেছি। কিন্তু ওর নাম আমি কোথা থেকে শুনবো? গ্রামের গেজেট স্বয়ং সুষমাদেবীই তো জানেন না।

গোঁসাইবাড়ির ছেলে এসেছে, কালীর জঙ্গলের দখল নিতে চায়, ওরাই নাকি সিনেমা হলটার জমির মালিক, ওরা অনেক দোকানেরও জমির মালিক, এই সব শুনেছে ভারতী, কিন্তু নাম? নাঃ!

অথচ যেন মনে হচ্ছে শুনেছে। শুনে অনেকদিন ধরে যেন

মনের মধ্যে লালন করেছে নামটি। বিরাম। বিরামই। কিন্তু গোস্বামী কি? সে কথা জানা নেই ভারতীর।

হঠাৎ একা একাই হেসে ওঠে ভারতী।

একই নামের অসংখ্য লোক আছে পৃথিবীতে। অথবা পৃথিবীতে যতো লোক ততো নাম এখনো আবিষ্কার হয়নি বলেই, অনেক জনে একই নাম রাখে ছেলেমেয়ের।

ভারতী! এই ভারতবর্ষে কত ভারতী ছিল, কত ভারতী আছে।

কিন্তু ও কেন থামোকা প্রশ্ন করে বসলো, 'আমি কি আপনাকে কোথাও দেখেছি?

প্রশ্নটা উল্টোদিক থেকে হলেও, মানেটা বুঝতে দেরী হয়নি। ভারতীকে ও কোথাও দেখেছে। অন্ততঃ এই সন্দেহটা হয়েছে ওর। কিন্তু দেখার প্রশ্ন তো ওঠে না। না না, 'বিরাম' নামের কেউ কোনোদিন দেখেনি ভারতীকে। দেখবার প্রয়োজনই বোধ করেনি। ভারতী শুধু বিরাম নামটা শুনেছিল। তবে সেই শোনাটা মোটেই ভারতীর মনের কোনোখানে সোনার অক্ষরে লেখা নেই।

মা কালীর বরাদ্দ পেন্নামটা ঠুকে ভারতী যখন দেয়াশিনী-মার দাওয়ায় এসে বসলো, তখন উনি একরাশ জবা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছেন। ওঁকেও একটা পেন্নাম ঠুকে হাতের ঘড়াটাকেও ঠুকে বসিয়ে ভারতী বিনা ভূমিকায় বললো, দেখে এলাম।

দেখে এলি? কী দেখে এলি?

ওই যে বাগান জরীপ হচ্ছে।

জানি।

জানো? তাহলে কালীর জঙ্গল সাফ করে রবার কারখানা বসছে?

সেটা মা জানেন। বলে ফুলের গোড়াগুলি ছিঁড়তে থাকেন দেয়াশিনী।

মা জানেন?

ভারতী চড়া গলায় বলে, তোমার মায়ের কথা আর বোলো না। হয়তো জঙ্গল কেটে সাফ করে দেয়াল গাঁথবে, উনি ত্রিনয়ন মেলে দিব্যি বসে বসে দেখবেন। ভস্মও করবেন না, কিচ্ছু না।

তা সেটাই যদি মায়ের ইচ্ছে হয় তো হবে। দেয়াশিনী-মার কণ্ঠস্বর স্থির, দৃঢ়।

কিন্তু ভারতী না-ছোড় মেয়ে; তাই বলে ওঠে, এটি বাপু তোমাদের লোক ঠকানো কথা। আগে থেকে কিছুটি বলবে না, 'সবই মায়ের ইচ্ছে' বলে রেখে দেবে, তারপর যাই কেন না ঘটুক, বলবে 'এইটিই মায়ের ইচ্ছে ছিল।' বলে একথা ভারতী। অবলীলাতেই বলে।

দেয়াশিনী-মার ওই শক্ত মুখ, দৃঢ় চোয়াল, তীক্ষ্ণ চোখ, আর বলিষ্ঠ গঠনের মধ্যে কোথায় আছে এমন একটু দুর্বলতা যে এমন অসমসাহসিক কথা বলে পার পেয়ে যায় ভারতী?

আর কেউ কি ভাবতে পারতো ওঁর মুখের উপর এমন কথা বলতে? অথচ এ কথা শুনে দেয়াশিনী-মা ত্রিশূল নিয়ে তাড়াও করলেন না, অভিশাপ বাণীও বর্ষণ করলেন না। বরং যেন কিঞ্চিৎ কৌতুকের গলাতেই বলেন, আমাদের সব ফন্দী ফিকিরই তো তুই ধ'রে ফেলেছিস দেখছি।

ফেলেছিই তো। তোমাদের খালি মায়ের নামে দোহাই পেড়ে লোকের মুখ বন্ধ করে রাখা। মার ইচ্ছে— মা যা বলবেন—কী করে সেই বলাটি বলেন শুনি?

শুনলে তুই বুঝতে পারবি? বলে মৃদু হাসেন দেয়াশিনী।

বাংলা কথা হলেই বুঝতে পারি—বলে ভারতী হঠাৎ নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরেবলে, আচ্ছা ঝগড়া থাক। এখন তুমি আমার হাতটা একটু দেখো দিকি? এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

দেয়াশিনী নির্লিপ্ত গলায় বলেন, এবেলা ওবেলা তোর হাতের রেখা বদলাচ্ছে না কি?

অসম্ভব কি? ভারতী বলে। তোমাদের ওই সব গ্রহ নক্ষত্ররা তো রাতদিনই জায়গা বদল করে, তাহলে হাতের রেখাও বদলাবে। দেখই না বাছা।

দেয়াশিনী তবু ওর হাতটা তুলে নেন না। বরং যেন কড়া গলাতেই বলেন, কী চাস তুই শুনি।

কী আবার? ভারতী বলে, যা সবাই শুনতে চায়। ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কি? 'ভূত' তো জানাই হয়ে গেছে, বর্তমানও হাড়ে হাড়ে জানছি, বাকি তো ওই ভবিষ্যৎটুকু?

তা সেটুকুও জেনে ফেলে কী হবে, থাক না অন্ধকারে

ও, তার মানে ভবিষ্যতের ছবিতেও একটু আলো দেখতে দিতে রাজী নও তুমি? সেটাও স্রেফ অন্ধকার হয়ে যাক তাহলে?

বলেছি তো আমি অত দেখতে টেখতে জানি না। ভরের সময় মা কী বলেন? সেটাই আসল। যাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় কথাগুলো, তাঁর তখন নিজস্ব কোনো সত্ত্বা থাকে না। তাই পরে আর কিছু মনে থাকে না। তাই নিজের বলা কথা সম্পর্কেই প্রশ্ন করেন তিনি, মা কী বলেন?

বলেন আর কী? যতবারই প্রশ্ন করেছি, শুনেছি অধৈর্য হস্‌নি। অধৈর্য হসনি। সময়ে সব হবে।

তা বেশ তো! তাহলে অধৈর্য হচ্ছিস কেন?

দেখো এ কথা বললে কিন্তু ফাটাফাটি কাণ্ড করবো। বলি তোমার এখানটিতে যদি কাঠপিঁপড়ে ছেড়ে নিই, তুমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারো?

দরকার হলে সবই পারতে হয়।

মহামানবীদের কথাই আলাদা। আমরা তো তা নই। আমার এখন ওই ভবিষ্যতের আশাটুকুই ভরসা। সেটা স্পষ্ট জানা হয়ে গেলে হয় এস্পার নয় ওস্পার করে ফেলি।

বটে নাকি? সেই এস্পার ওস্পারটা কী শুনি?

কী আবার। হয় একটা খুন করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলি, নয় নিজেই দড়ি জোগাড় করে ঘরের আড়ায় ঝুলি।

তোর সমস্ত মিথ্যে কথা—দেয়াশিনী-মা বলে ওঠেন। ও ভালো হবে কি না সেই কথা জানতেই তোর—

আহা-হা মরে যাই। ও ভাল হবে কিনা এই জানবার জন্যে আমি ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসি?

তবে না তো কী!

তা হলে তো সবই বুঝেছো। ওসব বাজে কল্পনা ছাড়ো দিকি, তুমি হাতটা দেখো।

দেয়াশিনী-মা ওর এই রোজ রোজ হাত দেখার আবদারটাও মেনে নেন দেখা গেল, টেনেই নিলেন হাতটা।

হাত দেখার ফলাফল কী হতো কে জানে। সেই মোক্ষম সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। অথবা অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব।

অদূরে একটি দীর্ঘ ছায়া পড়লো।

তারপর শোনা গেল 'নমস্কার'।

ভারতী হাতটা টেনে নিয়ে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলো, কী হলো? কাজ হয়ে গেল? না সাহস হল না?

দেয়াশিনী-মা ভুরু কুঁচকে মুখটা কঠিন করলেন।

দীর্ঘদেহী এগিয়ে এসে সহাস্যে বললো, সাহস না হওয়ার প্রশ্ন কিছু নেই, কাজ চলছে।

দেয়াশিনী-মাকে প্রণাম না করে শুধু হাত তুলে নমস্কার আর কখনো কেউ করেছে কিনা মনে পড়লো না তাঁর, একবার একটি সাহেব মেম এসেছিল। তারাও অপরের দেখাদেখি মাথাটা নীচু করে মেটে দাওয়ার ধারে ঠেকিয়েছিল।

অথচ এ ছেলেটা গোঁসাইবাড়ির ছেলে। ও ডেকে কথা বলেনি, তাই দেয়াশিনী-মাও নীরবে আছেন কঠোর দৃষ্টি মেলে।

কিন্তু ভারতী? ভারতীর রসনা তো চুপ থাকতে রাজী হয় না।

এই দোষে সেই দূর সম্পর্কের জ্যেঠতুতো দাদা বৌদির কাছে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে তাকে? বকলে ও বলে, তা কী করবো, অন্যায় দেখে চুপ করে থাকা যায়?

দাদা বলতো, তোমাকে কি কেউ সারা সংসারের জজের পোস্টটা দিয়েছে?

ভারতী বলে বসতো, অত জানি না। হয়তো ভগবানই দিয়ে পাঠিয়েছে।

বৌদি বলতো, পাঠিয়েছেন বটে, তবে ভগবান নিজে যে অন্যা-কাজটা করেছেন, তার জন্যে তো কই কিছু বল না? পরে

বাড়ির পরগাছা হয়ে থাকার বদলে তোমার তো রাজার বাড়ি জন্মাবার কথা।

ভারতী অম্লানবদনে বলতো, আমিওতো তাই ভাবি। ভাবি যেটা হবার কথা ছিল সেটা হলো না কেন। ওই ভগবানটিও তো ঘুষখোর।

বৌদি রেগে আগুন হয়ে যেত। কিন্তু চুপ করে যেত। জানতো বোধহয়, কথা বললে আরো কথা বলবে পাজী মেয়েটা। আর ভগবান জানেন কি না কি বলবে। আশ্রিত হয়ে থেকে, এত কথা! আশ্চর্য!

তবে হয়তো বা ভারতীর এটা বুদ্ধির কৌশল।

হয়তো ভারতী ভেবে দেখেছিল, একবার যদি আশ্রিতজনের মত নীচু হই, কুণ্ঠিত হই, তাহলে আর রক্ষে নেই। ওই বৌদি তাকে ঠেলতে ঠেলতে ঝিয়ের গোত্রে ফেলে দেবে। অতএব এইটাই আত্মরক্ষার ধর্ম। এই নিজের 'পোজিশান' সম্পর্কে যেন অনবহিত, যেন সে বাড়িরই মেয়ে, যেন নিজের দাদার কাছেই আছে, এমন বেপরোয়া ভঙ্গীটি। অথবা ভারতী বরাবরই ভাগ্যের মারটাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলাটাই বেঁচে যাবার উপায় বলে মনে করে। মারটাকে গা পেতে নিলে হয়তো চূর্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কা। তা গা বাঁচিয়ে বাঁচাই। হয়তো ওই কথার ভূমিতে দাঁড়িয়েই সে সংসারের আর সকলের সঙ্গে সমান হবার ভানটা বজায় রাখে। এই কথাটাই ওর দাঁড়াবার বেদী। কথাটাই পরিচয়।

জ্যেঠতুতো দাদার সংসারে আশ্রিত হয়ে অথবা ভোলানাথের স্ত্রী হয়ে যদি শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে দিন কাটাতো, ওকে কেউ মানুষ বলে গণ্য করতো?

এই জীবন-দর্শন ভারতীর। ভারতী বোধকরি সেই জীবন-দর্শনেই বলে, তা আপনি বুঝি জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পেয়ে এদিক দিয়ে ঘুরে এলেন?

ভয়? না ভয় পাবার কিছু নেই, এমনিই এলাম।

তারপর দেয়াশিনী-মার দিকে তাকিয়ে বলে, একটা কথা ছিল—

কথা? কার সঙ্গে? দেয়াশিনী-মা তীক্ষ্ণ।

কিন্তু ছেলেটার প্রাণে ভয়ের বালাই নেই কেন? দেয়াশিনীকে কি ও মিথ্যে গেরুয়া জড়ানো সাজা ভৈরবী ভেবেছে? পথেঘাটে যেমন দেখতে পাওয়া যায়? তা সে যাই ভাবুক নির্ভীক সে, তাতে সন্দেহ নেই। তাই বলে, হ্যাঁ আপনার সঙ্গেই। শুনেছি এখানে শনিবারে আর কি কি বারে যেন ভৌতিক কী একটা ব্যাপার হয়, মা কালীর দৈববাণী-টানি হয়, তা কাল তো—

হয়তো বলতে যাচ্ছিল কাল তো শনিবার, কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না, দেয়াশিনী তীব্র কটু কণ্ঠে বলে উঠলেন, ভৌতিক! পয়সার অহঙ্কারে ধরাকে ধরা দেখছিস, না? না কি বিলেত ফেরতের অহঙ্কার?

বিলেত ফেরত ছেলেটা কিন্তু সবিনয়েই বলে, একথা বলছেন কেন? শুনলাম ভৌ-মানে ইয়ে অলৌকিক কী সব হয় এখানে, কলকাতা থেকে আমার মা লিখেছেন, জিনিসটা কখনো দেখেননি, দেখার বড় কৌতূহল, তাই—

কৌতূহল! কৌতূহলের বশবর্তিনী হয়ে শহর থেকে গ্রামে আসবেন বড়লোকের গিন্নী! অহঙ্কারে চোখে কানে দেখতে পায় না। আকুলতা নয়, ব্যাকুলতা নয়, তীব্র আবেগ, তীব্র ইচ্ছা, তীব্র বেদনার বহিঃপ্রকাশ নয়, শুধু কৌতূহল!!

দেয়াশিনী-মা যেন কালীর বদলে নিজেই অপমানিত বোধ করেন। তাই কঠোর গলায় বলেন, তোর মাকে বলগে এটা যাত্রা থিয়েটার নয় যে, কৌতূহল করে দেখতে আসবে। তেমন দেখা দেখতে ইচ্ছে হয়তো ইস্টিশানের ধারেই বসে থাক। বায়োস্কোপ খুলেছিস নিজেরা, দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিস! খুব আমোদ পাবে।

ছেলেটা বোধ করি এই অক্ষমের নিস্ফল আস্ফালন দেখে মনে মনে কৃপার হাসি হাসে, কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করে না। শান্তভাবেই বলে, আপনি কথাটাকে এভাবে নিচ্ছেন কেন? আমরা ছেলেরা ঠিক এসব বুঝি টুঝি না তো। মা যে কত ব্রত পূজো উপবাস টুপবাস করেন, ভাল করে নামও জানি না তার। হয়তো কৌতূহল বলাটাই

ভুল হয়ে গেছে আমার, আগ্রহ বললেই ঠিক বলা হতো। যাই হোক ব্যাপারটার বিষয় আমাকে জানাতে বলেছেন, তাই—

দেয়াশিনী ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন। উত্তরটা ভারতী দেয়। বলে, ব্যাপারটা আজ রাত থেকেই বুঝতে পারবেন। দেখবেন রাত থেকেই লোক এসে জমতে সুরু করবে, আর সকাল থেকে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে ওই গাছতলার ধারে কাছে ধর্ণা পাড়তে বসবে। রাস্তা পর্যন্ত লোক জমবে।

বিরাম উদ্বিগ্ন গলায় বলে, কিন্তু রাত্রে থাকে কোথায়?

ভারতী হঠাৎ হেসে ওঠে। থাকে কোথায়? ফুটবল খেলা দেখবার টিকিট কিনতে, সিনেমায় লাইন দিতে, হাসপাতালের কার্ড করাতে যেখানে থাকে। খোলা আকাশের নীচে। সুর্যোদয় হবার আগে গঙ্গাস্নান করে ইহ-সংসারের কারো মুখ না দেখে চোখ বুঁজে এসে বসে পড়তে হয়।

আশ্চর্য! বিরাম আস্তে বলে, আমাদের দেশে এই জিনিসটি কী গভীর শিকড় চালিয়ে শাখাপত্র বিস্তার করে বসে আছে! এর থেকে বোধহয় মুক্তির আশা নেই তার।

আস্তে বলে, তবু দেয়াশিনী-মা শুনতে পান। ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, কেন? আশা নেই কেন? তোদের মতন এমন সব বিলেত ফেরত ছেলে, যত সব কমুনিস্টি ছেলে, দেশের গৌরব ছেলে এরা ঘোচাতে পারবে না দেশের কুসংস্কার।

বিরাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, মনে তো হয় না। তা নয়তো আমিই আসি নিজের মার জন্যে আবেদন করতে?

এই সময় অদূরবর্ত্তী দেবী পীরের কাছ থেকে কিছু ধ্বনি শোনা যায়। বোধ করি সমবেত ভক্তের 'মা মা' ধ্বনি! তার মানে কোনো একটি বড় পার্টি আজ সকাল থেকেই এসে জুটলো। ব্যাপারটা নতুন বলেই বোধকরি ভারতী বলে ওঠে, ও মা ওই শোনো, সকাল-বেলাই বোধহয় এসে গেল কোনো ডাকাতের দল। এখন কত হামলা করবে তোমার ওপর! স্বস্তি ঘুচলো।

ধ্বনিটা বেশ উচ্চ হয়ে উঠেছে। দেয়াশিনী-মা কোনো উত্তর না দিয়ে ব্যস্তভাবে দাওয়া থেকে নেমে পড়ে দ্রুত এগিয়ে যান।

বিরাম হঠাৎ বিনা আহ্বানেই এগিয়ে এসে দাওয়ার ধারটায় বসে পড়ে বলে, বসতে তো বললেন না, নিজেই বসলাম। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দেবেন? এই যে সব লোক আসে, এরা ভদ্রলোক? মানে—

ভারতী জোর গলায় হেসে উঠে বলে, আর মানে বোঝাতে হবে না, খুব বুঝেছি। উত্তরটা হচ্ছে, যদি কুসংস্কারাচ্ছন্নদের ভদ্রলোক বলে স্বীকার না করেন তো, কেউই ভদ্রলোক নয়। আর যদি লম্বা লম্বা পাশ, ডাক্তার মোক্তার ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার বিলেত ফেরত আমেরিকা ফেরত, এদেরকেই 'ভদ্রলোক' বলে গণ্য করেন তো, বলবো আসে! অনেক ভদ্রলোক আসে। লুকিয়ে আসে। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লজ্জা পায়, তবু আসে। না এসে উপায় কী? প্রাণের দায়ের কাছে কী আর মানের দায়?

সেটাই কী ঠিক? লোকে তো বলে, প্রাণ যাক মান থাক।

বলে। করে না। লোকে তো বলে, সদা সত্য কথা বলিবে। বলে? বাস্তব আর আদর্শ তো এক জিনিস নয়। ডাক্তারে যখন জবাব দেয়, তখন রুগীর মা বাপের যা মনের অবস্থা হয় ভেবেই দেখুন? দুরারোগ্য রোগ টোগ নিয়েই বেশী লোক আসে।

সে সব রোগ সারে বলে আপনার বিশ্বাস?

ভারতী আর একবার হাসে, ডাক্তারের হাতে সব রোগ সারে বলে আপনার বিশ্বাস? ভারতীর চোখ মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখায়।

বিরাম কথা বলছিল, কিন্তু বিরামের দৃষ্টি বারবার ওর মুখের দিকে নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। নাঃ সন্দেহ করবার আর কিছু নেই। এ মুখ ওর দেখা, যেন বহুবার দেখা।

সে দৃষ্টি ভারতীর ওই কৌতুক আলো ভরা মুখের দিকে আরো একবার নিশ্চয় হলো। তারপর হঠাৎ দুম করে একটা প্রশ্ন করে বসলো বিরাম, আচ্ছা এই তো গ্রামের চেহারা, ওদিকটায় যদি বা শহরের কিছুটা ঢুকেছে, এদিকটা তো পীরের কালী আগলে বসে

আছেন। এখানে বসে থেকে আপনি এতো কথা শিখলেন কী করে বলুন তো ?

ভারতী বোধহয় এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই ভারতী মুহূর্ত খানেক চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই হেসে উঠে বললো, গ্রামের লোক কথায় কম এই বুঝি আপনার ধারণা ?

বিরামও হেসে ফেলে। বলে, না তেমন ধারণা নেই, তবে ভাষা-ভঙ্গী এগুলোয় তো থাকেই কিছু ছাপ ?

সোজা কথায় বলুন না মশাই গাঁইয়া ভাব থাকে। অত কায়দা করবার কিছু নেই। তা আমাকে কি আপনার গাঁইয়া মনে হচ্ছে না ?

মোটেই না।

তবু ভালো। ভারতী যেন হঠাৎ অন্যমনা হয়ে যায়। বলে, আমি তো ভাবি আমার আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত গাঁইয়া হয়ে গেছে।

বিরাম এই সুযোগটা লুফে নেয়। বলে, তার মানে আগে আপনি শহুরে ছিলেন ?'

ভারতী নিজেকে সামলে নেয়। বলে, আগে আমি কোথাও ছিলাম না। অন্ততঃ এখন তো তাই মনে হয়। মনে হয় আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই বোধহয় এইখানেই কবরিত।

তবুতো হাত দেখাতেও ছাড়েন না!

ওইতো মজা। কেউ হাত দেখতে জানে দেখলে আপনারও হাতটা বাড়িয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করবে।

বিরাম হেসে উঠে বলে, কথাটা ভুল বলেননি, এসেই ওই দৃশ্য দেখে আমারও মনে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করি, দেখুন তো যে উদ্দেশ্যে ঘুরছি সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবে কিনা ?

কী, ওই রবার কারখানা ?

বিরাম এই ফিকে হলুদরঙা শাড়ী পরা; মুখের দুপাশে রুক্ষ রুক্ষ এলোচুল ছড়ানো মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ একটা অনাসৃষ্টি কথা বলে বসে। বলে, তখন তাই মনে হচ্ছিল।

তখন তাই মনে হচ্ছিল ? ভারতী অবাক অবাক গলায় বলে, এখন কী মনে হচ্ছে ?

বিরাম বলে, তখন হাত দেখালে বলতাম, আচ্ছা বলুনতো এই ভদ্রমহিলাটিকে আমি কোথায় দেখেছি ?

এই আপনার প্রশ্ন! ভারতী আকাশ থেকে পড়ে। একটা জরুরী কথা ?

আপাততঃ এইটাই সবচেয়ে জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

ভারতী কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। যেদিকে ঘন ঝোপ, যেদিকে অন্ধকার। যার উল্টোদিকে সরু রেখার পায়ে চলা পথটুকু। যে পথ গঙ্গার দিকে চলে গেছে। ওই পথ দিয়ে গঙ্গাস্নানে যান দেয়াশিনী, ওই পথ ধরে ভারতী আসে নিজের বাড়ি থেকে 'সর্টকাট' করে। সেই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা মুখ নিয়েই ভারতী বলে, বলেছি তো কস্মিনকালেও দেখেননি। দেখবার প্রয়োজনই বোধ করেননি।

বিরাম ব্যগ্রভাবে বলে, এটা তো আরো রহস্যময় কথা হলো। বলুন শীগগির, আগে আপনি কোথায় ছিলেন ?

সব রহস্য ভেদ করতে নেই। বলে উঠে দাঁড়ায় ভারতী।

চলে যাচ্ছেন ? কেমন যেন বোকার মতো লাগে কথাটা। ভারতী হেসে ফেলে, যাবে না তো কী সারা সকাল পরপুরুষের সঙ্গে বসে আড্ডা দেব ?

আপনার কথাবার্তা একটু অদ্ভুত।

আমার সবটাই অদ্ভুত। বলে হঠাৎ পিছু ফিরে চলতে সুরু করে ভারতী।

আশ্চর্য ! জীবনে কখনো দেখেছি, তবু 'দেখেছি' বলে দাবি করছে। কেন ? কেন ? ভারতী ওই নামটা শুনেছিল। কিন্তু ভারতী কি নিশ্চিত হতে পারছে ? ভারতী জানে জগতে একই নামের অনেক লোক থাকে। একই ধরণের চেহারার ভারতীর মতো দেখতে কাউকে দেখেছে ও, তাছাড়া আর কিছু নয়।

ছেলেটা কি আশ্চর্য রকমের সরল। বড়লোকের ছেলে, রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যে আছে, তবু অহঙ্কার টহঙ্কার নেই। না হলে কখনো ভারতীর মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর কথার উত্তরে কথা কয় ?

ভারতীর ঘরের বাড়িতে একটা বড় আয়না নেই। ভারতীর তাই

দেখবার উপায় নেই তার আকৃতিটা সত্যিই গাঁইয়া মার্কা হয়ে গেছে কিনা! আর প্রকৃতি? সে তো নিঃসন্দেহেই গেছে। তবু ও বললো, আপনি মোটেই এ গ্রামের মতো নয়। বিরাম! বিরাম! খুব গভীরে একখণ্ড অঙ্গারের মতো প'ড়ে আছে নামটা। নাড়াচাড়া করতে গেলেই বুঝি জ্বলে উঠে দাহর সৃষ্টি করবে। কিন্তু নিঃসন্দেহ হবার উপায় কী?

হায় হায়, ভারতী কেন জিজ্ঞেস করলো না, আপনি কি আপনার মায়ের সব ছোটো ছেলে? আপনার উপরে কি অনেক ভাইবোন? আমি একজন বিরামের নাম শুনেছিলাম, তার ছিল এই অবস্থা। অনেক ছেলে মেয়ের পর আবার ছেলে, তাই দুঃখে লজ্জায় তার মা নাকি ছেলের নাম দিয়েছিল 'বিরাম।'

যে গল্প করেছিল, সে বলেছিল, জামাইবাবুর মা নাকি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন, মেয়ে হলে 'বিরতি' নাম রাখবেন, ছেলে হলে বিরাম।

কে জানে সব বিরামেরই নামের ইতিহাস একই রকম কিনা, তা হলে তো নিশ্চিত হবার কোনো উপায়ই নেই। 'ইতি' নামের ইতিহাস তো সর্বত্রই এক। অতএব ঝাপসাই থাকলো।

বিরাম এসেছিল বেহাত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে। বিরাম এসেছিল তার অনেকদিনের একটি স্বপ্ন সফল করবার স্বপ্ন দেখতে। কিন্তু বিরাম তুচ্ছ একটা কৌতূহলের পিছনে মোহাচ্ছন্নের মতো ঘুরতে লাগলো। তুচ্ছ বলে তুচ্ছ। একেবারে অর্থহীন তুচ্ছ। একটা মেয়েকে দেখে যদি হঠাৎ মনেই হয়ে থাকে, ওকে যেন কোথায় দেখেছি আমি, তো সেই মনে হওয়াটা নিয়ে মনকে এত ডুবিয়ে রাখতে হবে? খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই? অথচ বিরামের ব্যবহার দেখে তাই মনে হচ্ছে। খেয়ে দেয়ে কাজই নেই। কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে কথা বললো না; মাকে খবর দেবার কথা ভুললো। ও শুধু খোঁজ করবার তালে ঘুরতে লাগলো মেয়েটা কাদের বাড়ির বৌ। কেন?

উত্তেজিত সুষমা ভাইয়ের ঘরের দরজায় এসে যেন আছড়ে পড়লো,

শুনেছিস ভোলা, গাঁয়ের লোকেরা নাকি বলছে, আমরা তো আর কালীর জঙ্গলে কোপ মারতে যাচ্ছি না, যারা মারবে, তারা মরবে। তবে এখানে একটা 'ফ্যাক্টরি' বসলে মন্দ হয় না। গাঁয়ের অগাবগা বেকার ছেলেগুলোর কাজ জোটে।

ভোলা দীর্ঘকাল বহির্জগতের বহির্লোকে পড়ে আছে। ভোলা পীরের কালীর খাঁড়া ধোওয়া জল আর চরণামৃত খেয়ে খেয়ে পেটে নদী বইয়ে ফেলেছে, আর দেবীর নির্মাল্যে মাতুলী কবচ ধারণ করে করে হাত কোমর ভারী করে বিছানায় পড়ে আছে।

ভোলার তাই পীরের কালী সম্পর্কে সমীহের আর বড় বেশী অবশিষ্ট নেই। কালীর জঙ্গল পড়ে থাকলেও ভোলা কোনোদিন সেই বুনো বুনো গন্ধওলা অন্ধকার অন্ধকার জায়গাটায় বসে লুকিয়ে একটু গাঁজা খেয়ে নিতে পারবে না, আর সে জঙ্গল সাফ হয়ে গিয়ে কারখানা বসলেও বেকার ভোলা সেখানে গিয়ে চাকরী জোটাতে পারবে না, তাই ভোলা গুরুজন শব্দটার সম্পর্কে চিন্তামাত্র না করে চেঁচিয়ে ওঠে, তা অত চেঁচিয়ে মরছিস কেন? হোক ছাই না হোক তোর কিছু এসে যাবে?

সুষমা বসে পড়ে। সুষমা চোখ কপালে তুলে বলে, তুই বলিস কি ভোলা, আমরা গাঁয়ের লোক নই? আমি কোথায় ভাবছি সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে রুখবে, তা নয় তলে তলে এই সব চিন্তা!

ভোলা রুক্ষ গলায় বলে, তা মন্দই বা কী বলেছে? মা ওই একশো বিঘে জমিতে জঙ্গল গজিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসে থেকে করবেই বা কী? মঠ মন্দির করবার তো জো নেই। কারখানা মারখানা একটা হয়ে দেশের ছেলেদের অন্ন সংস্থান হয় তো হোক না।

ভারতী পূর্বমুখ হয়ে বসে একমনে কবিরাজী ওষুধ মাড়ছিল। সুষমার মত পূবমুখো হয়ে না মাড়লে নাকি কবিরাজী ওষুধের গুণ ধরে না।

ভারতী অবশ্য ব্যঙ্গ-হাসি হেসে সুষমার এই মতবাদ খণ্ডন করে। বলে, পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো মুখো হয়েই গুণ ধরবে না গো ঠাকুরঝি তোমার ভাইয়ের দেহে। ওর রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে

শুধু যমরাজের মহৌষধি বটিকার। তবু ওষুধটা মাড়তে বসতে হলে গলবস্ত্র হয়ে 'এই বসলাম তোমাদের পূব মুখো হয়ে' বলে সত্যিই পূব মুখো হয়ে বসে।

এখনো তাই বসেছিল। অতএব মুখটা জানালার দিকে ছিল। এখন কাজটা শেষ করে এসে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলে, কারখানা তো হবে না, ওই মারখানাই হবে। মরতে হবে সবাইকে। মা পীরের কালী কি রক্ষে রাখবেন?

সুষমাও অবশ্য ওই একই মতে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতীর কথার প্রতিবাদ না করে আর থাকাও তো একটা সম্ভব কথা নয়? তাই বেজার গলায় বলে ওঠে, কলিতে কী আর মায়ের সে ইয়ে আছে? দেখো ওই ঘুঘু গোঁসাইরা ঠিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। ওই যে এসেছেন একখানি বিলেত ফেরত। সুষমা মুখ বাঁকিয়ে বলে, শুয়োর গরু খেয়ে আসা মেজাজ তো! ঠাকুর দেবতা বলে গ্রাহ্যই নেই। মরবে, মরবে, রেহাই পেতে হবে না। তবে কলিকালে বিশ্বাসও নেই।

ভারতী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভারতী তার ননদের কথা খণ্ডন করতে হেসে উঠতে ভুলে যায়, ও শুধু ওষুধটা ওর স্বামীর মুখের কাছে গিয়ে ধরে।

ভোলানাথ ওষুধটা সমস্ত চেটেপুটে খেয়ে খল নুড়িটা বৌয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মুখটা তেতো করে বলে, ওষুধ খেয়ে কী হবে শুনি? কলাপোড়া, কলাপোড়া! ওই সাধের সিঁদুর টিপটি আর বেশীদিন পরতে হবে না।

ভারতী এ হেন কথারও একটা লাগসই উত্তর দিতে পারে না। ভারতী যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মরবে মরবে, রেহাই পেতে হবে না।

সুষমা কি অভিশাপ দিলো? কিন্তু সুষমার তো কথার ধরণই ওই।

পীরের কালীর ভক্তবৃন্দ যে কেটে কুচিকুচি করে জঙ্গলে পুঁতে ফেলবে, এ আশঙ্কা বোধ হয় আর নেই। দূরের ভক্তরা লড়তে আসবে না, আর তারা এত জানেও না। ভয় ছিল গ্রামের লোকেদের

কাছে থেকে, কিন্তু এখন স্বার্থবুদ্ধি তাদের চিন্তাকে পরিচালিত করছে। কাজেই—

কিন্তু ভয় না ভরসা? গ্রামের লোক বাধা দেবে সেইটাই তো ভরসা ছিল অথচ—অথচ কী তা জানে না। তবু এখন সুষমার ওই কথায় যেন স্বস্তি বোধ করছে।

দেয়াশিনী-মা সম্পর্কেও দুর্বোধ্যতার কুয়াশা। তিনি তো কই একবারও বলছেন না, মা কালীর রোষে 'ওদের সর্বনাশ হবে। বলছেন না তো, জঙ্গলের একটা দুর্বোর শেকড়ে কোপ দিয়ে দেখুক দিকি। বরং অম্লানবদনে বলছেন, 'মা জানেন।' অতএব ওখানেও ভয় নেই।

শেষ ভয় স্বয়ং মা কালী। আর সেটাই হচ্ছে অজানিত ভয়। কে বলতে পারে কী হবে। কোন সংহার লীলার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন মা?

ভারতীর সর্বাঙ্গ যেন ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভারতী কি হত্যে দেবে? ভারতী কি মায়ের পায়ে পড়ে থেকে সবাইয়ের জন্যে রক্ষা চেয়ে নেবে?

কিন্তু কে সেই সবাই? যার জন্যে ভারতীর মাথা ব্যথা? ভারতী তো অহরহ বলে, এই শুনি এ নদীতে বান ডেকে সব ভাসালো, এই শুনি ও নদীতে বান ডেকে সব ডোবালো, আচ্ছা মা গঙ্গায় একদিন বান ডাকে না গো? যাতে সমগ্র লোক সমেত আমার এই শ্বশুরবাড়ির গাঁ খানা গঙ্গার তলায় তলিয়ে যায়।

তবে? ভারতী কি তাহলে রূপ দেখে মজেছে? তাই দু'দণ্ডের দেখা একটা মানুষের জন্যে এত কাতর হচ্ছে? নাকি ভারতী ইতিপূর্বে পুরুষের চোখের সপ্রশংস দৃষ্টি দেখেনি বলেই সেই দৃষ্টিটা মনে করছে আর ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে?

খবরটা সংগ্রহ করতে দেরী হল না বিরামের। আর অসুবিধেও হল না। জমি জরীপের সময় ব্যাগড়া দিতে গিয়েছিল, দেয়াশিনী-মার দাওয়ায় বসে কটকট করে কথা শুনিয়ে দিল, অভিশাপের ভয় দেখিয়ে

দিল, সে মেয়েমানুষটি কে, তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। প্রশ্ন করলে সন্দেহ করবার হেতু কারো নেই। তাছাড়া—ওটাকে না চেনে কে? ওই বাচাল বেহারা বৌটাকে। দেয়াশিনী-মার পুষ্যিকন্যে বললেই চলে, কালীতলায় সর্বদা দেখতে পাওয়া যায়। লোকের দেওয়া পূজো ধরছে, এটা করছে, ওটা করছে, ফুল বাছছে, মালা গাঁথছে। অথচ সংসারে পঙ্গু স্বামীটা বিছানায় পড়ে। তেষ্টা পেলে জল গড়িয়ে খাবার ক্ষমতা নেই যার। নেহাত বাড়িতে একটা বিধবা দিদি আছে তাই হতভাগাটা বেঁচে আছে এখনো। তা পঙ্গু কেন? এ্যাকসিডেন্ট-টেন্ট? না না, সে সব কিছু না। বলতে গেলে জন্মরোগী। মৃগী রোগ। ছেলেবেলায় রোগটা দুর্দ্দান্ত টাইপের ছিল, বিধবা মা ওই পীরের কালীর কাছে হত্যে টত্যে দিয়ে, ওই কালীর জঙ্গলেরই কী গাছ গাছড়ার ওষুধ টষুধ খাইয়ে রোগী একটু ভাল করেছিল, ইস্কুলে টিস্কুলেও যেতো ছোঁড়া। পড়তো, খেলে বেড়াতো। লোকে কখনো ক্ষেপিয়ে মজা দেখতো, কখনো 'আহা' বলে মায়া দেখাতো। ভাল নাম একটা আছে বোধ হয়, তা সেটা কারো তেমন জানা নেই। মা 'ভোলা ভোলা' করে ডাকতো। সেটাই চালু।

তা ছিল এক রকম। মা মরতে বিধবা দিদিই রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপলো। দিদিও বললো, ওই বিয়ে পাগলা ছোঁড়াকে আমি আর টানতে পারছি না। রাতদিন মেজাজ, রাতদিন হাঁড়ি মুখ, দিয়েই দিই। তা বাংলা দেশে আর যতই অভাব থাক, কনের অভাব নেই। দূর সম্পর্কের এক মামা খবরের কাগজ পড়ে পড়ে একটা পাত্রী জোগাড় করে বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়ে গেল।

তা এমনি অপয়া বৌ, বিয়ে হলো আর ঘুরে বেড়ানো ছেলেটা পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়লো! কেউ বলে 'অপয়া,' কেউ বলে, বৌটাই নিজে স্বাধীন হয়ে নেচে বেড়াবার জন্যে তুকতাক করে ওকে বিছানায় পেড়ে ফেলেছে। নচেৎ ওই দেয়শিনীর সঙ্গে কিসের অত গলাগলি? ওঁরা হচ্ছেন ভয়ঙ্করী! ওঁরা লোকের ভালো করতেও পারেন আবার সর্বনাশ করতেও পারেন। ওই ভোলা চাটুয্যের বৌটার

সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সর্বনাশটি করে বসেছেন ভোলা চাটুয্যের। বৌটা-কে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বাক্যি তো নয়, যেন ছুরি।

যাক সবই তো জানা হয়ে গেল, কিন্তু বৌটার বাপের বাড়ি কোথায়? তিন কূলে কেউ নেই নাকি? নেই নিশ্চয়, নচেৎ এভাবে পড়ে থাকে? আর এমন ভাবে না দেখে না শুনে খবরের কাগজ দেখে বিয়ে দেয়?

বাপের বাড়ি? তা ঠিক জানা নেই। নাগপুর না রায়পুর কী যেন শোনা গিয়েছিল বিয়ের সময়। ব্যস ওইখানেই তো খতম! আর তো দ্বিতীয় বার এ গাঁয়ের বাইরে পা দেয়নি এই পাঁচ ছ বছরের মধ্যে।

বিরাম তার সংবাদদাতাকে বলেছিল, যাক, জানা হয়ে থাকলো, ভালই হল, যতই হোক শত্রুপক্ষ।

সংবাদদাতা বলেছিল, কিন্তু সাবধান থাকবেন মিষ্টার গোস্বামী, ওরা সব অনেক কিছু জানে। প্রসাদ-ট্রসাদ দিতে এলে খাবেন না।

কিন্তু প্রসাদ-ট্রসাদ কিছুই তো দিতে আসেনি ওরা, তবু কেন বিরাম নামের বুদ্ধিমান ছেলেটা এমন অস্থিরতা অনুভব করছে? কেন এমন হাহাকার বোধ করছে? যেন অজ্ঞাতসারে কাউকে মাড়িয়ে ফেলে মেরে ফেলেছে। যেন না বুঝে একটা মানুষকে আগুনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। না জেনে অপরাধ কি অপরাধ নয়?

কিন্তু বিরাম তো পাগল নয় যে একটা অকিঞ্চিৎকর সুন্দর মুখের প্রলোভনে, আর একটা সরল হৃদয় নির্বোধ মেয়েমানুষের অনুরোধে পড়ে নন্‌ম্যাট্রিক একখানা মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে বসবে! তাছাড়া তখন তার জীবনের কত পরিকল্পনা।

লতিকা বৌদি বলেছিল, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে—

বিরাম হেসে বলেছিল, সে তো নিজেই গেলা। আর এযে গ্রাসিত হওয়া।

তবু বহু চেষ্টা করেছিল লতিকা বৌদি। সেই অদেখা মেয়ের গুণবর্ণনা আর বুদ্ধির বর্ণনা করে করে বিরামের মাকে দ্রবীভূত করে এনে মাকে দিয়ে অনুনয় করিয়েছিল বিরামকে। মা বলেছিল, লতিকা বৌমা বলছে, অবস্থার বিপাকে পড়ে লেখাপড়া করতে পায়নি, তাই

পাশ করেনি। মেয়ে যা চৌকস্, বিলেত আমেরিকাতেও যদি নিয়ে যাস মানিয়ে নিতে পারবে।

বিরাম হেসে ঘর ফাটিয়েছিল। মাকে পরের মুখে ঝাল খেতে নিষেধ করেছিল। মা বলেছিল, বেচারী নাকি বড় দুর্দ্দশায় আছে। একটা ভাল মেয়ে।

বিরাম তাতেও অনমনীয়। বিরাম মাকে প্রশ্ন করেছিল, বাংলা দেশে কি ওই একটি মাত্রই ভাল মেয়ে দুর্দ্দশার মধ্যে নিমর্জ্জিত আছে? তাই ওর দুঃখ দূর করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

লতিকা বৌদি বলে গিয়েছিল, আমি এই বলে দিলাম, অমন বৌ তোমার কক্ষনো জুটবে না। দেখছি তো তোমার দাদাদের বৌদের?

হ্যাঁ, বিরামের অনেক দাদা অনেক বৌদি, ও মায়ের কোলের ছেলে। মা 'বিরাম' নাম রেখে তুক্ করেছিল।

বিরাম তথাপি অবিচলিত। বুঝবো সেটাই আমার নিয়তি। নিয়তিই সব। ব্যঙ্গ করেই বলেছিল অবশ্য।

লতিকা বৌদির কিন্তু চোখে জল এসেছিল। বলেছিল, সে তো নিশ্চয়। নিয়তির খেলাতেই হয়তো ওই চমৎকার মেয়েটাকে আমার পূজনীয় দিদি জামাইবাবু একটা দোজবরে কি রোগগ্রস্ত, কি একটা মুখ্যু গরীবের হাতে ধরে দেবে। মরতে আমি গেসলাম ওখানে, না দেখলে তো এত মায়া পড়তো না।

বিরাম দেখেনি। রাজা দশরথকে তাহলে সিন্ধুমনি হত্যার পাপ স্পর্শ করেছিল কেন?

এখন সেই ফটোখানা স্পষ্ট মনে পড়ছে। মামাতো বৌদি লতিকা সেখানা ওর পড়ার টেবিলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, এই মেয়েটার কথা বলছিলাম! আমার দিদির কী রকম যেন সম্পর্কের ননদ। মোট কথা ঘাড়ে পড়া আশ্রিত। মা বাপ কেউ নেই, থাকতে ওই দূর সম্পর্কের দাদা। তা বলবো কি ভাই, নিজের দিদি জামাইবাবু, তবু না বলে পারছিনা, দুটো মানুষই স্রেফ্ কসাই। ওই ছেলেমানুষ মেয়েটাকে দিয়ে ঝি চাকরানীর খাটুনী খাটাচ্ছে। গিয়েছিলাম ক'দিন দিদির কাছে নাগপুরে, মেয়েটার অসহায় অবস্থা দেখে মনে হল নিয়ে চলে আসি।

কিন্তু কোন সুবাদে নিয়ে আসবো বল ? যদি পুরুষ মানুষ হতাম স্রেফ বিয়ে করে নিয়ে চলে আসতাম। কি আর করবো, নিজেই চলে এলাম। টিকতে পারলাম না।

যে পুরুষ মানুষ, সে অতএব বিয়ে করে নিয়ে চলে আসুক।

তারপর অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল লতিকা বৌদি। মানবিকতা, হৃদয়বত্তা, অনেক কিছুর দোহাই দিয়েছিল। ও ফটোটার সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে বলেছিল। বিরামের তাও মায়া পড়েনি।

ওপক্ষ থেকে বোধহয় লতিকা বৌদির উস্কানিতেই একটা প্রস্তাব এসেছিল মেয়ে দেখবার। দেখতে রাজী হলে মেয়ের দাদা নিজে মেয়ে এনে দেখিয়ে যাবে। কে জানে লতিকা বৌদি হয়তো ব্যয়ভার বহন করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে বসেছিল।

লতিকা বৌদি একবার একটা পা ভাঙা কাক পুষে তার জন্যে রাজকীয় সমারোহ করেছিল। ডাক্তার ডেকেছিল, খাঁচা কিনেছিল। কিন্তু বিরাম তো লতিকা বৌদি নয়। বিরাম মেয়ে দেখতে রাজী হয়নি।

বিয়ে যখন করবই না নন্‌ম্যাট্রিক মেয়েকে, তখন দেখে দরকার কী ?

আমি বলছি দেখলে তুমি পছন্দ না করে পারতে না। বলেছিল লতিকা বৌদি।

বিরাম বলেছিল, ভাগ্যিস তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মাওনি। হলে নির্ঘাৎ মেয়ে দেখলেই পছন্দ করে বসতে।

লতিকা বৌদি রাগ করে চলে গিয়েছিল। ফটোখানা বিরামের টেবিলেই পড়ে ছিল। টেবিল থেকে ড্রয়ারে। গরজ করে ফেরত দেওয়া হয়নি। যখন ড্রয়ার খুলেছে, হঠাৎ মনে হয়েছে ছবিটা যেন জ্যান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। ছবিটা উল্টে রেখেছে বিরাম।

তারপর কালস্রোতে কোথায় ভেসে গিয়েছে সেই তুচ্ছ একটুকরো কাগজ। সেই জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে থাকা একজোড়া চোখ।

তবু দেখেই মনে হলো আচ্ছা কি ওকে কোথাও দেখেছি ?

কিন্তু বিরাম এত যন্ত্রণা অনুভব করছে কেন ? বাংলা দেশে কি দুঃখী মেয়ের অভাব আছে ? অভাব আছে এরকম প্রবঞ্চিত মেয়ের ? জীবন অপচয়ের এমন দৃষ্টান্ত কি এদেশে বিরল ?

রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো বিরাম। দেখলো যেন একজোড়া চোখ একখানা ছবির মুখ থেকে জীবন্ত হয়ে তাকালো···তাকিয়ে থাকলো ···তারপর আস্তে আস্তে সে চোখ বিস্ফারিত হল, হতে হতে ছবি ছাড়িয়ে বিরামের সমস্ত সামনেটা ঢেকে ফেললো···তারপর সেই চোখ থেকে আগুনের ঝিলিক ছিটকে পড়তে লাগলো। বিরাম ভয় পেল। বিরাম ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো, পালাতে পারল না। যেন পা দুটো মাটির সঙ্গে পুঁতে গেছে। সেই আগুনের ফিনকি বাড়তে বাড়তে বিরামকে ঢেকে ফেললো, বিরাম তারপর প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গঙ্গায় পড়তে গেল, কোথাও পথ পেল না। দেখলো সমস্ত গঙ্গার ধারটায় পাথরের প্রাচীর। তারপর বিরাম খুব সোরগোল শুনতে পেল। যেন অনেক লোক জলে ডুবে যাচ্ছে, তাই আর্তনাদ করছে। ওই পাথরের প্রাচীরটা ভেদ করে ওরা জলে পড়লো কী করে?

ঘেমে টেমে ঘুম ভেঙে গেল বিরামের। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো। শুনতে পেল স্বপ্নের আর্তনাদটা এগিয়ে আসছে। তারপর আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারলো। স্টেশনের গোলমাল। যাত্রী আসছে। মা মা ধ্বনি করছে তারা ভয়ঙ্কর আর্তনাদের সুরে। ভক্তির ভাব এমন আর্তনাদের হয় কেন। রাত্রি দেড়টায় একটা ট্রেন আসে। আসে বললে ভুল হয়, ছুটে চলে যেতে যেতে আধমিনিটের জন্যে থামে। আসলে থামবার কথা নয়, স্থানীয় লোকদের চাপে ওইটুকু রফা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট্ট ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়ায় বিরাম। দেখে এক ঝাঁক লোক চলেছে, থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। আগামী-কাল শুধু শনিবারই নয়, নাকি বিশেষ কী একটা ঘোরতর তিথি। দুইয়ের সংমিশ্রণে পীরের কালী আরো মহিমাময়ী হয়ে উঠেছেন।

বিরাম ওই অপসৃয়মান ঝাঁকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বপ্নটার কথা ভাবতে থাকে।

কার চোখ দেখলো সে? পীরের কালীর? দেয়াশিনী-মার? যে চোখে তখন আগুন দেখেছিল বিরাম! না কি এ চোখ অনেক দিন আগের? একটুকরো কাগজের মধ্যে থেকে যে স্পষ্ট জীবন্ত

চোখে তাকিয়ে থাকতো। ড্রয়ারে পুরে রেখেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগতো। অথচ ড্রয়ার থেকে বার করে ফেলে দিতেও পারা যায়নি।

তারপর কে জানে কোথায় হারিয়ে গেল।

কত হাজার হাজার মাইল দূরে চলে গেল বিরাম, কত কাগজ পত্র, কত—ড্রয়ার থেকে কত সুটকেসে স্থানান্তরিত হল, চোখ দুটো মুছে গেল। সেই মুছে যাওয়া জিনিসটা আবার ফিরে এসে আগুন ছড়াবে কেন?

কস্মিনকালেও দেখেননি, দেখবার প্রয়োজনই বোধ করেননি। বলবার জন্যে? আচ্ছা, পৃথিবী তো শুধু এই কালীর জঙ্গলেই আটকে পড়ে নাই?

তবে কেন কোনো এক সময়ের ভুল অন্য সময়ে শোধরানো যাবে না?

তাছাড়া আটকে পড়ে থাকছেই বা কই? যদিও এখনো গভীর রাত্রির শান্তি-ভঙ্গ করে মূর্খ যাত্রীর দল দেবীর দরবারে আর্জি জানাতে আর্তনাদ করে, তবে বুদ্ধিমানেরা গোপন গভীরে এসে প্রস্তাব করে বসতে দ্বিধা করে না, নালিশ তুলে দিয়ে আপোস রফা করা হোক। তিন শরীক সেবাইত পরিবারকে কিছু কিছু দিয়ে দিলেই ওঁরা রটিয়ে দিতে পারবেন দেবীর আদেশ হয়েছে জঙ্গল সাফ হোক। কোপ দিতে আর কোপের ভয় নেই।

তার মানে কোপ পড়েই গেছে কালীর জঙ্গলের শিকড়ে। গোড়া কাটা মরা ডালপালাগুলো জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে তার মানে ওই নবজাগ্রত শহর দ্রুত ছুটে আসবার জন্যে জায়গা চাইছে।

বেকারে চাকরী চায়, পীচের রাস্তা এগিয়ে আসতে চায়, বাড়ি সমুদ্র তার আর একখানা ঢেউ ঠেলে দিতে চায় কালীতলার কাছ বরাবর।

এদের ঠেকাবে কে? কালী? কেন? তিনি তো থাকছেন। তিনি তো আর জঙ্গলের সাপেদের মত উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছেন না?

তিনি থাকবেন, যুগে যুগে থাকবেন। যাত্রীর আসা যাওয়াও থাকবে।

অতএব ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের আশাও থাকবে। বরং কাঁচা রাস্তা পাকা হলে আসাটা বেশী হবে।

কালী থাকবেন, তাঁর সেবিকাও থাকবেন, ভরও থাকবে।

পথ চলতে চলতে নাকমলা কানমলাও থাকবে। না থাকলে চলে? যে গাছের নীচে প্রত্যাশার পাত্রখানি এনে ধরা যায় সে গাছটিকে কি কেউ কাটে?

মাদুলী কবচ, খাঁড়া ধোয়া জল, অমাবস্যার নির্মাল্য, এসব না থাকলে ডাক্তারে জবাব দেওয়া রোগীর জন্যে আর কী থাকবে? কী থাকবে ছেলের চাকরী, মেয়ের বিয়ে, মামলা জেতার জন্যে? তাছাড়া মায়ের সুবাদে আয় নেই?

মা মাত্রেই তো একটি আয়করী প্রতিষ্ঠান।

মা কালীর আদেশ পর্ব শেষ হয়েছে, যাত্রীরা এখন উপবাস ভঙ্গ করে গোগ্রাসে গিলছে এখানে সেখানে, গঙ্গার তীরে ইঁট পেতে উনুন জ্বেলে ভাত সিদ্ধ করে অথবা নিয়েছে চালে ডালে সিদ্ধ করে। নুন আছে কাঁচা-লঙ্কা আছে আর কি চাই? ওই উপকরণেই ভূরিভোজের উল্লাস।

মায়ের বাণী পেয়ে গেছে যে, হবে না উল্লাস? বাণী পেয়েছে 'ধৈর্য্য ধর' তাতেই আশ্বাস। কোন ব্যাপারে ধৈর্য্য ধরবে তা জানে না। বাণী পেয়েছে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তাতেই আহ্লাদ।

মনে কত কোটি বাঞ্ছা আছে, তার কোনটা পূরণ হবে তা ভেবে দেখছে না। বাণী পেয়েছে 'রোগমুক্ত হবি' তাতেই যেন অর্দ্ধেক রোগ সেরে গেছে। বাণী পেয়েছে শত্রু দূর হবে, আশা হচ্ছে বাসায় গিয়ে শুনবে শত্রু তার নিজের বাসায় মরে পড়ে আছে। অতএব যাত্রীদের চোখে মুখে দীপ্তি।

সম্ভ্রান্তদের অবশ্য এ আসরে দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা বাণীপ্রাপ্তির পরই হয় ফিরতি রওনা দিচ্ছেন, নয় সিনেমা হলের পাশের 'পারিজাত হোটেলে' আশ্রয় নিয়েছেন।

এরা অসম্ভ্রান্ত, তাই এদের গাছতলায় গতি। শুধু একটি মাত্র সময়ে

দু'জনায় এক গোত্র হয়। একটি বন্ধনে বাঁধা পড়ে দু'জনে। সেই বন্ধন রজ্জুটির নাম 'মূঢ় প্রত্যাশা।

কই, আপনার মাকে আনলেন না ?

চমকে তাকালো বিরাম। এ পরিবেশে দেখতে পাবে আশা করেনি। কিন্তু বিরামই বা এখানে কেন ?

এই এঁটো শালপাতা আর ভাঙা মাটির হাঁড়ির জঞ্জালের ধারে কাছে ?

কেন, সে কথা বিরাম নিজেই জানে না। অথচ বিরাম বহুক্ষণ থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃগীরোগগ্রস্ত পঙ্গু ভোলা চাটুয্যের বাড়ি থেকে কালীর জঙ্গলের ধারের গঙ্গাতীরবর্তী পথটায়। পথ নয় চড়া। তবু প্রয়োজনে বালির চড়া-ই পথ কিন্তু বিরামের এমন কী প্রয়োজন পড়লো যে বালির চড়াকে পথ করতে হল ? কে জানে কার কি প্রয়োজন ?

না হলে ভোলা চাটুয্যের বৌয়েরই বা কী প্রয়োজন ছিল বিরাম গোস্বামীর মায়ের খবর নেবার ?

বিরামের মুখে আলো জ্বলে ওঠে। বিরাম এগিয়ে এসে বলে, আপনি এখানে।

সেটা বরং আমিই আপনাকে জিগ্যেস করতে পারি। আমার তো এটা বাড়ির উঠোন।

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছিল, বিরাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে ওঠে, যদি বলি আপনার জন্যেই আপনার বাড়ির উঠোনের ধারে ঘুরছি ?

ভারতীর পরণে আজ একটা সস্তামার্কা লাল চেলি। ভারতীর কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। ভারতীর হাতে আজ একজোড়া নতুন শাঁখা। এই সাজ-সজ্জা সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত যুবকের দৃষ্টি সুখকর নয় বরং দৃষ্টিশূলই হবার কথা, তবু ওই সজ্জাই বিরামের চোখকে টানে।

ভারতীকে যেন অনেক ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। কিন্তু কথাটা ভারতী ছেলেমানুষের মত বলে না। গম্ভীর ভাবে বলে, যারা এ ধরণের কথা বলে তাদের কী বলে জানেন ?

জানি, বিরামও গম্ভীর ভাবে বলে, চরিত্রহীন। কিন্তু ওসব বলা-টলায় কেয়ার করি না আমি। আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই,—

কী কথা ? ভালবাসার ? বলে ভয়ানক সেই হাসিটা হাসে ভারতী। যে হাসিতে মনে হয় সামনের মানুষটাকে নস্যাৎ করে দিল।

তবু বিরাম বলে, হাসুন আর যাই করুন, যদি বলি তাই। একদা মূঢ়তার বশে যাকে দেখার প্রয়োজন নেই বলে ফিরিয়ে দিয়েছি, আজ তাকেই শুধু একটু দেখার জন্যে পথহীন পথে দাঁড়িয়েছি।

রহস্যটা ভেদ হয়ে গেল তা হলে ?

গেল। কায়াকে না দেখলেও ছায়াকে দেখেছি। লতিকা বৌদির দেওয়া সেই ফটোর মুখের সঙ্গে এখনো কোনো প্রভেদ নেই। সাত সাতটা বছরেও কিছু বদল হয়নি আপনার মুখের।

আহা শুনে বড় আনন্দ হল। কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। জানেন তো পঞ্চাশ বছরের মহিলাকেও যদি বলা যায়, কী আশ্চর্য, আপনার পঁচিশ বছরের মেয়ে! আপনাকেই যে পঁচিশ বছরের দেখাচ্ছে—তাহলে সে মহিলা বক্তার নামে সর্বস্ব লিখে দিতে পারেন।

বিরাম বলে, জানি ও সব কথা, কিন্তু ও কথা থাক। আশ্চর্য মূঢ়তা যে আমি আপনার নামটাও জানিনা—

ভারতী হি হি করে করে হাসে, ওমা লতিকা বৌদি তবে কার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিল আপনার। বিনামার ?

আপনি সব কথাই পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চান। বিরাম একটা অদ্ভুত ব্যগ্র গলায় বলে, বলুন আপনার নাম কি ?

জেনে কী হবে ?

বিরাম আরো কাছে এগিয়ে আসে। বিরামের নিঃশ্বাস ওর গায়ে এসে লাগে। পড়ন্ত বেলার আভায় না কি ভিতরের আবেগে বিরামের মুখটা লালচে দেখায়, বিরাম জোরের সঙ্গে বলে, কিছুই কি হতে পারে না ? একদার ভুল অন্য সময় শোধরানো কি একেবারেই অসম্ভব ?

ভারতীর সারা মুখে যেন একটা অলৌকিক রহস্যময়তা। ভারতী

যেন এখানে থেকেও এখানে নেই। সেই অনুপস্থিত ভারতী বলে, অসম্ভব বলে কোনো শব্দ সত্যিই আছে নাকি?

নেই? ঠিক বলছেন?

বলছি তো। ও শব্দটা যদি সত্যিই থাকতো, একদার ভুলটা শুধরে নেবার কল্পনাটা কি মনে আসতো আপনার?

বিরাম থেমে যায়। একটু পরে বলে, হয়তো এই কথাটা আপনার ভুল নয়, কিন্তু আমার অসীম ধৃষ্টতার একটাই উত্তর, আমি আপনার জীবনের সমস্ত বঞ্চনার ইতিহাস শুনেছি। আপনি তো অনেক কিছুই জানেন মনে হয়। এটাও অবশ্যই জানেন ঠকিয়ে পাগল, পঙ্গু রোগগ্রস্তের সঙ্গে বিয়ে আইনতঃ সিদ্ধ নয়।

ওমা তাই বুঝি? ভারতী সহসা আলোয় উদ্ভাসিত মুখে বলে, আইনের এসব মারপ্যাঁচ জানতাম না বাবা, এতদিন তাহলে একটা অসিদ্ধ বিয়ের পিছনে ভূতের ব্যাগার খেটে মরছি? ইস্!

বিরাম হতাশ ভাবে বলে, আপনি কি পণ করেছেন আমার সব কথাই ব্যঙ্গের হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন?

বাঃ তা কেন? আপনি এতবড় একটা মান্যগণ্য লোক! শুধু আমার ভাগ্যি—ঠাকুরের আমার সঙ্গে ঠাট্টার বহর দেখে ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে বলেই—

বিরাম জুতোর তলায় একটা খোলামকুচির টুকরো পিষে ঘসতে ঘসতে অন্যমনস্কের মত বলে, আপনাকে দেখে কী মনে হচ্ছে জানেন? যেন অশোক বনে সীতা। রাবণ আপনাকে ধরে এনে বন্দিনী করে রেখেছে—

ভারতী তাড়াতাড়ি পাদপূরণের মত বলে, যা বলেছেন! অন্ততঃ পার্শ্বরক্ষিণী হিসেবে যা একখানি চেড়ি আছেন! আপনি আমার ইতিহাস সংগ্রহ করতে তো অনেক খেটেছেন দেখলাম, আমার সেই চেড়িতুল্য ননদিনীর কথা শোনেননি?

না তা শুনিনি বটে! আর একটু যোগ হল।

আচ্ছা এখন তাহলে আপনি যোগ বিয়োগের অঙ্কটা কষুন বসে বসে, আমি যাই।

কেন? এখন বিকেল বেলা আপনার কী কাজ?

ওমা! কী কাজ দেখবেন? চলুন তাহলে, চলুন আমার সঙ্গে।

নাঃ! ওটা থাক। বিরাম এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বলে, আপনিই আমার বাড়ি আসবেন। আপনাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

ভারতী সহসা বাচালতা থামিয়ে স্থির চোখে বলে, আপনার কী ধারণা পুরুষ মানুষ যেমন ইচ্ছে করলেই ফেলতে পারে, তেমনি ইচ্ছে করলেই নিতে পারে?

না, এমন অভদ্র ধারণা আমার নেই—বিরাম গাঢ় স্বরে বলে, এ শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রেই! না বুঝে অসতর্কতায় খুব দামী একটা জিনিস ফেলে দিয়ে তারপর যে হায় হায় আসে, সেই হায় হায়ের মন নিয়েই আমি—

আপনি তো মাত্র বার তিনেক দেখেছেন আমায়। আমার কতটুকু জানেন আপনি?

হয়তো সামান্যই। বিরাম আরো গভীর গলায় বলে, তবু সেইটুকুই আমার কাছে অসামান্য।

ভারতী আর একবার হাসে। বাচাল হাসি নয়, যেন কৃপার হাসি। বলে, ওটা কালীর জঙ্গলের প্রভাব। কলকাতায় ফিরে গেলেই আজকের এই কথাটা মনে পড়ে ভীষণ হাসি পাবে আপনার।

যদি বলি তা নয়।

ভারতী স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, তা নয়? তাহলে তো ভাবতে বসতে হয়।

ভাবুন! আমার জন্যে একটু ভাবুন—বিরামসহসা ওর বাহুমূলে একটা নাড়া দিয়ে বলে ওঠে, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিন।

আচ্ছা ভাববো। ভারতী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র না করে শান্ত গলায় বলে, এবার যেতে দিন। আর বেশীক্ষণ দু'জনে মিলে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বেড়ালে, আশপাশ থেকে কিছু ভাবতে সুরু করবে—বলেই দ্রুত পায়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায়।

বিরাম সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বিরাম ওই অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া ছবিটার কথা ভাবতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ওর কথাই কি সত্যি? এই একটা অনভ্যস্ত পরিবেশে আর বিচিত্র পটভূমিকায় একটা অবাস্তব কল্পনা করছি আমি? আমার নিজস্ব পরিবেশে গিয়ে দাঁড়ালেই এ কল্পনা হাস্যকর মনে হবে আমার? কিন্তু তাই কী? ওর ওই শোচনীয় জীবনের জন্যে আমিই দায়ী এ যন্ত্রণা বোধটা কোথায় যাবে। আমার একটু আনুকুল্য পেলে এমন একটা চমৎকার মেয়ের জীবনের ছক পাল্টে যেতে পারতো।

মা বলেছিল একথা। মার সে কথাটাকে নস্যাৎ করেছিলাম আমি। কে ভেবেছিল সেই মেয়েটা তার দুঃখময় পরিণতি নিয়ে সহসা একদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে! নন্‌ম্যাট্রিক বলে ওকে রিজেক্ট করেছিলাম আমি। উচ্চ ডিগ্রীধারিণী আমার বৌদিদের দেখছি। স্বামীর পদমর্য্যদার গর্বে স্ফীত আর সর্বদা ফ্যাসান চর্চায় সীমিত সেই বিদূষীদের দেখলে তো আমার রীতিমত হাসিই পায়। আমার ডিগ্রী অনুশীলন কারিণী ভাইঝিদেরও দেখছি, কী আশ্চর্য রকমের জীবন বিমুখ। কথা শুনলে মনে হয় এইমাত্র পৃথিবীতে পড়লো।

অথচ তখন আমি ভাবী বধূর রূপ কল্পনা করতে শুধু ওই ডিগ্রীটার কথাই ভেবেছিলাম। ছুরির ফলার মত ধারালো, ইস্পাতের পাতের মত মজবুত, পুরুষের মত বেপরোয়া আর তীব্র আকর্ষণময়ী নারীর মত তীক্ষ্ণ এই মেয়েটার মত মেয়ে কি এর আগে দেখেছি আমি?

লতিকা বৌদি বলেছিল, দেখে না একবার, দেখলে তো ক্ষয়ে যাবে না? দেখো একবার, দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে। আমি সেকথা 'অমৃতং বাল ভাষিতং' বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, অথচ এখন ও যেন আমাকে তীব্র আকর্ষণে টানছে। ওকে যদি একটি সুখী সংসারী জীবনের মধ্যে ছন্দায়িত হতে দেখতাম, আমি কি এমন অস্থিরতা অনুভব করতাম? ও যদি অনাবৃত মুখে না বলতো, বৌ বটে, তবে ঘোমটা দিই না—তাহলে কি বিরাম উদ্বেল হয়ে ভাবতে বসতো, একে আমি কোথায় দেখেছি!

ও এই জঙ্গলের কোণে পড়ে আছে। ওকে ঠকিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর নিষ্ঠুর আত্মীয়রা ওকে নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে তাকিয়ে দেখেনি কোথায় ফেলছি আর ওর বর্তমান আত্মীয়রা, যারা বিবাহসূত্রে একটা পরিচারিকা জোগাড় করবার তালে সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছে তারা তাকে পরিচারিকার অধিক সম্মান দিচ্ছে না।

তথাপি ওর মুখে ওই উচ্চকিত তীক্ষ্ণ হাসি, ওই আলো ঝলমলে কৌতুকের হাসি, ওই বেপরোয়া উচ্ছল হাসি। তথাপি ওর মুখে বিষণ্ণতার লেশবর্জিত অকুণ্ঠিত ভাষা, ওর মুখে চমকে দেওয়া দুঃসাহসী ভাষা। কী অফুরন্ত প্রাণশক্তি থাকলে তবেই এমনটা সম্ভব!

ওই দুর্লভ প্রাণশক্তি এই শ্রীহীন ঐশ্বর্যহীন জীর্ণ পল্লী প্রান্তরে পড়ে থেকে অপচয়িত হতে হতে ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে ও নন্‌ম্যাট্রিক বলে? একটা দাম্পত্য সম্পর্কহীন বিবাহ প্রহসনের শিকার হয়ে ক্রীতদাসীর গ্লানিময় জীবনের মধ্যে সমাপ্ত হবে, একদা ওকে প্রবঞ্চনার জাল ফেলে কবলিত করা হয়েছে বলে।

অথচ দেশে আইনের প্রহসন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদের আইন। সে আইন কি কেবল ধনবতীদের জন্যে? পৃষ্ঠবল সম্পন্নাদের জন্যে? অসচ্চরিত্র অবিবেচক অভিসন্ধি-পরায়ণ পুরুষের জন্যে? তার নাম আইন? প্রগতি আসবে শুধু সিনেমার হাত ধরে? আলো ঝলমলে দোকানের হাত ধরে? বাহান্ন ঘর এক উঠোনের ফ্ল্যাট বাড়ির হাত ধরে? আর পীচের রাস্তা ধরে? সমাজে আসবে না? চিন্তায় আসবে না? জীবনে আসবে না? ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠে বিরাম।

দেয়াশিনী-মা তাঁর ছ্যাঁচাবেড়া আর মাটির ঘের ঘরের মধ্যে নির্জীবের মত শুয়ে পড়েছিলেন। ভরের দিন এরকম হয়। অথচ সূর্য্যাস্তের আগে জল খাওয়া নিষেধ। কার নিষেধ? হয়তো নিজের। হয়তো পূর্বতনীদের।

কিন্তু আজ সূর্য্যাস্ত হয়ে গেল, তবু পড়েই আছেন। ওই প্রথম

জলটা আসলে ভারতীই দেয়। যেখানে যে কাজই থাকুক ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় এসে একটা কচি ডাবের মুখ কেটে সামনে ধরে। কোনো কোনোদিন আগে থেকেই এসে গায়ে পায়ে হাত বোলায়।

ভারতী কেন এত করে? পাড়ায় তো আরো অনেক ভক্তিমতী মহিলা আছেন, নবীনা প্রবীণা। কেউতো সাহস করে এগিয়ে আসে না। ভাবতেই পারে না তারা। মা যেই ওঁর ওই আড়াই হাত উঁচু দরজাটার মধ্য দিয়ে টুক করে ঘরের অন্ধকারে ঢুকে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেন, লোকে তখনই সেই অলঙ্ঘ্য দরজার সামনে থেকে প্রণাম করে ফিরে যায়।

ও দরজা ঠেলে ঢোকবার দুঃসাহস ভারতীই অর্জন করেছে। আজও ঢুকলো। দাওয়া থেকে ডাবটা কেটে নিয়েই ঢুকলো। কারণ সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

দেয়াশিনী ওর পায়ের শব্দে তাকালেন, কিন্তু দেখা গেল না। বিঘৎ খানেক দৈর্ঘ্য প্রস্থ যে গবাক্ষটুকু ঘরের দেয়ালে বিরাজিত তার মধ্যে দিয়ে আর সূর্য্য রশ্মির শেষ কণিকাটুকুও ঢুকছে না। তাছাড়া চারিদিকে তো নিথর অরণ্যছায়া।

ভারতী অন্ধকারেই পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, মা ডাব কেটেছি।

দেয়াশিনীর নির্জ্জীব দেহে সহসা স্বরযন্ত্রটা তীব্র শক্তি পায়। কঠোর কণ্ঠে বলেন, পাকুড়তলায় ফেলে দাও গে।

পাকুড়তলায় ফেলে দাও গে। তার মানে রাগ অভিমান। ভারতী দেরী করে ফেলেছে তার শাস্তি। তার মানে ভারতীর সেই গোঁয়ার গোবিন্দ বরটা যা করে তাই করেছেন ইনি। ভারতী মনে মনে মৃদু হেসে বলে, ডাব জিনিসটা তো পাকুড়তলায় ঢালবার জন্যে নয়, গলায় ঢালবার জন্যে। গলা তো শুকিয়ে কাঠ মেরে গেছে।

দেয়াশিনী তীব্র গলায় বলে ওঠেন, থাক, খুব দরদ দেখানো হয়েছে। সেই হারামজাদা ছোঁড়াটার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল, কেমন?

ভারতী স্নেহে নম্র। ভারতী আদরে আহ্লাদী।

কিন্তু ভারতী এই সরাসরি আক্রমণে মুহূর্তে কঠোর হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ডাবটা রইল, ইচ্ছে হয় নিজের পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিও।

দেয়াশিনী ওকে চেনেন। কিন্তু এ রূপটা বোধহয় দেখেননি কোনোদিন। তাই ঈষৎ সন্ত্রস্ত হন। কে জানে হয়তো সত্যিই ঠর ঠর করে চলে যাবে।

অতএব উঠে বসে গলায় আবার নির্জীব সুর এনে বলেন, বড্ড দেমাক হয়েছে, না।

ভারতী কথা বলে না।

দেয়াশিনী আন্দাজে হাত বাড়িয়ে ওর কাপড়ের একটা অংশ চেপে ধরে বলেন, সত্যি বললেই বন্ধু বিগড়োয়। সত্যি করে বল দিকি ও আসেনি?

ভারতী সতেজ গলায় বলে, এসেছিলই তো, তাই তো দেরী হয়ে গেল।

ওঃ তাই! কী কথা হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে শুনি?

প্রশ্নটা যেন একটা ধাতব শব্দ নিয়ে আছড়ে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীও যেন ধাতব কঠিন হয়ে ওঠে। সেই কাঠিন্যের গলায় ভারতী বলে, তুমি তো অন্তর্যামী, জিজ্ঞেস করে জানতে হবে কেন?

অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না, ওই অদেখার মধ্যেই একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলে।

বলতেই বা আটকাচ্ছে কেন? ভয় করছে বুঝি?

কেন ভয় কিসের? আমার শরীরে ভয় দেখেছো কোনদিন?

কোনদিন দেখিনি আজ দেখছি। নাহলে বলছিস না কেন?

বলবার মত দরকারি নয় বলেই তুচ্ছ করছিলাম। ও বলছিল আমাকে এই জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

কণ্ঠস্বরটা খুবই তাচ্ছিল্যের শোনায়, তবু দেয়াশিনী যেন পায়ের তলার মাটি হারান। আর সেই হারানোর গলায় বলে ওঠেন, বটে! হারামজাদার মরণের পাখা উঠেছে বুঝি?

ভারতী আরো তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, উঠতে পারে। তার জন্যে

তোমার তো নিজের মরণটা ডেকে আনার দরকার নেই। শরীরের ওপর তো ডাকিনীনৃত্য হয়েছে সারাদিন, জলটা গলায় ঢাল।

রাখ্ তোর জল— দেয়াশিনী উঠে বসে হাতড়ে ওর হাতটা চেপে ধরে বলেন, তোর মরণ পাখা উঠেছে কিনা তাই শুনি। তুই কি জবাব দিলি ?

দেয়াশিনীর বলিষ্ঠ হাতের বজ্রমুষ্টির ভিতর ভারতীর কোমল হাতটা কঠিন হয়ে ওঠে, ভারতী ঠাণ্ডা গলায় বলে, জবাব দিয়েছি, ভেবে দেখি—

এই কথা বলেছিস তুই। দেয়াশিনীর গলাটা হাহাকারের মত শোনায়, এই তোর চরিত্রবল।

ভারতীর মুখটা দেখা যায় না, তাই বোঝা যায় না সে মুখ অপমানের আঘাতে লাল হয়ে উঠেছে, না আগুন হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতীর গলা আরো ঠাণ্ডা শোনায়, আমি কোনোদিন আমার চরিত্র-বলের বড়াই করতে বসিনি তোমার কাছে।

দেয়াশিনী আবার শুয়ে পড়েন। আবার হাত বাড়িয়ে ভারতীর একটা হাত আঁকড়ে ধরেন, আর কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে বলে ওঠেন, আমার গা ছুঁয়ে কথা দে তুই আমার একটা প্রার্থনা রাখবি।

প্রার্থনা! ভারতীর কাছে ওঁর প্রার্থনা। এই প্রার্থনার মধ্যে যেন কোন ভয়ঙ্করের ইসারা। যেন এ প্রার্থনা বলিরাজার কাছে বামন অবতারের ছলনাময় প্রার্থনা।

ভারতীর বুক কেঁপে ওঠে। তবু ভারতী সাহস সংগ্রহ করে বলে, লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা কেন ? আমার কাছে আবার তোমার কি প্রার্থনা ?

আছে আছে। আগে বল কথা দিচ্ছিস।

না শুনলে কী করে বলবো ?

না শুনলে বলবি না ?

বাঃ সামর্থ্য আছে কিনা দেখতে হবে তো ?

আমি বলছি, আছে। দেয়াশিনী যেন তাঁর সেই ভরের সময়ের মত আচ্ছন্নের গলায় কথা বলেন, তোরই আছে। এতদিন ধরে

যাচিয়ে যাচিয়ে দেখে এই আশা মনে পুষে আসছি। তোর মতন উপযুক্ত আর কোথায় পাব? সর্বসুলক্ষণা পূর্ণ যুবতী, কুমারী নয়, বিধবা নয়, বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পবিত্র সধবা অথচ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্করহিত। প্রবলা, কঠোরা, বন্ধ্যা নয় কিন্তু—

ভারতী ওঁকে একটা নাড়া দিয়ে বলে, বিজবিজ করে কী মন্তর আওড়াচ্ছ?

দেয়াশিনী সচেতন হন। যেন নিজের শক্তিতে ফিরে আসেন। দৃঢ়স্বরে বলেন, তোকে আমার পরে আমার আসনে বসতে হবে।

কী বললে? ভারতী যেন অজ্ঞাতসারেই সজোরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে ওঠে, কী বললে—তুমি?

যা বলছি ঠিকই বলছি। এতদিন ধরে তাই তিল তিল করে গড়ছি তোকে আমি। অমোঘ কণ্ঠ। কিন্তু ভারতী বুঝি ইস্পাতে তৈরী। তাই ভারতী তীব্র স্বরে বলে ওঠে, ওঃ! তাহলে এই অভিসন্ধিটি মনে পুষে তুমি আমায় ভালবাসার ভান দেখিয়েছ? স্নেহ মমতা ঘুষ দিয়েছো? ছিঃ ছিঃ! কেন আমি তা হতে যাব? দেয়াশিনী হতে আমার দায় পড়েছে

এত তীব্র এত কঠোর প্রতিবাদের জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিলেন না দেয়াশিনী। এমন অপমানিত কবে হয়েছেন তিনি? কালীর জঙ্গলের লক্ষ সর্প ফণা তুলে ওঠে, ভৈরবীর তপ্ত জিহ্বা প্রখরতায় শাণিত হয়ে ওঠে, বটে! এত অহঙ্কার!···সর্বনাশ করে ছাড়তে পারি তা জানিস?

ভারতী ওঁর কাছ থেকে একটু সরে আসে। ভারতী সহসা ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে ওঠে, সর্বনাশ? আমার সর্বনাশ? তুমি যে হাসালে! পথ ভিখিরিকে ডাকাতের ভয়?

ওঃ আমায় এত অপমান? বুঝেছি এ সাহস জুগিয়েছে তোকে ওই নচ্ছার হারামজাদা। বুকের পাটার জোরে যে মায়ের সম্পত্তিতে হাত দিতে এসেছে। মরবে, ওটা মরবে, তে-রাত্তির পেরোবে না। ভেবেছিলাম কিছু বলবো না, মায়ের খেলাটাই দেখি বসে বসে! তুইই বলালি। মায়ের কোপে তে-রাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে ও। চিনিস না তুই আমায়।

ভারতী উঠে দাঁড়ায়। চ্যালেঞ্জের সুরে বলে, আচ্ছা! দেখি মা পীরের কালী কেমন তোমার হাত ধরা পুতুল যে তোমার হুকুমে একটা নিরপরাধ লোককে মারেন।···খুব ভক্তি করতাম তোমার শক্তিকে, ধিক্কার এসে গেল। মরাকে বাঁচাবার ক্ষমতা নেই, জ্যান্তকে মারবার ক্ষমতা আছে? তা সে ক্ষমতার আবার বাহাদুরী কী? খুনে গুণ্ডার সঙ্গে তো তফাৎ নেই কিছু।···চললাম, আর আসবো না। চলেই যাব তোমাদের এই পাপের রাজ্য থেকে। বড়াই! শক্তির বড়াই! ভারি শক্তি! হুঁঃ! আজ পাঁচ বছর ধরে একটা অসহায় প্রাণীকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে রেখেছি, তার একটা আঙুল নাড়াবার ক্ষমতা তুমি করে দিতে পারনি। এখন একটা জলজ্যান্তকে মারবার বড়াই করতে এসেছো! চিনেছি, খুব চিনেছি তোমাকে।

উঠে যায়। তীরবেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে জঙ্গলে, জঙ্গল থেকে গঙ্গার তীরে। নাঃ কিছু শক্তি নেই ওঁর। জোরে জোরে হাঁটে ভারতী! এই কি সাধনভজন শুদ্ধচিত্ত? অভিসন্ধি সিদ্ধ হল না তো অভিশাপ! হুঁঃ।

তবু ওই তে-রাত্তির শব্দটা কী মারাত্মক। ধীশক্তির অধিকারিণী নয় হয়তো কিন্তু কুশক্তির অধিকারিণী হতে পারেন।

ভারতী কী করবে? সাবধান করে দিতে যাবে? বলবে, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, জঙ্গলে হাত দিলে মা সর্বনাশ করে ছাড়বেন! ও কী ওসব মানে? হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। তারপর? তে-রাত্তির! দূর সব বাজে, সব ফাঁকি। ভারতীকে পরবর্তী দেয়াশিনী করবার তালে উনি—চলে গেছে, সব ভক্তি শ্রদ্ধা চলে গেছে।

কিন্তু ভারতীর গুণ লক্ষণটা কী? সর্ব সুলক্ষণা পূর্ণ যুবতী, অথচ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্করহিত···বন্ধ্যা নয়, কিন্তু —

কই একথাটা তো এতদিন মনে পড়েনি ভারতীর! মনে পড়েনি সে বন্ধ্যা নারী নয়, তবু চির বন্ধ্যাত্বের ঊষর মরুভূমির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে তাকে।

কেন? কারণ ভারতীর মা ছিল না, বাপ ছিলনা, ভারতীর পায়ের তলায় মাটি ছিল না। তাই ভাবা হয়নি ভারতী রক্তমাংসে গঠিত

আস্ত একটা মানুষ, তার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকতে পারে, তার মাতৃত্বের আকাঙ্খা থাকতে পারে। কেউ ভাবেনি। শুধু কাজে লাগিয়েছে ভারতীকে। তাই ওই দেবীর ভৈরবীও ভেবে নিয়েছিলেন ওকে কাজে লাগাবেন।

কিন্তু এখন যদি কেউ পায়ের তলায় মাটি দেয়? এখন যদি কেউ ভারতীকে 'মানুষ' বলে গণ্য করে? যদি ভারতীকে একটা উজ্জ্বল জীবন দিতে চায়? স্বামী সন্তান সংসার! যেটা ভারতীর প্রাপ্য ছিল, শুধু গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে তার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

পড়ে যাওয়াকে যদি আবার সামনে পাওয়া যায়, কুড়িয়ে নেয় না লোকে?

ভোলানাথের জীবনে খাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু নেই বলেই হয়তো এত ঘনঘন খিদে পায়। আর নিজে নিজে নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই বলেই খিদে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন হয়ে ওঠে। যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অনুভূতি নিয়েই দেখা দেয় খিদেটা।

অতএব অসহিষ্ণুতাও আসে তার সঙ্গে! সেই অসহিষ্ণুতা বাড়তে বাড়তে আকাশে ঠেকলো। লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষের দেখা নেই। শনি মঙ্গল হলেই ওই ভৈরবীটাকে জল খাওয়াবার ছুতো করে বেরিয়ে যায়! কেন? তুই ছাড়া আর কেউ নেই ওর? তুই তো এই সেদিন এসেছিল, পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে কে খাইয়েছে ওকে? তুই? নিশ্চয় আর কিছু—

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রশ্নটা করে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতার অভাবে বালিশ ছোঁড়ে ভোলা চাটুয্যে। এতক্ষণ ধরে পেয়ারের মাকে ডাব খাওয়ানো হচ্ছিল, এই কথা বিশ্বাস করবো আমি? গোঁ গোঁ করতে থাকে ভোলা।

ভারতী বালিশটা না কুড়িয়েই দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত গলায় বলে, খাওয়াইনি তো!

খাওয়াসনি? লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ! তবে কী হচ্ছিল এতক্ষণ? জুটিয়েছিস বুঝি কাউকে? তার সঙ্গে—

ঠিক ধরেছ তো! ভারতী একটা টুলে বসে পড়ে বলে, ঘরে বসে বসে সব ধরে ফেললে? জুটিয়েছি। পরামর্শ করে এলাম তার সঙ্গে চলে যাবার।

সুষমা বাড়ি নেই, তাই ভোলানাথ আরো অসহায় বোধ করে, আর তাই আরো গোঁ গোঁ করে ওঠে, জানতাম জানতাম! তুই যে শিকলি কাটার তালেই আছিস তা আমার জানতে বাকি নেই। অলক্ষ্মী মেয়েমানুষরাই নষ্টচরিত্র হয়।

বাকি নেই! ভারতী ঝাপসা গলায় বলে, আমার চরিত্র টরিত্র সবই তুমি জেনে রেখেছো! আর আমি টের পাইনি!······হি হি হি, আমি কী বোকা গো! অথচ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে ভেবে আসছি ভৈরবী আমায় অহেতুক ভালবাসে, তুমি আমায় বিশ্বাস করে মর। ফাঁকি টাকি সব ফাঁস হয়ে গেল আমার, তোমার চোখে ধুলো দেওয়া হল না!···যাক, ফাঁসই যখন হয়ে গেল তো বলে রাখি আজ রাত্তিরেই চলে যাবো। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে ঘুমের আগে ঘরের সামনেটার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল বিরাম। নীচের রাস্তাটা যেন ঘুমিয়ে পড়ে আছে, একটি প্রাণীরও ছায়া নেই। শুধু বিরামের মধ্যেই অস্থিরতা। শুধু বিরামেরই ঘুম নেই।

ও বলেছে ভেবে দেখবে। ও যদি পাগল না হয় তো জীবনকে এইভাবে পাঁকে পুতে রাখাটাই শেষ সিদ্ধান্ত করবে না। আমি কি ওকে বোঝাতে পারবো না ওর জন্যে 'জীবন' অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বল জীবন, তপ্ত জীবন, সুখের জীবন!···

আমি আমার এই চিন্তাকে অশুচি বলি না, বরং ওকে ওর ওই অশুচি জীবন থেকে উদ্ধার করে আনাটাই শুচিতা। আমার পূর্ব-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই শুচিতা।

আমি আজ আবার জানালাম ওর সেই 'স্বামী' নামধারী বিকৃত জীবটা ওকে মারে। ওঠার ক্ষমতা নেই, হাতের জিনিস ছুঁড়ে মারে।

আর তার দিদি তাতে সাহায্য করে। হয়তো কোনদিন অসহ্য হয়ে আত্মহত্যা করে বসবে মেয়েটা। সব জেনে বুঝে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চলে যাবো ?

হঠাৎ দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বিরাম নীচের রাস্তায় চেয়ে।

ও কে ? বিরামের বারান্দার নীচে ও কে ? অমন দ্রুতভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে ? নিজেই চলে এসেছে তাহলে ? স্তব্ধরাত্রির সুযোগ ! কত অসহনীয়তার মধ্যে কাটাচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছে সেটা। ক' সেকেণ্ডে নীচে নেমে এসেছিল সে কথা জানে না বিরাম। হেঁটে না উড়ে ? নাহলে যে অনেকখানি ছুটে এসেছে তার থেকেও বেশী হাঁপাবে কেন বিরাম ?

এ কী ! আপনি !

এলাম ! আপনার কাছেই চলে এলাম !

কিন্তু এভাবে ! এমন সময়—

উপায় কী ? অপেক্ষা করবার সময় কোথা ? কে জানে এতক্ষণে ফর্সা হয়ে গেল কি না ! চলুন দিকি আমার সঙ্গে আপনাদের ওই নবীন ফার্মেসির অজিত ডাক্তারের কাছে। আপনার কথা ফেলতে পারবে না। আমাকে ভাগিয়ে দেবে।

কী বলছেন ! আমি তো ঠিক—মানে, ব্যাপারটা কী ?

ব্যাপারটা কী তাই বুঝতে পারেননি ? হায় হায় ! বাবু রাগ দেখিয়ে উপোস করে এখন গোঁ গোঁ করে মরতে পড়েছেন ! ইন্‌জেকশান একটা না পড়লে—সাতজন্মেও মরবে না, তবু নিত্যি 'মরা মরা' নাটক করা চাই। তাও বুঝতে পারছেন না ? হাঁ করে তাকিয়েই রইলেন ? আমার পরম পুজনীয় স্বামী দেবতাটির কথা হচ্ছে। সেই সিন্ধবাদের বুড়োর মত যিনি আমার স্কন্ধে চেপে বসে আছেন, আমাকে খেয়ে তবে যাবেন এই পণ নিয়ে। একটু তাড়াতাড়ি চলুন, দেখুন যদি ডাক্তারের হৃদয় গলাতে পারেন। নচেৎ একটা ওষুধ-টষুধই।··· আপনাকে জাগন্ত পাবো ভাবিনি। ভেবেছিলাম ঘুম ভাঙ্গাতেই অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তা ভগবান লোকটা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না—কী বলেন ? মাঝরাত্রে আপনাকে জ্বালাতন

করতে এলাম। কিন্তু কী বলব, ওর অবস্থা দেখে ভয়ে যখন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল তখন হঠাৎ আপনার মুখটাই মনে পড়ে গেল।……

বিরাম চলে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির গলায় বলে, শুনে ধন্য হলাম! কিন্তু ওই প্রায় জড় আধমরা জীবটাকে বাঁচিয়ে তুলে আপনার লাভ কী বলতে পারেন?

'লাভ?' হঠাৎ…ভারতী প্রায় সশব্দেই হেসে উঠে, এই সেরেছে। অত শক্ত প্রশ্নের উত্তর টুত্তর দিতে পারব না। তবে মানুষ কথাটার একটা মানে আছে তো? না কি নেই? না থাকলে আপনিই বা এই মাঝ রাত্তিরে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ডাক্তার বাড়ি ছুটছেন কেন?

মাকড়সা

ফিডিং কাপটা ধুতে যাচ্ছিল বন্দনা বারান্দার ওধারে, মুখোমুখি পড়ে গেল তিলকের। নিজেদের পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল তিলক। এমনই আসছিল, না কি মার সাড়া পেয়ে ইচ্ছে করে বেরিয়ে এল তা কে জানে।

মার মুখোমুখি হতেই বলল, দাঁড়াও, একটা কথা বলতে চাই।

তিলকের চেহারার তুলনায় গলার স্বরটা বড় বেশী কর্কশ লাগল, আর ওর কমনীয় কমনীয় লম্বাটে ছাঁদের মুখের গড়নের সঙ্গে কপালের কোঁচকানো কোঁচকানো ভঙ্গীটা খুব বেমামান দেখাল।

বন্দনার পরণে ধবধবে সাদা থান আর সাদা ব্লাউজ। বন্দনার চুলগুলো টান্ টান্ করে বাঁধা—বন্দনার পায়ে হাল্‌কা রবারের চটি বন্দনাকে ঠিক একজন নার্সের মত দেখতে লাগছিল। ওর হাতের ওই ফিডিং কাপটার সঙ্গে ওর চেহারাটা যেন বেশ মানান সই।

বন্দনা তার ছেলের ওই বেমানান ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ গলায় বলল, কথাটা কি খুব জরুরী? একটু দেরী করলে চলবে না?

তিলক তেমনি কর্কশ গলায় বলল, অনেকক্ষণ ধরে বলবার মত কিছু নয়, তোমার মূল্যবান সময় বেশী নষ্ট করব না, জানতে চাইছি— উনি আর কতদিন এবাড়িতে থাকবেন?

বন্দনার চোখের পাতাটা কি একটু কেঁপে গেল?

হয়ত গেল, হয়ত গেল না।

গলাটা তো কাঁপল না?

বন্দনা তো ছেলের ওই কুঞ্চিত ললাটের দিকে স্পষ্ট তাকিয়েই বলল, যতদিন না যাবার মত অবস্থা হবে।

সে অবস্থাটা খুব সম্ভব সহজে আসছে না?

বন্দনা তার ছেলের এই অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে পাথর হয়ে যেতে পারত, কিন্তু হল না। কারণ দুঃসাহসটা নিতান্ত আকস্মিক নয়। মাঝে মাঝেই যেন ঝিলিক্ দিচ্ছিল তার বড়ছেলের ওই সুকুমার

মুখের রেখায় রেখায়। তাই বন্দনা পাথর হল না, উত্তর দিতে পারল। বলল, না সহজে আর আসছে কোথা? এখনও তো জ্বরই ছাড়েনি।

তিলক বলেছিল, একটা কথা বলবে, কিন্তু তিলক আরো কথা বলল। কথার পিঠে কথা চালাল। বলল, জ্বরই বল, আর মানুষই বল সযত্নে আগলে রাখতে চাইলে ছেড়ে যেতে চাইবে কেন? না ছাড়াই স্বাভাবিক।

বন্দনা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় বলে, বাড়িতে অসুখ বিসুখের জন্যে তোমার কি পড়াশুনার খুব বেশী অসুবিধে হচ্ছে?

আমার কোন কিছুর জন্যেই পড়ার অসুবিধে হয় না। তিলক তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, আমি কুঙ্কুম নই।

তবে? বন্দনা একটা কাজ হতে নিয়ে এসেছিল এদিকে, তবু বন্দনা ছেলের সঙ্গে যেন ঠাণ্ডা লড়াইয়ে নামলো। তাই বারান্দার রেলিংটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, তবে বাড়িতে কে থাকল না থাকল তা নিয়ে অকারণ উত্তেজিত হচ্ছ কেন? রোগটা যখন ছোঁয়াচে নয়, রোগীর জন্যে কিছু খাটতেও হচ্ছেনা তোমাকে। তখন—।

তিলক এবার পালিশের খোলস ত্যাগ করে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, শুধু ওইটাই তো শেষ কথা নয়? একটা অসহ্য অবস্থাকে অবিরত সহ্য করে চলা নার্ভের উপর বড় বেশী চাপ পড়া নয় কি? বলতে পারো উনি কী সুবাদে এ বাড়িতে রাজ আদরে অবস্থান করছেন?

বন্দনার মুখ লাল টকটকে দেখায়।

বন্দনা যেন কথা খুঁজে পায় না। তবু সামলে নেয় বন্দনা। বলে, উনি তোমার পিতৃবন্ধু তিলক। উপকারী বন্ধু।

উপকারী! তিলক মুখটা বিকৃত করে।

তিলকের নাকের ডগাটা ফুলে ওঠে, আর চোখের কোণে আগুন ঝলছে ওঠে। তিলকের এবার মুখের চেহারার সঙ্গে গলার স্বরটা বেশ মানান সই দেখায়। তিলক বলে, অমন উপকারী আমার ঢের দেখা আছে। উপকারী! পিতৃবন্ধু! বন্ধু নিশ্চয়ই বাবার ওই একটিই

ছিল না ? আর তাদের মধ্যে দুঃস্থেরও অভাব নেই। আনো তবে সবাইকে ডেকে ডেকে। সেবা যত্ন করো।

বন্দনা ছেলের ওই বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, আমি যে কৃপায় বিগলিত হয়ে দুঃস্থ সেবার ভার নিয়েছি, এ ধারণাটা তোমার হল কেন হঠাৎ ?

তা একটা কোন অসঙ্গত অদ্ভুত আচরণের পিছনে তো কোন·যুক্তি থাকা দরকার ? তিলক যেন আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চায়। তাই কুশ্রী একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে, কৃপা যদি না হয় তো, বলতেই হয় লোভ। স্বামীর বন্ধুর সম্পত্তির লোভেই তাকে বাড়িতে এনে যত্ন আত্মি করছ।

বন্দনা কি আজ ছেলের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চায়। নচেৎ এমন অপমানকর কথাও গায়ে মাখে না ? বন্দনা ছেলের চোখের দিকে তাকায় তারপর কেমন যেন একটা দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের গলায় বলে, কৃপা ? লোভ ? এ ছাড়া আর কোনো কিছু থাকতে পারে না ? আর কোন হৃদয় বৃত্তি !

তিলক থতমত থায়।

তিলকের হঠাৎ মনে হয় ও যেন ওর মার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেল। যেন অর্জুনের মত ওর ঠিক মোক্ষম সময়ে তূণের তীর শূন্য হয়ে গেল। তাই ঝাঁ ঝাঁ করা কান মাথা নিয়ে শুধু 'ওঃ' বলে শরীরটায় তীব্র একটা মোচড় দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

বন্দনা একটুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে ফিডিং কাপটা নিয়ে ধুতে গেল।

বন্দনারও কানমাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল বৈ কি।

কিন্তু বন্দনাকে স্থির থাকতে হবে।

বন্দনা এমন এক অদ্ভুত বাড়িতে বাস করছে, যে বাড়ির ছাদ নেই। এমন এক অদ্ভুত নৌকোয় চেপে বসেছে, যে নৌকোর তলা নেই।

বন্দনাকে তার মধ্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বন্দনার ছেলে বন্দনাকে ঘৃণা করবে, তাচ্ছিল্য করবে, অপমান করবে, তবু বন্দনার উপায় নেই ছেলের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার।

ফিডিং কাপটা মুছে টেবিলে রাখল বন্দনা, পিছন ফিরে ঘরের জানালার পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল। পড়ন্ত বেলার সোনালি রোদটা ঘরে এসে ছড়িয়ে পড়ল।

বিছানায় পড়ে থাকা মানুষটা আস্তে ডাকল, শোনো।

বন্দনা আঁচল দিয়ে ভিজে হাতটা মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, কি?

রোগীর ক্লান্ত গলা আস্তে উচ্চারণ করল, কী বলছিল তিলক?

বলছিল—বন্দনার মুখটা ঈষৎ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল দেখাল। বলছিল, আমি তোমাকে বিষয় সম্পত্তির লোভে বাড়িতে এনে যত্ন আত্মি দেখাচ্ছি।

বাজে কথা থাক—রোগীর ক্লান্ত কণ্ঠ আরো ক্লান্ত শোনায়, কি বলছিল জানি। বলাই স্বাভাবিক। তিলকের জ্বালাটা আমি বুঝি। তাই তো তোমায় সমানেই বলছি বন্দনা আমায় ছেড়ে দাও!

বন্দনা ওই শয্যাগত শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। বন্দনা খাটের বাজুটা চেপে ধরে! বন্দনার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসির ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

বন্দনা যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের গলায় বলে, ছেড়ে দিলেই ছেড়ে দেওয়া হয়, এমন ধারণা আছে বুঝি তোমার?

শয্যাগত মানুষটার হাড়সার মুখেও বন্দনার মুখেরই আভাস ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে বলে, না সে কথা জোর করে বলতে পারবো না। কিন্তু এই জটিলতার জাল থেকে ওই বেচারী দুটোকে মুক্ত করবার উপায় যখন নেই, তখন নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে থাকাই ভাল বন্দনা।

বন্দনার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে। বন্দনা মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, তার জন্যে তোমার নিজের কোন আয়োজনের দরকার হবে কি? স্বয়ং বিধাতা পুরুষই তো সে ভার নিয়েছেন।

বিধাতা পুরুষ লোকটা হচ্ছে কুঁড়ের বাদশা, বুঝলে বন্দনা। সরকারি চাকরে তো? জানে চেয়ারটা ঠিকই থাকবে, তাই ফাইলে ধূলো জমায়। রোগা মুখে হাসে লোকটা।

বন্দনা ওর শীর্ণ শিরাবহুল একটা হাত চেপে ধরে বলে, থাক।

বিধাতা পুরুষের সমালোচনাটা বন্ধ করো। এভাবে এক সঙ্গে এত কথা চালালে কুড়ের বাদশার কাজটা তুমিই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

রোগীটার অবশ্যই একটা নাম আছে। বন্দনা সেই নাম ধরে না ডাকলেও এবং মানুষটা বহিঃজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকলেও নামটা ওর এখন জীবিতের খাতার এক কোণে পড়ে আছে। বন্দনার ছেলে-মেয়ে কোন কোন সময় ব্যবহার করে সেটা। বলে, সুহৃদ বাবু! বলে ব্যাঙ্গার্থে, তবে নামটা ওর ওই সুহৃদই।

অথচ ব্যাঙ্গার্থে বলাটা বন্দনার ছেলেমেয়ের নীচতা। নিতান্তই সুহৃদের কাজ করেছে ভদ্রলোক ওদের অসময়ে। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা ওদের মন থেকে মুছে গেছে। ওদের ওই সুহৃদের উপর আক্রোশ, ওদের ওই সুহৃদের জন্যে জ্বালা।

সুহৃদ সেটা বোঝে।

এবং সুহৃদ সেটা সহানুভূতির চক্ষেই দেখে।

তাই সুহৃদ এখানে বেড়াতে এসে জ্বরে পড়ে গিয়ে আটকে যাওয়া পর্যন্ত অবিরতই বলছে, আমায় ছেড়ে দাও বন্দনা। আমায় যেতে দাও!

বন্দনা ছাড়ছে না।

বন্দনা ছাড়বে কী করে ?

জ্বরও যে ছাড়ছে না লোকটাকে ?

কিন্তু এ জ্বর কি আর ছাড়বে ওর ?

জ্বরটা তো ওর সাময়িক একটা ঘটনা মাত্র নয়। ওটা উচ্চ আদালতের নোটিশ। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল লোকটার নামে, এবার উচ্ছেদের নোটিশ এসে গেছে!

সেই আসাটা সম্পর্কে ও অনবহিত নয়। নয় বলেই বন্দনার কথায় মৃদু হেসে বলে, আমি যদি একেবারে কথা বন্ধ করে জীবনী শক্তির অপচয় রোধ করতে থাকি, তাহলে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করব এই তোমার বিশ্বাস ?

শতবর্ষের বায়না আমি করতে বসিনি—

বন্দনা ক্রুদ্ধ অভিমানের গলায় বলে ।

আহা ওই হলো। কিন্তু বন্দনা স্পষ্ট করে বলো তো—মেয়েলি মায়ায়—রেখে ঢেকে বানিয়ে সাজিয়ে নয়, খোলা গলায় খোলা মনে বল—কথা কম কয়ে, সাবধানে সাবধানে থাকতে পারলে, আমি আবার বিছানা ছেড়ে উঠে ঘোরা ফেরা করব? কাজ কর্ম করব? বল, আছে তোমার এ আশা ?

বন্দনা চোখ নামায়।

বন্দনা মুখ ফেরায় । বন্দনা চুপ করে থাকে।

সুহৃদ নামের লোকটাই আবার কথা বলে। সুহৃদের গলায় বলে, জানি। জানি আমার এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেবার ক্ষমতা তোমার নেই, আর উত্তর আমার নিজেরই কাছে। আশা নেই। তবে বৃথা কেন আর ইচ্ছে করে তোমার এই গড়া ঘরটায় বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে? কেন একটা বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে রেখে দেবে নিজেকে?

বন্দনা এবার কথা বলে, গড়া ঘরে বিশৃঙ্খলা ডেকে এনে জীবনকে বিড়ম্বিত করা ত আমার এই প্রথম নয়। অভ্যাস আছে।

সেটা নিয়তি। তবু তখন আর একটা সমস্যা এত প্রবল ছিল না বন্দনা। এখন তিলক কুঙ্কুমের কথা আগে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছে, ভাললাগা মন্দলাগা। আমাকে নিয়ে লোক সমাজে ওদের মাথা হেঁট হচ্ছে, ওদের সম্ভ্রম আহত হচ্ছে। আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে ।

সব ঠিক হয়ে যাবে? বন্দনা মৃদু হাসে, এই তোমার বিশ্বাস?

বিশ্বাস না হোক, আশা ।

ওঃ আশা। বন্দনা নির্লিপ্ত গলায় বলে, আশা তরুর মূল নেই। আমারও তো কত আশা তোমায় নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে বেড়াতে যাবো, তোমাকে সারিয়ে তুলব—

সেটা তো তোমার ওই বিধাতা নামের লোকটার ইচ্ছাধীন ।

সবই প্রায় তাই। সন্তানই দ্বিতীয় বিধাতা। ওরাই পারে আলো জ্বালতে, ওরাই পারে অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। বন্দনা বলে,

আমার অনেক অলৌকিক আশা আছে, কিন্তু আশা নেই যে, তুমি চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার ছেলে মেয়ে তাদের ফাটা কাঁচ জুড়ে ফেলে দাগ নিশ্চিহ্ন করে ফেলে সুন্দর হবে স্বচ্ছ হবে ।

বন্দনা, বেশী কথা তুমি বলতে বারণ করেছ, বলবার ক্ষমতাও নেই, তবু বলি—কিছু তো হবে। এই অসহ্য দৃশ্যকে যে ওরা সহ্য করতে পারছে না, তা বুঝতে পারছ তো? তবে কেন সেই দৃশ্যের জের টেনে চলব আমরা?

তাহলে কি করতে বল?

সেটাই তো গোড়া থেকে বলছি বন্দনা। হাসপাতাল বলে যখন একটা জায়গা রয়েছে—

ওঃ হাসপাতাল! তা বটে!

বাঃ ওতে আপত্তি করলে চলবে কেন? সুহৃদ মৃদু হেসে বলে, অভাগাদের ওইটাই তো শেষ গতি।

বন্দনা এই প্রসঙ্গের মুখোমুখি আসতে ভয় পায়, বন্দনা ঘরের এই ভারী আবহাওয়াকে তাড়িয়ে দিতে যায়! তাই বন্দনা সহসা হেসে উঠে বলে, তাছাড়া শেষটাকে তরান্বিত করে আনবার পক্ষে এমন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিই বা আর কী আছে?

ওটা তোমার ভুল ধারণা বন্দনা—সুহৃদ আস্তে বন্দনার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলে, হাসপাতাল মাত্রেই খবরের কাগজ বর্ণিত সেই নারকীয় কাণ্ড সম্বলিত জায়গা নয়। ভাল ভাল হাসপাতালও আছে।

বন্দনা আবহাওয়ার শেষ ভারটুকুও তাড়াতে চায়। তাই তরুণী সুলভ পাতলা হাসি হেসে উঠে বলে, তা অবশ্য। স্বর্গও আছে। সুন্দরী। সুন্দরী অপ্সরার হাতের সেবা, রয়েছে যখন।

সুহৃদের হাসির শব্দ পাওয়া যায়না, কিন্তু বন্দনার সেই চেষ্টা করে হেসে ওঠা হাসির শব্দটা ঘরের দেওয়াল ভেদ করে পাশের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। আছড়ে পড়ে একটা কাঁচের বাসন ভাঙা ধারালো কাঁচের টুকরোর মত।

সে ঘরে কুঙ্কুম পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। হাসির শব্দটা তার সমস্ত গায়ে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিল।

বইটা ধপাস করে বন্ধ করে টেবিলে ফেলে রেখে ও তার পাশের ঘরটায় গিয়ে ঢোকে। বাড়িখানা বড় নয়, ঘর ছিল মাত্র দুটো। প্রয়োজনের ছুরিতে চেরাই হয়ে দু'খানা ঘর চারখানায় পরিণত হয়েছে।

তিলক আর কুঙ্কুম তাই এক একখানি ঘরের অধিকারী।

কুঙ্কুম তিলকের ঘরে ঢুকেই হঠাৎ তীর ছোঁড়ার মত করে বলে ওঠে, দাদা বাড়িতে তাহলে এই রকম চলতেই থাকবে?

তিলক কিছুক্ষণ আগের তিক্ততা পরিপাক করছিল বসে বসে। সেই অর্ধ-পরিপাক করে নেওয়া স্বাদটাই আবার ঘুরিয়ে উঠে তার জিভে উঠে আসে।

থাকবেই। যতক্ষণ না উনি গত হবেন।

কুঙ্কুম তীক্ষ্ণ হয়, সেই অপেক্ষায় দিন গুণতে হবে বসে বসে?

না বসে থাকলেও পারি। চলে গেলেও পারি। তবে এটা জানবি আমরা চলে গেলেও, মা ওঁকে চলে যেতে দেবেন না। আমাদের থাকা না থাকায় আমাদের মার কিছুই এসে যাবে না।

তা আমরাই বা খামোকা চলে যেতে যাবো কেন? কুঙ্কুম বলে ওঠে, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার বোকামী করে লাভ আছে কিছু? আমাদের পরম সুহৃদটিকে কি করে ভাগানো যাবে সেটাই চিন্তা করে বার কর।

চিন্তা করবার কিছু নেই—তিলকের কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে, তিলকের বয়েস যে মাত্র বাইশ, এটা ওকে দেখে বোঝা যায় না। তিলক সেই স্ফীত শিরা ললাটে বুড়ো আঙুলটা টিপে ধরে কড়া গলায় বলে, একখানি এ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনে সোজা কোন হসপিটালে চালান করে দেওয়াই হবে একমাত্র পথ।

মা যেতে দেবেন?

ব্যঙ্গ হাসি হাসে কুঙ্কুম।

দিতে বাধ্য করতে হবে—তিলক বলে, কে বলতে পারে এই জ্বর ওঁর কিসের? বাড়িতে উনি টি. বি-র জার্ম ছড়াচ্ছেন কিনা তার ঠিক আছে কিছু? অথচ মা সেটা চিন্তা করছেন না। কে বলতে পারে

ডাক্তারকে হাতে করে রোগটাকে হার্টট্রাবল বলে চালাচ্ছেন কিনা। যেহেতু সেটা সংক্রামক নয়, অতএব রোগীকে সযত্নে ঘরে পুষে রাখতে পারো। অসহ্য।

তিলক সেই অসহ্যটাকে প্রমাণ করতে চেয়ার থেকে উঠে ঘরে পায়চারি করতে থাকে।

আমি গিয়ে ওঁকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে বিদায় করতে পারি। কুঙ্কুম ক্রুদ্ধ গলায় বলে, বলতে পারি যখন শিশু ছিলাম, অবোধ ছিলাম, রাংতা মোড়া চকোলেট ঘুষ দিয়ে আপনি আপনার অসভ্যতাকে রাংতা মুড়ে রেখেছিলেন, কিন্তু এখন আর সেটা চলবে না।

সে ভাবে বললে—তিলক টেবিলের কাছে সরে এসে তার কোণটা চেপে ধরে বলে, সে ভাবেই বা কেন, সাধারণ ভাবেই আপনি থাকায় আমাদের অসুবিধে হচ্ছে বললেও হয়ত উনি চলে যেতে চাইবেন। কিন্তু আমাদের শত্রু আমাদের ঘরে।

কুঙ্কুম দাদার খাটটার উপর বসে পড়ে, চারিদিকে তাকায়। ছিমছাম সাজানো পরিপাটি ঘর, সুন্দর পর্দা সুন্দর বেডকভার, সৌখিন চেয়ার টেবল বুক-সেলফ। কুঙ্কুমের নিজের ঘরটিও এই একই ছাঁদের। ছোট ঘর, কিন্তু সুন্দর ঘর, নিজস্ব ঘর।

কম বয়স থেকেই এ তারা পেয়ে আসছে, এইতেই তারা অভ্যস্ত। শুধু আগে খেয়াল ছিল না, কিসের বিনিময়ে পাচ্ছে এসব।

জ্ঞানের উন্মেষ থেকে মাঝে মাঝেই একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা অনুভব করেছে কুঙ্কুম এবং সেই ভয়ানক সন্দেহটাকে ঠেলে সরিয়েছে, চোখ বুজে অস্বীকার করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ আর চোখ বুজে থাকা যায়নি, তারপর সব উদ্ঘাটিত হয়ে গেল তাদের বাড়ির 'দৈবাতের অতিথির' হঠাৎ এখানে এসে জ্বরে পড়ার ছুতোয় শেকড় গাড়ায়। মা এখন চক্ষুলজ্জাহীন হচ্ছেন, দুঃসাহসী হচ্ছেন বেপরোয়া হচ্ছেন। অথচ আগে ?

আগে মার কী ভয় ভয় ভাব ছিল।

সুহৃদ চন্দ্র যখন হঠাৎ এক আধ দিনের জন্যে তাঁর কোলিয়ারি থেকে এসে উদয় হতেন, মা যেন তাঁকে ভাগাতে পারলেই বাঁচতেন।

আর উনিও মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেন না। একবেলা দু'বেলা যা থাকতেন তিলক আর কুঙ্কুমকে নিয়ে বেড়াতেন, গল্প করতেন, দু'হাত ভরে জিনিস কিনে দিতেন।

মা ওদের কাকা বলতে শেখাননি, (বাবার বন্ধুকে সাধারণতঃ যে সম্বোধন করে থাকে লোকে।) শিখিয়েছিলেন, কোলিয়ারি সাহেব।

অদ্ভুত এই ডাকটাই ডেকে এসেছে তারা বরাবর ওই লোকটাকে। তখন ভাবেনি এটা আবার কি।

বড় হয়ে আর ডাকেনি। অপ্রবৃত্তি এসেছে। এবং কোলিয়ারি সাহেবও কোলিয়ারি থেকে হঠাৎ হঠাৎ এসে উদয় হওয়া কমিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু প্রথম প্রথম, যখন জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত ছিল, তখন বরং মনে হতো কই কোলিয়ারি সাহেব তো অনেক দিন আসেননি! একটু যেন শূন্যতাই বোধ হতো!···

যা কিছু অভাব যা কিছু প্রয়োজন তার তালিকা জমিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল কিনা ওদের কোলিয়ারি সাহেবের আসার অপেক্ষায়।

ইস কী লজ্জা! কী ঘৃণা।

চিন্তাটা সশব্দে উচ্চারণ করে ফেলে কুঙ্কুম। ভাবলে নিজেদের উপর ঘৃণা হয়, আমরা ওঁর আসা পথ চেয়ে বসে থাকতাম, আবদার করে জিনিস আদায় করতাম, ট্যাক্সী চড়ে দেদার বেড়িয়ে নিতাম।

আমরা নয়—তিলক ওই রা শব্দটার উপর জোর দিয়ে বলে ওঠে, আমরা নয়, তুমি! আমি কোনদিনই ওঁর গায়ে পড়তে যেতাম না। তুমিই একেবারে—

কথাটা তিলকের হয়তো খুব ভুলও নয়। তার যেন লোকটার প্রতি বরাবরই বিরূপতা। তবু বেড়াতেও ছাড়তো না নিতে টিতেও কুণ্ঠিত হতো না। শুধু বিগলিতটা কম হতো। কুঙ্কুমের মত গলে দ্রব হয়ে গড়িয়ে পড়ত না।

কুঙ্কুম বলে ওঠে, অজ্ঞানে যা করেছি, তার জের টেনে চলতে পারা যাচ্ছে না আর! এটাই হচ্ছে কথা। এই তোকে বলে রাখছি দাদা, তুই যদি বলতে না পারিস, আইন আমিই হাতে নেব।

হঠাৎ দরজায় ছায়া পড়ে।

বন্দনা এসে দাঁড়িয়েছে।

বন্দনা ওদের কথার শেষাংশ শুনেছে। তাই বন্দনা বিষণ্ণ গলায় বলে, তোরা হঠাৎ এমন নীচ হয়ে যাচ্ছিস কেন বলতে পারিস ?

ওরা চমকে ওঠে।

তিলক আর কুঙ্কুম।

ওদের ধারণা ছিল, মা তাঁর সুহৃদকে নিয়ে নিমগ্ন আছেন। তা ছাড়া বন্দনার গলার যদি তীব্রতা থাকতো, যদি ধিক্কার থাকতো, তাহলে হয়তো ওরাও ধিক্কার দিয়ে উঠতো। ওরাও তীব্র হতো।

কিন্তু বন্দনার গলায় বিষণ্ণতা।

বন্দনা বলছে, তোরা হঠাৎ এমন নীচ হয়ে গেলি কেন বলতো ?

যেন ওদের হৃদয়বত্তার কাছে বিষণ্ণ আক্ষেপ !

কুঙ্কুম একটু থতমত খায়। কিন্তু তিলকের ধাতু কঠিন। তিলক বলে ওঠে, অবাক হচ্ছো বুঝি ? বুঝতে পাচ্ছনা কেন নীচ হচ্ছি ?

সত্যিই পাচ্ছিনা তিলক—বন্দনা বলে, একটা মৃত্যুপথ যাত্রী—রোগী। যে নাকি চিরদিন তোদের উপকার করেছে, তার গোণা দিন কটাকে একটু যত্ন একটু সেবা দিয়ে সহনীয় করে তোলার বিরুদ্ধে এত বিষ জমাচ্ছিস কেন ? ও আর ক দিন ? মনে কর পথ থেকে এক মুমূর্ষু রোগীকে তুলে এনে সেবা করছিস !

কুঙ্কুম এবার কথা বলে।

তীক্ষ্ণ গলায় বলে, মনে করে কোনো কিছু করা খুব সহজ নয়। তাছাড়া তুমিই মনে করে দেখ, রাস্তার ভিখিরিকে নিয়ে এসে তুমি তাকে এইভাবে রাজ আদরে নিজের শোবার ঘর ছেড়ে দিয়ে সমারোহে চিকিৎসা করাতে কিনা।

যা হচ্ছে ওর নিজের টাকাতেই হচ্ছে কুঙ্কুম।

হতে পারে—কুঙ্কুম তুচ্ছ গলায় বলে, কার টাকায় কি হচ্ছে তা জানতে যাচ্ছে না কেউ মা। তুমি যা বলবে, তা বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতে পারি, আর কেউ হবে না। লোকে এটাই দেখবে একটা নিঃসম্পর্ক লোক এ বাড়ি থেকে তার যা প্রাপ্য নয়, তা পাচ্ছে।

লোকেরা অন্ধ নয়, নির্বোধ নয়, যে তার কারণ না খুঁজে উদাসীন থাকবে।

বন্দনার মেয়ে কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী, বন্দনার মেয়ে ডিবেটিংয়ে ফার্স্ট হয়, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়। কাজেই ভাষার উপর তার দখলটা ভাল।

কিন্তু এখন বন্দনা তার মেয়ের সেই ভাষার কারুকার্যে মোহিত হল না। বন্দনা যেন বিহ্বল হল। বন্দনা সেই বিহ্বলতার গলায় বললো, নিঃসম্পর্ক।

তা ছাড়া আর কি বলা হবে? কুঙ্কুম দাঁতে দাঁতে পিষে বলে, বাবার বন্ধু এটা একটা সামাজিক সম্পর্ক নয়। বিশেষ করে বাবা যখন নেই।

শুধু এই? বন্দনা যেন তাঁর মেয়ে ছেলের বিস্মৃতির পরিচয়ে দিশেহারা হন, তোমাদেরও একজন উপকারী বন্ধু নয়? তোমাদের চরমতম অসময়ে উনি তোমাদের দেখেননি? কে তোমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে? কে তোমাদের এত বড় বড় বলবার উপযুক্ত শক্তি জুগিয়েছে? কে তোমাদের বড়লোকের মত করে মানুষ করেছে?

প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়েছিল কুঙ্কুমের মুখের দিকে, কিন্তু উত্তর দিতে এগিয়ে এল তিলক। চড়া গলায় বলে উঠলো, সেটা দেখবার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের—

বন্দনা হঠাৎ হাত জোড় করে।

ব্যাকুল ভাবে বলে, দোহাই তোমার তিলক। যা বল বল, একটু আস্তে বলো! হাত জোড় করছি তোমার কাছে।

তিলক অবশ্য গলার স্বরটা নামায়। কিন্তু সেই নামানো স্বরটা যেন চাপা গর্জনের মত শোনায়।

ঠিক আছে। তর্ক করবার ইচ্ছে আমার নেই, আর কেন উনি অসহায় আমাদের জন্যে এতখানিটা করেছিলেন, সে প্রশ্ন তোলবার ইচ্ছেও নেই। তুমি আমাদের এই ভাবেই বুঝিয়েছ যেন আমরা আমাদের বাবার টাকাতেই মানুষ হচ্ছি। বাবার বন্ধুর প্রতি চিরদিন সকৃতজ্ঞ থাকতে হবে আমাদের, এমন নির্দেশ দাওনি তুমি আমাদের।

না তা দিইনি, বন্দনা মৃদু উদাস গলায় বলে, ভেবেছিলাম সে শিক্ষা দিতে বসলে ছোট থেকে তোমাদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা জাগবে, হয়তো হ্যাংলা হয়ে উঠবে তোমরা, তাই সেই ভাবেই বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু বড় হয়ে কি বোঝনি?

তা বুঝেছি বৈকি। তিলক হিংস্র গলায় বলে। বড় হয়ে শুধু ওইটুকু কেন, আরো অনেক কিছুই বুঝেছি। কিন্তু থাক, ও নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্তি নেই মা আমার, তবে আমিও তোমার কাছে হাত জোড় করছি, এই অসহনীয় একটা অবস্থা থেকে মুক্তি দাও আমায়। যদি ওঁর থাকাটাই বেশী দরকার হয়, বাধ্য হয়ে আমাকেই—

এবং আমাকেও—কুঙ্কুম বলে, আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে মা।

বন্দনা তাঁর ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়। এমন সুকুমার গড়নের মুখে ওই হিংস্র ভাবটা কী বেমানান।

বন্দনা ওর চরমতম দুঃসময়ে যার অযাচিত করুণা মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছিল, বন্দনা যার অবিশ্বাস্য মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে নিজের সমস্ত অহমিকা আর সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, বন্দনা যার কাছে দু হাত ভরে নিয়েও কুণ্ঠিত হবার খেয়াল করেনি, সেই মানুষটাকে তার ছেলেমেয়েকে বাজার চলতি কাকা মামা সম্বোধন না শিখিয়ে শিখিয়েছিল কোলিয়রি সাহেব বলে ডাকতে।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কোলিয়ারি আছে তার বড় বড়, পয়সা আছে প্রচুর, অথচ ঘরে আপন বলতে কেউ নেই।

পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে মস্ত একটা মূল্য দিয়ে বন্দনার দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে, তিলক আর কুঙ্কুমকে প্রাণের পুতুল করেছিল।

তখন এই তিলক আর কুঙ্কুম কোলিয়ারি সাহেব বলতে অজ্ঞান হতো!

হতো, কারণ তখন তাদের জ্ঞান বস্তুটা ছিলই না। কিন্তু এখন সেটা হয়েছে। তাই ওরা সেই পরমপ্রিয় মানুষটাকে তার মৃত্যুশয্যা সমেত টান মেরে ফেলে দিতে দ্বিধা করছে না।

আশ্চর্য পৃথিবী।

আর আশ্চর্য হচ্ছে ভালবাসার ভঙ্গুরতা।

অতখানি ভালবাসা এমন নিঃশেষেও মুছে যায়।

ছেলেমেয়েদের ধিক্কার দিতে গিয়ে থমকালো বন্দনা। তারপর ভাবলো ওদের দোষ দিচ্ছি কোন মুখে? ওরা তো আমারই গর্ভজাত।

আমি ওই ভালবাসা বস্তুটাকে কতটা মূল্য দিয়েছি।

বন্দনা লজ্জিত হলো।

বন্দনা আরো বিষণ্ণ হলো।

বন্দনা খুব নরম গলায় বললো, ওর তো দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই কটা দিনের জন্যে জায়গা দেওয়া যায় না? মৃত্যুই তোমাদের ভারমুক্ত করে দেবে।

কিন্তু বন্দনা এতখানি করুণা ছড়িয়েও ছেলের মন নরম করতে পারে না। কার মত হয়েছে ও? বাপের মত তো নিশ্চয়ই নয়। তবে মায়েরই মত। বন্দনার মধ্যেও তো ওই ভয়ঙ্কর অনমনীয়তার কাঠিন্য।

বন্দনা তো নিজে জানে সে কথা।

বন্দনা অতএব অবাক হয়না যখন তার ছেলের মুখ থেকে অমোঘ অনমনীয় সুরে বেরোয়, সেটাই কি খুব বাঞ্ছনীয়? বরং ওইটাই এড়ানো দরকার। মৃদু ব্যঙ্গের হাস্যে বলে, অবশ্য অবস্থাটা যদি সত্যিই মুমূর্ষু অবস্থা হয়। তাহলে বাড়িতে একটা মৃত্যুর হাঙ্গামা ইচ্ছে করে ডেকে আনার কোনো মানে হয় না। এমনিতে আছেন তো আছেন, এখানে মারা গেলে কত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে সে ধারণা তোমার আছে? পাড়ার লোককে কী জবাব দেবে তুমি? কী জবাব দেবে আত্মীয় স্বজনকে?

আত্মীয় স্বজন? বন্দনা প্রায় হাসির মত করে বলে, আমাদের কত আত্মীয় স্বজন আছে তিলক?

তিলক চড়া গলায় বলে ওঠে, হয়তো বেশী নেই, কিন্তু কেন নেই সে প্রশ্ন নিজেকেই নিজে কোরো।

কথা যদি তুললেই তিলক, বন্দনা স্থির গলায় বলে, তাহলে বলি যখন আমি একটা মস্ত বিপদে পড়লাম, যখন তোমার বয়স মাত্র ছয় আর কুঙ্কুমের বয়েস পাঁচ, তখন তো আমার নিজেকে প্রশ্ন করবার

মত কোনো কারণ ঘটেনি, তখন তোমাদের কোথাকার কোন আত্মীয় এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল? কেউ না, কেউ না। অথচ অবস্থা এমন যে পথে দাঁড়াতে হবে, তখন তোমাদের উনি খবর পেয়ে কোলিয়ারি থেকে এসে দাঁড়ালেন। সেই দাঁড়ানো আজও অব্যাহত আছে। এ ঋণের—

দোহাই মা, আবার তোমার কাছে হাত জোড় করছি—তুমি আর ঋণ শোধের কথা তুলো না। আমাদের অজ্ঞান কালে তুমি যদি আকণ্ঠ ঋণ করে বসে থাকো, সে দায় আমাদের নয়। বাঁচবার কী দরকার ছিল আমাদের, বলতে পারো? এই পৃথিবীর কী ক্ষতি হত যদি আমরা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম? যদি তুমি আমাদের ঠাকুমা দিদিমার মত হিন্দু বিধবার জীবন যাপন করে কাটিয়ে দিতে? তা নয় তুমি আধুনিক জীবনকে লুফে নিলে। তুমি ছেলে মেয়েদের দামী করে মানুষ করতে বসলে, তুমি ঘর বাড়ি যেমন ছিল তেমনি সাজিয়ে বসে থাকলে। আর এই সমস্তই করলে ভিক্ষের পয়সায়। আর এখন বলছো—এই ভিক্ষের ঋণ তোদের শোধ করা উচিত! আমি চীৎকার করে বলবো—না নেই—উচিত! কেন? কেন হবে উচিত?

তিলকের কপালের শিরাটা আবার ভীষণ ভাবে ফুলে ওঠে, তিলকের গলার স্বর অজানিতে চড়ে ওঠে, আমি এই সাফ কথা বলে দিচ্ছি এর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।

ইউ আর রাইট, হঠাৎ দরজার কাছে একটা কাঁপা কাঁপা গলা ওই কথাটা বলে ওঠে, তিলক ঠিক বলেছে, তিলক—

এ কী! তুমি! উঠে এসেছ?

বন্দনা বড় একটা মোচড় খেয়ে ছুটে বেড়িয়ে আসে, ওই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে ধরে ফেলে তীক্ষ্ণ চীৎকারে বলে ওঠে, তুমি কি একটা সর্বনাশ ঘটাতে চাও? তিলক—ধর, ধর এসে, আমি ধরে রাখতে পারছি না।

বাস্তবিকই পারা সম্ভব নয়।

যতই রোগজীর্ণ হোক তবু একটা পুরো মাপের পুরুষ দেহ, আর

সেটা নিজের উপর সমস্ত কণ্ট্রোল হারিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাচ্ছে এলিয়ে।

পৃথিবীটা আশ্চর্য বৈকি।

আর ততোধিক আশ্চর্য মানুষ।

নইলে বন্দনা তার এই অসহায় মুহূর্তে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে ওঠে, তিলকের নাম করে। যে অসহায় মুহূর্তটা ডেকে এনেছে তিলকই।

কিন্তু তিলক কি মার সেই আর্ত চীৎকারের মান রাখলোনা? সে কি ভাবল ওকে রক্ষা করতে আমার বয়ে গেছে? ওকে ছুঁতে আমার ঘৃণা।

ভাবতে পারতো।

সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

কোন দেশে কোন সমাজে, কোন উদার চিন্তায় যুবক পুত্র তার মার অবৈধ প্রণয়ীকে সহ্য করতে পারে?

পারে না।

তবু আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলো।

হয়তো এমন আকস্মিক বলেই—সমস্ত তিক্ত বিরূপতাকে ছাপিয়ে উঠলো তার সহজাত মানব ধর্ম।

তিলক লাফিয়ে এসে ধরল, ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়েও দিল, এবং ডাক্তারকেও খবর দিল। কিন্তু তারপর আর প্রশ্ন করল না। কেমন আছেন উনি?

অনেক পরে খেতে বসে কুঙ্কুম বললো, ওভাবে উঠে আসাটা খুব অন্যায় হয়েছে ওর! এত যখন দুর্বল! কেমন আছেন এখন?

বন্দনা মেয়ের ওই নির্লিপ্ত মুখের দায় সারা প্রশ্নের জবাবে শুধু বলল, ভাল। আর তখনই বন্দনা স্থির করল হাসপাতালেই দেবে। টাকার তো অভাব নেই ওর, ভাল নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করতে বলি ডাক্তারবাবুকে। এখানে আমি আগলে রাখতে চাইলেও আমার সাধ্য কতটুকু? একটু বাড়াবাড়ি হলেই তো আমার ওই ছেলেমেয়েদের শরণাপন্ন হতে হবে? হঠাৎ কোন অবস্থান্তর দেখলে তো আর্তস্বরে

তাদের নাম করেই চেঁচিয়ে উঠতে হবে? আর—আর ভাবতে গিয়েও ঠোঁট কেঁপে উঠল বন্দনার—আর মারা গেলে ওদের পায়ে ধরেই তার শেষ গতি করতে হবে !

নাঃ। এ অপমান থেকে মুক্তি দেব নিজেকে। মনে করেছিলাম, ওর জন্যে সব সইতে পারবো, লজ্জা, অপমান, ধিক্কার ! কিন্তু দেখছি ভাবাটা যত সহজ বাস্তবে সেটা করা তত সহজ নয়।

আমার সেই পরিতৃপ্তির দামে ওকে বিকোব কেন? ওকে কেন ফেলে রাখব এই অহরহ অপমানের মধ্যে ?

ওর আর কেউ কোথাও না থাক, টাকা আছে। আর টাকাই তো সব কিছু। স্ত্রী পুত্র, বন্ধু, আত্মীয়, বশংবদ ভৃত্য !

হয়তো কথাটা সত্যি।

তবু এটাও পরম সত্যি, শুধু টাকাই আছে ওর আর কেউ নেই। ওর মা বাপ মরেছে বাল্যে, ওর ভাই বোন বলে কিছু ছিল না, ওর জ্ঞাতি গোত্র বলতে কেউ নেই।

কিন্তু স্ত্রী ?

যেটা জন্মসূত্রে পাওয়া নয়, যেটা আহরণ করে নেওয়ার !

তা সে স্ত্রীও নেই ওর।

কিন্তু কেন ?

এত অর্থ আহরণ করবার সময় পেয়েছে, আর একটা স্ত্রী সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি? অপচয় করেছে জীবনকে? পার করে ফেলেছে যৌবন? না কি বৌ মরেছে?

নাঃ তা নয়।

বন্দনা জানে ওর সব খবর। ও মৃতদারও নয়, অকৃতদারও নয়। রগরগে ঝকঝকে বৌ একটা ছিল ওর, সে বৌ ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অনেক অনেকদিন আগেই গেছে।

কয়লা খনির নীরন্ধ্র অন্ধকার পরিবেশ তাকে অস্থির করে তুলেছিল, তার গলা টিপে ধরেছিল। দম আটকানো সেই প্রাণটাকে নিয়ে সে ওই বোবা বিস্বাদ পরিবেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

বন্দনা অবশ্য ছিছিক্কার দেয় সেই পলাতকার নামে।

বন্দনা বলে, তার নামে কুকুর পুষো।

কিন্তু এখন সেই হারানো নামের নামে কুকুর পুষে কি লাভ হবে 'বরখাবাড়ি কোলিয়ারির' মালিক সুহৃদ মজুমদারের?

আর ওই শাস্তিটুকুতেই বা কতটুকু কি হবে? এখন ওর নামে কুকুর পোষার বদলে তখন ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালে বরং অপরাধ আর শাস্তির মাত্রাটা ঠিক থাকতো।

কিন্তু তা করেনি তখন সুহৃদ মজুমদার।

উল্টে ওর সেই প্রকাণ্ড অ্যালসেসিয়ানটা কর্ত্রীর চলে যাওয়ার দৃশ্যে ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করছে দেখে পাছে কামড়ে দেয় বলে চেন আটকে বেঁধে রেখেছিল।

কামড়ে অবিশ্যি সে কর্ত্রীকে দিত না, হয়তো কামড়ে দিত তাকে, যে ওর প্রভুপত্নীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রভুপত্নী আর তার বাচ্ছাদের। কিন্তু বাঁধা থেকে বেচারা শুধু ঝাঁপাই জুড়লো।

হ্যাঁ দিন দুপুরে সকলের নাকের সামনে দিয়ে কোলিয়ারির গাড়ীতে চড়েই চলে গিয়েছিল মজুমদারের বৌ মজুমদারের এক বন্ধুর সঙ্গে।

মানে সেই দিন সকাল পর্যন্তও যাকে বন্ধুই ভেবেছিল মজুমদার।

অথচ সন্ধ্যাবেলা সে সুহৃদ মজুমদারের স্ত্রী পুত্র কন্যাকে হাতিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

মজুমদার তার স্ত্রীকে বলেছিল, তোমার এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠে থাকে, তুমি যাও। কিন্তু ওদের নেবে কেন? না তুমি ওদের নিয়ে যেতে পাবে না।

মজুমদারের বৌ বিদ্রুপের হাসি হেসে বলেছিল, শুধু পাবে না বললে হবে কেন? মহামান্য আদালত বাহাদুরের শরণ নিতে হবে। সেখানে যদি জিৎ হয় তবেই দাবি করো।

ওসব কথা রাখো। আমার ছেলে মেয়ে, আমার কাছে থাকবে, ব্যস।

মজুমদার কোলের বাচ্ছাটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল, কিন্তু সে তার মার কোলকেই আঁকড়ে ধরেছিল, পরিত্রাহী চেঁচিয়েছিল। তার সঙ্গে চেঁচিয়েছিল হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বছর দেড়েকের ছেলেটা।

আর মজুমদারের সেই বন্ধু জনান্তিকে বলেছিল, মাথাগরম করছিস কেন? বুঝছিসইতো মানে অভিমানের ব্যাপার। মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আপনিই চলে আসবে।

মজুমদার রক্তচক্ষে বলেছিল, তোমাকে আমি গুলি করে মারতে পারতাম, তবু করলাম না কারণ ভেবে দেখছি সেই খুনটার বদলে আমি পাবে কি? পরপুরুষে আসক্ত স্ত্রীকে নিয়ে আমার কোন স্বর্গটা লাভ হবে?

মজুমদারের বন্ধু দুঃখিত গলায় বলেছিল, ওটা তোর ভুল ধারণা সুহৃদ। এটা পরপুরুষে আসক্তি নয়। বড় জোর বলতে পারিস বর পুরুষে বিরক্তি। তোর এই কোলিয়ারির ডাল্ জীবন, আর তোর সর্বদা টাকা টাকা করে বেড়ানোর জ্বালায় ও ক্ষেপে গেছে। তাই—

তাই সে এ জীবন অসহ্য বলে বেড়াতে আসা অতিথির সঙ্গে বেরিয়ে যাবে!

আহা ওভাবে ধরছিস কেন? বন্ধু আপোসের গলায় বলেছিল ও শুধু আমাকে ধরেছে আমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যেতে।

কলকাতায় যাবার আর কোন উপায় নেই ওর কেমন? রাস্কেল! পাজী! মজুমদারের চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল।

বন্ধু শান্ত গলায় বলেছিল, তোর মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি সুহৃদ, যে কোন লোক এ ক্ষেত্রে খুনোখুনি করে বসতো। কিন্তু কি করবো বল? ওকে তো বোঝাতে কসুর করিনি। কিন্তু একেবারে অনমনীয়। তোর বুদ্ধিহীনতায়ই দারুণ চটে গেছে। বলে কিনা ছেলেমেয়ের ওপর ওর কিসের অধিকার? ও কোনো দিন তাদের কোলে করেছে? খেলা করেছে তাদের নিয়ে?

সেইটুকু না করলেই পিতৃস্নেহ মিথ্যে হয়ে যায় না চৌধুরী! কত বাপ তো বিদেশেও থাকে।

সে তো আমি বুঝলাম, কিন্তু তোমার বৌ বুঝছে কই? বলে, ও রাখতে চায় কোন সাহসে? ও জানে বাচ্চারা কি খায়, কি পরে, কি ভাবে ঘুমোয়। একটা ছ' মাসের আর একটা দেড় বছরের, এদের ও সামলাবে?

আমি আয়া রাখবো। মনে করবো ওদের মা মরে গেছে।

চৌধুরী বলেছিল, সে বোঝাপড়া তোমরা কর বাবা, আমি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র! আমায় তোর বৌ বলেছে, শুধু কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

এই কথাই শুধু বলেছিল চৌধুরী মজুমদারকে। বন্ধুপত্নী আরও কি কি বলেছিল সে কথা বলেনি। আর এও বলেনি কখন বলেছিল।

বলা শক্ত বৈকি। কি করে বলবে, তোর বৌ মাঝরাত্রে তোর বিছানা থেকে উঠে এসে আমার গায়ের উপর পরে গর্জে বলেছিল, ও একটা গাঁইয়া চাষা! ও একটা ছোটলোক। তুমি আমাকে ওর হাত থেকে উদ্ধার কর। তুমি জানোনা ও কত নীচ! নইলে ভাবতে পারো এই বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে দু বছরে দুটো বাচ্ছা। তার মানেটা কি বুঝতে পারছে? এই অস্ত্রে ও আমাকে জব্দ করে রেখে দিতে চায়। ওর এই অস্ত্রে আমি ক্রমশঃ রূপ যৌবন হারিয়ে অকাল বার্ধক্যের পশরা বয়ে কেবল মাত্র ওর হয়েই পড়ে থাকবে। পড়ে থাকবো ওর ঘরের কোণের জুতো ছাতা জলের কলসীর মত। ও ওর দরকার মাফিক ব্যবহার করবে বলে। বাকি সময়টা ও ওর নেশার পিছনে ছুটবে? এটা মধ্যযুগ নয় চৌধুরী! তুমি আমায় নিয়ে যেতে না চাইলেও আমার যাওয়া আটকাবে না। আমি চলে যাবোই যাবো। আমার দম আটকে আসছে, আমার প্রাণ খাঁচায় ছটফটিয়ে মরছে। পাখীর মত।

চৌধুরী তৎসত্বেও বলেছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে এ অভিযোগ হয়তো তোমার থাকবে না। হয়তে আবার তুমি তোমার সাজানো ঘর সংসারে ফিরে আসবার জন্যে ছটফটিয়ে সারা হবে, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে? সেই আমে দুধে মিশে যাবার পর আঁটির মতই নিশ্চয়?

তুমি এটাকে তুচ্ছ মান অভিমান ভেবে ভুল কোরো না চৌধুরী। এটা আমার বহু বিবেচনার ফল।

কিন্তু আমি এখানে আসার আগে পর্যন্ত তুমি সুখে সংসার করছিলে—

সুখে।

মজুমদার সাহেবের স্ত্রী উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সুখে?

দেখে তো তাই মনে হয়েছিল। আর না মনে হবার কারণই বা কি? টাকা পয়সা রয়েছে, অবাধ কর্ত্রীত্বের অধিকার রয়েছে, ঘরবাড়ি সুন্দর, সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। রান্নার বই দেখে নতুন নতুন রান্না করছো, বাড়িতে অতিথি এলে তাকে চপ কাটলেট ভেজে খাওয়াচ্ছো, হামেহাল রাজকীয় যত্ন যোগাচ্ছো, অ-সুখের চিহ্ন কোথায়? আমাদের মত হতভাগার চোখে সুখের চেহারাটা তো এই রকমই।

চোখের দেখাটাই সব নয় চৌধুরী। বলেছিল মজুমদার পত্নী ক্লান্ত গলায়, চোখের দেখায় কতটুকু বোঝা যায় মানুষের?

কিন্তু মজুমদার তোমায় ভালবাসে।

বাসে বৈকি। হেসে উঠেছিল মজুমদারের বৌ। আমি তো বলছি না বাসে না। প্রয়োজনীয় বস্তুকে ভালবাসবে না? জুতো ছাতা জলের কলসীকেও লোকে ভালবাসে।

আরো কত কিই যেন বলেছিল মজুমদারের বৌ। কিন্তু মজুমদারের বন্ধু সব কথা বলেনি বন্ধুকে। বলেনি হয়তো লজ্জায়, হয়তো বা মমতায়।

তখন মজুমদারের বৌ চিরদিনের মত গৃহত্যাগের সংকল্প নিয়ে বাচ্ছাদের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।

সুহৃদ মজুমদার হাজার কুলি খাটায়, ওর নামে সবাই ভয়ে তটস্থ, কিন্তু ঘরের মধ্যের একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষকে আয়ত্বে রাখতে পারেনি। যে তার নাকের সামনে দিয়ে তারই বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তখন মজুমদারের তার কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছিল, আর নিজের প্রকাণ্ড জিপ গাড়ীখানা বার করিয়ে দিয়েছিল।

হয়তো তখনো সে ভাবেনি, তার বৌ সত্যিই চলে যাচ্ছে। হয়তো মনে করেছিল এ রোষ রবে না চিরদিন। তাই পাছে তার অসুবিধে হয় সে বিষয়ে যত্নবান হয়েছিল।

যাত্রাকালে চৌধুরী আমার জনান্তিকে বলেছিল, মজাটা মন্দ নয় কী বলিস? আমি কদিনের জন্যে বেড়াতে এসে তোর বৌয়ের সঙ্গে

প্রেম করে তাকে নিয়ে ভাগছি, আর তুই আমার সুবিধের জন্যে গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছিস, ট্রেনে খাবার জন্যে ফলের ঝোড়া দিচ্ছিস।

ওটা দিচ্ছি আমার বাচ্ছাদের জন্যে। আমি ভাবতেই পারছি না এই গরমে ওই বাচ্ছা দুটো—

মজুমদার ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল এই গরমে ওই বাচ্ছা দুটো—

কিন্তু মজুমদারের বৌ অবলীলায় সেটা ভেবেছিল। সে শুনে বলেছিল, গরম? দুশ্চিন্তা? ওঃ সেই যে গল্প শুনেছিলাম ফাঁসির সময় খুনী আসামী বলে উঠেছিল ধর্মাবতার অত উঁচুতে তুলবেন না আমার আবার মাথা ঘুরুনীর ব্যামো আছে। এটাও হচ্ছে সেই রকম। গরম হল তো কি হল? প্রতিক্রিয়ায় কী হল সেটা তো ও দেখতে যাচ্ছে না।

ওর বাচ্ছা দুটোকে তুমি ওর কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে কেড়ে নিয়ে যাবে? বলেছিল চৌধুরী।

হয়তো বন্ধুর প্রতি মমতায় হয়তো বা নিজের প্রতিই মমতায়। দু দুটো শিশু সমেত একটি মহিলা যদি হঠাৎ জোর করে স্কন্ধে ভর করতে চান, চিন্তার কথা নিশ্চয়ই।

অস্বীকার করে লাভ নেই বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসে বন্ধুপত্নীর প্রতি বেশ একটু দুর্বলতা অনুভব করেছে সে, বলতে কি আসক্তই হয়ে পড়েছে। এবং সে আসক্তিকে অপর পক্ষেও সঞ্চারিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। মহিলা মনোরঞ্জক অনেক বিদ্যাই তার আয়ত্তও।

সে রসিক বাকপটু ভোজন বিলাসী, চঞ্চল বেপরোয়া। আর সর্বোপরি রূপবান।

ঠিক যে যে গুণগুলির একান্তই অভাব সুহৃদ মজুমদারের মধ্যে।

অতএব সুহৃদ মজুমদারের স্ত্রী তার স্বামীর বন্ধুর প্রেমে পড়ে যাবে এটা আশ্চর্য নয়। তবে সত্যিই সে দুটো বাচ্ছা সমেত প্রেমাস্পদের শূন্য ঘরে গিয়ে উঠতে চায়নি। সে চেয়েছিল বন্ধন থেকে মুক্তি। আর ওই বহিরাগতকে ভগবান প্রেরিত মুক্তির দূত বলেই মনে করেছিল।

কলকাতায় চলে যাবে, সেখানে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। চৌধুরী শুধু তার সেই স্বাধীন জীবনের সহায়ক হবে। এইটুকু!

তাই সাহস করে বলেছিল, ওদের আমি রেখে যাব? মরে গেলেও না। দেখি ও কোন আইনের বলে মার কাছ থেকে এত ছোট্ট বাচ্ছাকে কেড়ে নিতে পারে। আইন দেখাতে এসেছে আমায়! আইন!

হাঁপিয়ে ছিল মিসেস মজুমদার।

আর যখন চৌধুরী মমতার গলায় বলেছিল, চিরকালের জন্যে নিয়ে যাবে ওর কাছ থেকে?

ও তখন নিষ্ঠুরের মত বলেছিল, ওর কাছে কোনোদিনই ছিল না তারা। কেউ না। ওর স্ত্রী নয়, সন্তান নয়, আত্মীয় সমাজ নয়। ওর কাছে পরম সত্য হচ্ছে কয়লার টাই, আর ওর ওই বাঘা অ্যালসেসিয়ানটা। জানো ও কত নিষ্ঠুর? বরাবর আমি কুকুর দেখে ভয় পেতাম, এখনো পাই, অথচ ও জোর করে ওই বাঘা কুকুর পুষেছে। আমার ভয় ভাঙাবার জন্যে প্রথম প্রথম কুকুরকে আমার গায়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে দিয়ে হেসেছে।

অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা এখন যা নাকি সুহৃদ মজুমদারের বৌয়ের প্রায় দুধ ভাতের মতই সহজ হয়ে গিয়েছিল, সেইটা নিয়েও অভিযোগ করেছিল সে।

আর চৌধুরী হেসে উঠে বলেছিল, ওরে সর্বনাশ! এ অপরাধে তো ডিভোর্স স্যুট আনা যায়।

কিন্তু এ সবই তে অনেক দিনের কথা। সুহৃদ মজুমদারের অতীত ইতিহাস। সে বৌ তো জনারণ্যে হারিয়ে গেছে।

শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কে তিনকুলে কেউ ছিল না তার, বৌ মানুষ হয়েছিল মীরাটে, না তারই কাছাকাছি কোথায় দূর সম্পর্কের মামার বাড়িতে, কাজেই কলকাতায় তার বৌয়ের এসে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। অন্তত সুহৃদের তা জানা ছিল না। কাজেই—

কিন্তু বন্ধুর ঠিকানাটা তো জানা ছিল সুহৃদের?

সেখানে তো খোঁজ নিতে পারতো সে?

বলতে পারতো, কি হল? তুমি যে আমার সর্বস্ব নিয়ে ভেগে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলে, একটা খবরও দেবে তো? আমায় জানাবে তো মানিনীর মান ভেঙেছে কি না।

কিন্তু সুহৃদ মজুমদার তা করলো না। সুহৃদ মজুমদার নিঃশব্দে সেই তার পরম সত্যকেই আঁকড়ে বসে রইলো। সেই কয়লার চাঁইকে।

অতএব সেই সর্বস্বকে আর ফিরে পেল না সে।

কিন্তু সুহৃদ মজুমদারের স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে গেলেও, সংসার ঋণ নামক সেই এক অদৃশ্য শাসকের শাসন তাকে ছাড়ল না। অথবা সে ইচ্ছে করে নিজেই তার ফাঁদে পা দিল। যেমন দিয়ে থাকে অনেক মৃতদার বা অনেক অকৃতদার পুরুষ। হয়তো কোনো এক নিঃসহায় পরিবারের সহায় হয়ে বসে, হয়তো কোনো এক নিতান্ত অনাত্মীয় সংসারের আত্মীয় হয়ে বসে, হয়তো কোনো এক নিরভিভাবক সংসারের অভিভাবকের ভূমিকাটা নিয়ে বসে। বন্দী হয় দায়িত্বের কাছে, কর্তব্যের কাছে।

মোটকথা এমন স্বেচ্ছাবন্দীর ভূমিকা পুরুষ জাতি অনেক সময় নিয়ে থাকে, যেমন নিয়েছিল সুহৃদ মজুমদার এই সংসারটার কাছে।

কিন্তু কবে?

কখন?

কী সূত্রে?

সেই সূত্রটা হাতড়াচ্ছিল সুহৃদ মজুমদার তার আচ্ছন্ন চেতনার ধারাবাহিকতাহীন চিন্তাধারায়।

আমি কি আগেই খবরের কাগজের লরী দুর্ঘটনার খবরটা জেনে ছুটে এসেছিলাম না বন্দনা আমায় জানিয়েছিল?

মনে পড়ছে না কেন রবিরঞ্জনের মৃত্যু সংবাদটা প্রথম কি করে পেলাম আমি কোলিয়ারিতে বসে। নাঃ মনে পড়ছে না।

কিন্তু আশ্চর্য! এই পার্কসার্কাসের মোড় থেকে কোন দরকারে ভরা সন্ধ্যাবেলা জি টি রোড ধরে অমন বেপরোয়া চালে চেটে আসছিল রবি?

কেন সেখানে গিয়েছিল, সে কথা বন্দনাও বলতে পারেনি। শুধু

রবির থেঁৎলে যাওয়া মৃতদেহটা সনাক্ত করে বলেছিল, হ্যাঁ ঠিক! এই কাপড়জামা পরেই বেরিয়েছিল ও।

কোন কাপড় জামা পরে বেরিয়েছিল রবিরঞ্জন সে কথা বলতে পেরেছিল তার স্ত্রী, অথচ কি জন্যে বেরিয়েছিল সে কথা বলতে পারেনি, এই ত্রুটি ধরে পুলিস তাকে অনেকখানিটা নাজেহাল করেছিল। কারণ পুলিস তার স্বভাবগত সন্দেহে ভেবেছিল কে জানে দৈবাতের অসতর্কতা, না ইচ্ছাকৃত অসাবধানতা। কে বলতে পারে আত্মহত্যার ইচ্ছে নিয়েই ওই রাক্ষুসে লরাটার মুখের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল কি না।

আর কে বলতে পারে সেই ইচ্ছাটার সৃষ্টি হয়েছিল দাম্পত্য-জীবনের অসন্তোষে কি না।

সাধে কি আর পুলিসকে বুদ্ধু বলে।

সুহৃদ মজুমদার ভেবেছিল সেদিন। নাকের ওপর দিয়ে বৌ পর-পুরুষের সঙ্গে কুলত্যাগ করে গেলেও যে আত্মহত্যাটা করা হয়ে ওঠে না, আর সামান্য একটু অসন্তোষে সেটা ঘটিয়ে ফেলবে মানুষ?

পুরুষমানুষ এমনই অবলা হবে, যে কারো দুর্ব্যবহারে আত্মহত্যা করে বসবে? মাথা খারাপ!

ওসব কিছু না।

দুর্ঘটনা হচ্ছে দুর্ঘটনা। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত! কিন্তু সহপাঠী রবিরঞ্জনের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা যদি সুহৃদ মজুমদারের জীবনকে চিরকালের মত নাগপাশে বেঁধে ফেলে, সেটা সুহৃদ মজুমদারের নিজের দোষ ছাড়া আর কি? বোকামি! নির্বুদ্ধিতা! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা! ইচ্ছে করে সেই পা ফাঁদে দেওয়া!

তা নইলে সুহৃদ মজুমদার পুলিসের জেরা থেকে উদ্ধার করে এনে বন্দনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে, ভাববার কিছু নেই, আমি তো আছি।

আমি তো আছি!

বন্দনার আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করে সেই কয়েকটি শব্দ বজ্রধ্বনির মত বেজে উঠেছিল। সে ধ্বনি বন্দনাকে বিদীর্ণ করে ফেলেছিল, বন্দনাকে আছাড় মেরে মেরে চূর্ণ করেছিল। তারপর সেই শব্দ গানের সুরের মত বাজতে সুরু করেছিল।

বন্দনা এই অযাচিত করুণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, বন্দনা এই বলিষ্ঠ আশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

আমি তো আছি!

এর থেকে বড় কথা আর কি আছে? এর থেকে মহৎ কথা আর কি আছে?

মহতের কাছে, বড়র কাছে সমস্ত ক্ষুদ্রতা মাথা হেঁট করবেনা?

বন্দনাও সেই কথাই ভাবছিল তার একক শয্যায় শুয়ে। সেই আশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি কোথায় পাব আমি? হয়তো আজ ছেলেমেয়ের দুর্ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়েই বন্দনা এমন করে পুরনো খাতার পাতা উল্টে দেখছিল, আমার আর করবার কী ছিল তখন? কী করতে পারতাম? কোন ঔদ্ধত্যে বলতে পারতাম, তুমি আছ, আমার তাতে কি?

না বন্দনা তা বলতে পারেনি!

বন্দনা বিহ্বল দৃষ্টি মেনে বলেছিল, তুমি আছ?

আছি বৈকি।

কোলিয়ারির সুহৃদ মজুমদার বন্দনার বছর তিনেকের মেয়েটাকে কাছে টেনে তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, আছি বৈকি!

বলল।

তার মানে ফাঁদে পা দিলো।

তার মানে খাল কেটে কুমীর আনল।

একবার যদি উচ্চারণ করে বসো, ভয় কি আমি তো আছি—তা হলেই তো হয়ে গেল। বিকিয়ে গেল ইহপরকাল। ক্রীতদাসের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে চিরকালের মত।

তাই করছে সুহৃদ মজুমদার অ্যাকসিডেণ্টে মরে যাওয়া বাল্য সহপাঠি রবিরঞ্জনের সংসারে।

আমি কি ওকে হাজারবার তাড়িয়ে দিইনি?

বন্দনা উত্তাল হয়ে বিছানায় উঠে বসে, বন্দনা সেই তার পুরনো পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখে প্রমাণ খোঁজে, আমি কি হাজারবার বলিনি

তোমার মাণি অর্ডারটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তোমার আসার দরকার নেই।

কিন্তু ও তা শোনেনি।

ও এসেছে।

ও সেই শিশু দুটোকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে নিজের জায়গা করে নেবার চেষ্টা করেছে। তাই ও আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে, তোমার জন্যে আসি এ কথা নাই বা ভাবলে। মনে কর না আমি ওদের জন্যে আসি।

হ্যাঁ বলেছিল একদা একথা সুহৃদ মজুমদার বন্দনার মুখের ওপর, তোমার জন্যে আসি, একথা নাই বা ভাবলে?

বন্দনা বলেছিল, তা না ভাবতে পারলে এত বোঝা বইব কি করে!

মনে কর না ওদের জন্যে আসি।

সে কথা ভাবতে গেলে নিজের সমস্ত অহমিকা, সমস্ত মূল্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

তবে নাই বা ওসব কিছু ভাবলে, সুহৃদ মজুমজার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অভিযোগ কারিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ভাবো আমি আমার নিজেরই জন্যে না এসে পারিনা বলেই আসি!

এটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য কথা?

জগতে অনেক অবিশ্বাস ঘটনা ঘটে।

কিন্তু এখানে পাড়ার লোকে নানা কথা বলে—

পাড়ার লোকে? পাড়ার লোকের কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

ছেলে মেয়েরা বড় হবে, ওরা কি ভাববে?

সুহৃদ মজুমদার সারাজীবন কয়লার চাঁই নিয়ে কারবার করেছে, তবু সুহৃদ মজুমদার শুভ্রহাসি হেসে বলেছিল, ওরা কিছু ভাববে না! ওরা আমায় ভালবাসে।

ভালবাসা জিনিসটা বিশ্বাস করো তুমি?

করি বৈকি।

জোর দিয়ে বলেছিল সুহৃদ মজুমদার।

আর সেই জোরের গভীরতর ব্যঞ্জনার কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছিল বন্দনাকে।

সত্যি তো। এ প্রশ্ন সে করল কোন মুখে?

অতএব আসা যাওয়াটা অব্যাহতই রইল। কিন্তু সেই অব্যাহত ছন্দে চিড় খেল কখন? দুটো ঘরে দুটো বিনিদ্র মানুষ সেইখানেই হাতড়াচ্ছে! কখন? কখন? কবে প্রথম?

সে কি তিলকের হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের সেই খবরের দিন? নাকি তার আগেই? হয়ত আগেই। হয়ত ভিতরে ভিতরে জমছিল বারুদের ধোঁয়া, ওই উপলক্ষ্যটা দেশলাইয়ের কাঠি হল। দপ্ করে জ্বলে ওঠায় সহায়তা করল।

কিন্তু সুহৃদ মজুমদারও বাড়াবাড়ি করেছিল বৈকি। তিলকের পরীক্ষার সাফল্য সংবাদে তোর কি দরকার ছিল অমন করে ছুটে চলে আসবার? আর কি দরকার ছিল নিভৃতে বন্দনার হাত চেপে ধরে আহ্লাদের আবেগ প্রকাশ করতে বসবার? হ্যাঁ করেছিলি তাই তুই।

আর বন্দনাও নাটক করে গলায় আঁচল দিয়ে তোর পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

কে জানে তার পর মুহূর্তে আরো কি করে বসতিস কে জানে। দুর্বল চরিত্র পুরুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। হয়ত তুই বুকেই টেনে নিতিস ওই প্রণামরতাকে। নেহাৎ তিলক হঠাৎ সেই মহামুহূর্তে ঘরে এসে পড়েছিল তাই।

তিলক এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

তিলকের চোখটায় কেমন একটা কালো ছায়ার ছাপ পড়েছিল, আর তিলকের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যেন তিলক নিজেই কী এক অসতর্ক মুহূর্তে ধরা পড়ে গেছে।

তাই তিলকের মুখে কথা জোগায়নি।

অথচ কীই বা এমন দেখেছিল তিলক—

বন্দনা ভাবে, শুধু ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, আর আমি মাথা

নীচু করে ওর পায়ের ওপর একটি প্রণাম রাখছিলাম। শুধু তো এই। এতেই একেবারে—অবিশ্যি হয়ত ওর আগে এ দৃশ্য সে দেখেনি, হয়ত অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে তো একটু থতমত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট ছিল। আর তারপর সহজ হয়ে যাওয়া! কিন্তু—

কিন্তু না, তিলক তা হয়নি। তিলক একটা কাণ্ড করে বসেছিল। তিলক কেমন একটা অস্বাভাবিক গলায় জোরে ডেকে উঠেছিল, মা।

বন্দনা চমকে উঠেছিল।

আর আশ্চর্য বন্দনা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার মত হয়ে গিয়েছিল। তাই বন্দনা বোকার মত সেই অস্বাভাবিক মুহূর্তে খাপছাড়া গলায় বলে ওঠে, এই যে তোর কথাই হচ্ছিল, তোদের কোলিয়ারি সাহেব যে তোর পাশ করার খবরে দামী একটা রিষ্টওয়াচ্ এনে হাজির করে বসে আছেন। দেখ এখন তোর পছন্দ, কি না। আমি তো বলছিলাম, বাচ্চা ছেলে এত দামী ঘড়ি—

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাই বলে বন্দনা। যেমন সবাই বলে থাকে লজ্জায় পড়ে লজ্জা ঢাকতে। কথাই তো আবরণ, কথাই তো ত্রাণকর্তা।

কিন্তু বন্দনা সেদিন ত্রাণ পায়নি। বন্দনা ঠিক মুহূর্তটিকে ধরে ফেলতে পারেনি। বন্দনা ডিমে তা দেবার আগে ডিম ভেঙে ফেলেছিল।

বন্দনা যদি তার ছেলেকে একটু সামলাতে দিত। বন্দনা যদি শুধু গাম্ভীর্যের গলায় বলত, কী হল? অমন চেঁচিয়ে ডেকে উঠল যে?

তাহলে বন্দনার সেই আত্মস্থের ভঙ্গীতেই চুপ হয়ে যেত তার ছেলে। হয়ত ভয় খেয়ে যেত।

কিন্তু বন্দনা গাম্ভীর্য হারিয়ে অপরাধীর ভূমিকা নিল। তাই বন্দনার ছেলে ভয় পাওয়ার বদলে সাহসী হয়ে উঠল।

ক্ষণমুহূর্তের দৃশ্যটা সে ভুলতে পারলো না ভুলতে পারলো না নিভৃত ঘরে মুখোমুখি দুটো মানুষের দু'জোড়া চোখের বিহ্বল অনির্বচনীয় দৃষ্টি! তারপর ভুলতে পারলো না ওই অবাস্তর কৈফিয়ৎ।

তাই তিলকের সদ্যতারুণ্যের কর্কশ হয়ে ওঠা গলা উচ্চারণ করে উঠল, ঘড়িতে আমার দরকার নেই!

তারপর তিলক সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন থেকেই হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছিল তিলকের গলাটা কেমন মোটা আর কর্কশ লাগছে, কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছিল তিলকের হাত পা-গুলো বে আন্দাজী বড় লাগছে যেন, কিন্তু সেই মনে হওয়াটা স্থায়ী হচ্ছিল না, ওর অন্য ভঙ্গীতে। ওর কৈশোর সুলভ চাপল্যে।

কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে মনে হল তিলক বড় হয়ে গেছে, তিলকের গলার স্বর পুরুষের স্বর হয়ে উঠেছে। যে পুরুষ কণ্ঠ চিরদিন মেয়ে-দেরকে শাসন করে এসেছে, যে পুরুষ নারীকে বাল্যে পিতার যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হয়ে থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছে। সেই কণ্ঠস্বর তিলকের কণ্ঠে আশ্রয় নিল।

তিলক চলে গিয়েছিল।

বন্দনার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা সেই সাদা মুখে আস্তে বলেছিল, কি হল দেখো।

সুহৃদ মজুমদারও কি ভয় পায়নি? অদ্ভুত একটা ভয় পেয়েছিল। সে ভয়ের জন্মদাতা লজ্জা। কিন্তু সে বন্দনাকে সাহস দিতে সেই ভয়কে চাপা দিয়ে বলে উঠেছিল, হবে আবার কি? তুমি খামোকা ওই দামী কথাটা—তুললে বলেই—

কিন্তু তার আগে ও চেঁচিয়েছিল।

বন্দনা চৌকীর কোণটা চেপে বসে পড়ে বলেছিল, আসল কথা এভাবে আমাদের একা দেখে—

একা তা কি? আমরা এমন কোন অন্যায় অবস্থায় ছিলাম না—

সেটা হয়তো ও কল্পনা করে নিল—

ওটা তোমার অতি কল্পনা। হয়তো তোমায় অনেকক্ষণ খুঁজেছে—

তুমি ওর চোখ দেখেছিলে? বলে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে গিয়েছিল।

তারপর যখন তিলক বাড়ি নেই যখন সুহৃদ চলে যাচ্ছে ওর ছোট্ট স্যুটকেশটা নিয়ে তখন বন্দনা বলেছিল, তুমি আর এসোনা।

আর আসব না!

সুহৃদ তাকিয়ে থেকেছিল ওর দিকে। অনেকদিন অনেকবার একথা বলেছে বন্দনা। কিন্তু এমন সুরে নয়, এমন স্পষ্ট করে নয়।

তার মধ্যে বিপন্ন নারী-হৃদয়ের বিব্রত ভাবটা ফুটতো, কিন্তু এমন কাঠিন্য নয়।

বন্দনা আবার বলেছিল, হাঁ আর্ আসবে না। কেন আসবে? কী পাও তুমি এখানে?

কী পাই সেকথা বলে বোঝানো যাবে কি?

বোঝাবার দরকারও নেই। শুধু নিজে এইটুকু বুঝে নাও, আর এলে মান হারাতে হবে। দুধ কলার কাজ দুধ কলা করেছে।

ও তুলনাটা এখানে খাটে না বন্দনা, ওটা থাক। তুমি বারণ করছো, না আসাতেই চেষ্টা করব, কিন্তু নিশ্চিত কথা দিতে পারছি না।

নিশ্চিত কথা দেয়নি কোলিয়ারির সুহৃদ মজুমদার। তাই কথা রাখবার দায়িত্বও নেয়নি। আবার এসেছে। বারবার এসেছে। ছোট্ট সুটকেশটা হাতে করে অপ্রতিভ হাসি মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তখন কি বন্দনা বলে উঠেছে, আবার এসেছ তুমি? লজ্জা করল না? নাঃ। তেমন কথা বলে ওঠেনি বন্দনা।

বরং বন্দনার সমস্ত মুখটা আলোয় ভরে উঠেছে, বন্দনার চোখে একটি পরম তৃপ্ত কৃতার্থ মনের ছায়া ফুটে উঠেছে। যে ছায়াকে ভাষায় পরিণত করলে দাঁড়ায়, এসেছ?

উঃ সেই পর্যন্ত কী ভাবনাই ছিল আমার। হয়ত আসবে না।

কিন্তু আগে আগে উপস্থিতির কালটা ছিল দীর্ঘ, হয়তো চার বেলা পাঁচ বেলা ক্রমশঃ এক বেলা আধ বেলা। হয়তো কয়েক ঘণ্টা।

বন্দনা বলতো—এত কষ্ট করে এটুকুর জন্যে আসার কি দরকার?

সুহৃদ বলতো, আছে নিশ্চয়ই কিছু দরকার।

আমি তো বুঝিনা কিছু। আমার দিক থেকে তো দরকার মাত্র রসদের। নিয়মিত মণি অর্ডারটা পেলেই চুকে যায়।

হ্যাঁ এরকম নির্লজ্জ কথা বলতে বাধেনি বন্দনার।

সুহৃদ কিন্তু ধিক্কার দিয়ে ওঠেনি, শুধু বলেছিল, মনে করো প্রাইভেট পিয়নের হাতে এলো।

সুহৃদ মজুমদার আগে এত কথা জানতো না। কথাতেই ছিল তার দৈন্য। আর যদি বা কথা কইতো, সে তার সেই কয়লার চাঁইয়ের

কথা। তার বৌটা ত তাতেই জ্বলে যেত আরো। রেগে বলতো ভগবান কি আমার জন্যে একটা নীরেট পাথরের দেওয়াল লিখেছিল।

কিন্তু এখন সুহৃদ মজুমদার ভিন্ন সংসারের মাটিতে কথার চাষ করতে শিখেছে। বন্দনার মত মুখরা মেয়ের সঙ্গেও কথা চালিয়ে যায়।

বৌ ত্যাগ করে চলে যাবার পর নিঃসঙ্গ জীবনের নিঃশব্দ ঘর কি তাকে কথার মূল্য শিখিয়েছে?

এখনো তো ফিরবে সেই নিঃসঙ্গ জীবনে।

রবিরঞ্জনের ওই শোচনীয় মৃত্যুর পর সুহৃদ বন্দনাকে আর তার বাচ্চা দুটোকে নিজের কাজে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

বলেছিল ভয়ঙ্কর এক দুঃসাহসে ভর করে এখানে একা পড়ে থেকে কী হবে? কোলিয়ারিতেই চলে যাওয়া হোক। এখানকার বাকি পড়ে থাকা বাসা ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে, নিয়ে চলে যাই।

বন্দনার সর্বাঙ্গ থানে মোড়া, বন্দনার হাত দু'খানা খালি, বন্দনা তবু এমন একটা তীক্ষ্ণ তীব্র হাসি হেসে উঠেছিল যেটা ওই সাজের সঙ্গে বেমানান।

সেই হাসি হেসে বলে উঠেছিল, কোলিয়ারিতে গিয়ে উঠবো? কোন পরিচয়ে?

এই কদর্য সাজের ভেকটা ছাড়লে পরিচয় একটা খুঁজে বার করা সহজ হয়ে যায়।

বন্দনা বলেছিল, সব জিনিস সবাইয়ের কাছে সহজ নয়।

এই ভেকটা যে নিলে কী করে তাই ভাবি।

শুধু এইটুকুর জন্যেই ভাবো? আর কিছু নয়?

বন্দনা আর একবার হেসে ওঠে।

তা বন্দনা এ হাসিটা হাসতে পারে। কারণ বন্দনা যে লোকটার জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল, সেই লোকটার জন্যেই থান পরে চুড়ি খুলে শোকার্ত মূর্তি ধারণ করে বসে আছে। অথচ বন্দনা আর এক পুরুষের সাহায্য নিচ্ছে, প্রেম নিচ্ছে। হ্যাঁ প্রেমও নিচ্ছে বৈ কি, নইলে কিসের আগ্রহে এই বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে?

প্রথম যেদিন বোঝাটা তুলে নিল সেদিনের কথা সুহৃদ মজুমদারের

মনে আছে কিনা কে জানে, বন্দনার মনে আছে। মেয়েরা চট করে কিছু ভোলে না।

তাই বন্দনার স্পষ্টই মনে আছে সেই থেঁৎলে যাওয়া মৃতদেহটা গলিত রূপের সামনে দাঁড়িয়ে মৃতের সহপাঠী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আর কারো নাম মনে পড়ল না তাই বেহায়ার মত ওর একদার বন্ধুর দরজাতেই শরণ নিলাম। কবেকার বন্ধু যেন? স্কুলের সময় থেকে তাই না? তা এবার নিজের কাজটা করুন—

হ্যাঁ তখন বন্দনা আপনি করেই বলেছিল, মুখে আগুনটার ব্যবস্থা করুন। শোধবোধের মত হয়ে যাক।

সুহৃদের চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়েছিল, সুহৃদ কথা বলতে পারেনি। কিন্তু পরে কথা বলেছে। বলেছে—আমি ওর অসাবধানতাকে দোষ দিতে পারছি না বন্দনা। কাউকেই দোষ দিতে পারি না। আমি মানি নিয়তি ছাড়া পথ নেই।

নিয়তি মানা কাপুরুষ পুরুষটা অতএব নিজ নিয়তিকেও মেনে নিয়ে এ যাবৎ একটা ফালতু সংসার টানছে।

টানছিল আর যেন সুখেই ছিল, কিন্তু ফাটল ধরেছে সুখে, ফাটল ধরেছে স্বাস্থ্যে।

তারপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেদিন। যেদিন বন্দনা ওকে বলেছিল, আবার মরতে মরতে এলে তুমি? তোমায় না সেবার বলে দিয়েছিলাম এই হার্টের কষ্ট নিয়ে আর দৌড় ঝাঁপ করে আসবে না? আচ্ছা বেহায়া লোক তো।

সুহৃদ মজুমদার হাতের সুটকেশটা নামিয়ে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, সেটা কি আজ জানলে?

না, অনেকদিনই জেনেছি, কিন্তু আমি আর তোমার এই হায়া লজ্জাহীন আচরণ সহ্য করব না। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—

তোমার ছেলেমেয়েরা!

সুহৃদ মজুমদার মৃদু হেসে বলেছিল, তা বটে। ও দাবীটা তোমার বরাবরের।

কথায় অহিত আমি হই না। আমি তোমায় স্পষ্টই বলছি তোমার

এই টাকাকড়ি নিয়ে নিয়ে বাইজী বাড়ি আসার মত আসাটায় ওরা ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছে।

সুহৃদ মজুমদার এবার খাড়া হয়ে উঠে বসেছিল। কিন্তু কেন? কেন হিংস্র হয়ে উঠবে? আজ পর্যন্ত আমার ব্যবহারে কোন বেচাল দেখেছে ওরা?

সবই কি আর স্পষ্ট দেখতে হয়?

ঠিক আছে, তাহলে চলেই যাচ্ছি! আর আসব না। হ্যাংলার মতন ছুটে ছুটে আসি—বলতে বলতে হঠাৎ শুয়ে পড়েছিল লোকটা! তারপরতো ডাক্তার ডাকাকাকি কাণ্ড!

তদবধি পড়েছে বিছানায়। ডাক্তার বলেছে হার্টের দফা না কি গয়া করেছে বসে বসে, এখন পাঁজরে—জল জমেছে। জ্বর ছাড়বার নাম নেই তাই। তার মধ্যেই বলে, আমায় ছেড়ে দাও।

কিন্তু হঠাৎ বন্দনা উল্টো গাইতে সুরু করেছে। যে বন্দনা এ যাবৎ কাল ওকে নিবৃত্ত করতে হাত জোড় করেছে, যাচ্ছেতাই করেছে সেই বন্দনাই বলেছে, বাজে বকবক করো না যাওয়া তোমার হবে না। দেখি তো কেমন করে যাও।

চির বঞ্চিত চির অভাগা সুহৃদ মজুমদারের কোটর গত চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে। সেটা না মুছেই ভাঙা গলায় বলেছে সে, জীবন ভোর তো কেবল দূরদূর করলে, এখন একথা কেন?

বন্দনা কিন্তু কাঁদেনি। বরং যেন হেসেই উঠেছিল। বলেছিল, জান না কেন? এর নাম হচ্ছে মায়াকান্না!

বন্দনা।

বল।

আমরা এভাবে জীবনটাকে নয়ছয় করলাম কেন?

তুমিই জান। বন্দনা চড়া-চড়া গলায় বলেছিল, তোমার মতিচ্ছন্ন। কোথায় দিব্যি একখানা বিয়ে টিয়ে করে বৌ নিয়ে সুখে জীবন কাটাবে তা নয় মরা বন্ধুর সংসার পুষছ, আর একটা অখাদ্য মেয়েমানুষের ইচ্ছের পুতুল হয়ে চলছ।

বন্দনা তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু আজ জীবনের দিন ফুরিয়ে কেন

গোণা দিনে এসে পড়ার পর মনে হচ্ছে কী লোকসানই দিলাম জীবন ভোর। হয়ত তেমন জোর করতে পারলে, তুমি রোধ করতে পারতে না।

কে বললে পারতাম না?

বন্দনা হেসে উঠেছে, আমি পারি না এমন কাজও আছে জগতে? আর সে বিশ্বাসও তোমার আছে?

আছে বৈকি।

সুহৃদ মজুমদার বলেছিল, এই তো এতকাল হ্যাংলামী করে মলাম, আমাকে কি গ্রহণ করতে পারলে?

বন্দনা নির্নিমেষে একবার তাকিয়ে বলেছিল, বিছানায় জায়গা না দিলেই গ্রহণ করা হয় না? অনুগ্রহ গ্রহণ করা কি গ্রহণ করা বলে না?

কিন্তু এ সব তো সেই ওর অসুখে পড়ার আগের কথা। তারপরতো অনেক জল গড়াল। এখন তো বন্দনা ভাবছে, নাঃ ওকে নার্সিং হোমেই দিই। এই অপমানের মধ্যে রাখব না ওকে।

আর বন্দনার ছেলেমেয়েরা পরামর্শ করছে, সরাসরি আক্রমণে অপদস্থ অপমান করে এ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করি আমরা ওঁকে। মাকে বলে কিছু হবে না, ওঁকেই বলতে হবে।

কী অদ্ভুত পরিস্থিতি এই সংসারটার, সুহৃদ মজুমদার ভাবছিল চোখ বুজে, অথচ হয়ত এসব জটিলতার কিছুই হতো না, যদি বন্দনা—

ঘরে ঢুকলো তিলক আর কুঙ্কুম।

ওদের পায়ের শব্দে চোখ মেলল সুহৃদ মজুমদার।

ওর কোটর গত ক্লান্ত চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল। ওর মনে হলো ভালবাসা কখনও মরে না। ওরা সামরিক উত্তেজনায় আমার প্রতি বিরূপ হয়েছিল, আমার সম্পর্কে কটূক্তি করেছিল, কিন্তু ভিতরের জিনিস যাবে কোথায়? কত ভালবাসত আমায়। তাছাড়া—

সুহৃদের সেই নিষ্প্রভ চোখ দুটোর কোণ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল! সুহৃদ ক্লান্ত গলায় বলল, বসো।

বসল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ওপর একটা লাঠির ঘা পড়ল।

কথার যে লাঠিটা বাগিয়ে এনেছিল তিলক নামের উদ্ধত ছেলেটা।

বসতে আসিনি আপনার ঘরে, সে প্রবৃত্তিও নেই, বলতে এসেছি একটা স্পষ্ট কথা।

আগে যখন বলত, কোলিয়ারি সাহের তখন বলত, তুমি। এখন আপনি করে বলে।

সুহৃদ মজুমদারের চোখের কোণের জল শুকিয়ে যায়। সুহৃদ মজুমদার আস্তে বলে, বল।

বলতে বাধ্য হচ্ছি বলেই বলছি, আপনারা বলাচ্ছেন বলেই বলছি —আপনি কি মনে করেন আপনার এভাবে এ বাড়িতে থাকাটা বেশ স্বাভাবিক?

সুহৃদ মজুমদারের সেই কোটর গত চোখের কোণে হঠাৎ ধ্বক করে আগুন জ্বলে। সুহৃদ মজুমদার নিজেই যে চলে যাবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিল, সে কথা ভুলে যায়। ক্ষীণ অথচ তীব্র গলায় বলে ওঠে, কেন নয়? বাড়িটা আমি ভাড়া দিই না?

ও হো হো হো।

কুঙ্কুম বলে ওঠে, ও দাদা মূলেই ভুল করেছিস। বাড়ি যদি কারো ছাড়তে হয়ত সেটা আমাদেরই ছাড়া উচিত।

কেন? কেন? তোমরাই বা ছাড়বে কেন?

রোগী হঠাৎ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, বড় ডেঁপো হয়ে গেছো তোমরা।

একী, এ কী বলছে লোকটা? এ কী বিকারগ্রস্ত রোগী ভুল বকছে?

কুঙ্কুম আরক্ত মুখে বলে ওঠে, আপনি অসুস্থ, আপনাকে আর কিছু বলবো না, কিন্তু জেনে রাখবেন, খেতে পরতে দিলেই কিনে নেওয়া যায় না। হতে পারে আপনি অসময়ে আমাদের উপকার করেছেন, এবং উপকারটা দুটো অসহায় শিশুকেই করেছেন কি না তলিয়ে ভাববেন।

তলিয়ে ভাববো?

হ্যাঁ ভাববেন। আপনার জন্যে আমাদের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কুঙ্কুম তীব্র গলায় বলে, আপনি কি এটা অস্বীকার করতে পারেন, আপনার এই কথাটা অন্যের চোখে কত দৃষ্টিকটু ?

কুঙ্কুম টের পায়নি কখন বন্দনা ঘরে এসে ঢুকেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুঙ্কুম তাই বলেই চলে, হ্যাঁ রীতিমত দৃষ্টিকটু। কে আপনি এ সংসারের? কোন অধিকারে শাসন করতে আসেন? খেতে দেন, পরতে দেন, বাড়ি ভাড়া দেন, তাই ?

কুঙ্কুম। বন্দনা দৃঢ় গম্ভীর গলায় বলে উঠে, এটা রোগীর ঘর। এ ঘরে গোলমাল করা চলবে না।

গোলমাল আমরা করতে আসিনি মা, নিজে সারাজীবন যে গোলমালের পাহাড় আমাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছো তাকে সহজ করতে চেষ্টা করছি। কতদিন আর বোবা কাল অন্ধ সেজে তোমাদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাবো ?

তিলকের চেয়েও কুঙ্কুমের কথার বাঁধুনী বেশী, তাই কুঙ্কুম আইন নিজের হাতে নেয়।

বন্দনা কি ওর মেয়েকে আজই হঠাৎ দেখলো ?

বন্দনা কি এর আগে ওর মেয়ের পাকা পাকা কথা শোনেনি ? তাই বন্দনা পাথর হয়ে যায় ? বন্দনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায়, কী বলছিস তুই ?

সে প্রশ্ন সুহৃদ মজুমদার করে।

কাঁপা গলায় বলে, কী বলছিস তুই কুঙ্কুম ?

যা বলছে ঠিকই বলছে—সেনাপতি অস্ত্র ধরে, যখন আমরা ছোট ছিলাম, আপনারা যা খুশি করেছেন, কিছু বলতে যাইনি। কিন্তু আর সহ্য করবো কেন ? আমাদেরও একটা মান আছে সম্ভ্রম আছে, লোক লজ্জা আছে।

বন্দনা !

রোগীর স্বরটা আর্তনাদের মত আছড়ে পড়ে, একথা কি আমিও তোমায় বলিনি, ওদের মান আছে সম্ভ্রম আছে লোকলজ্জা আছে। তুমি আমাকে যেতে দাও।

না।

বন্দনা কাছে সরে আসে ।

রোগীর উঁচুকরা ঘাড়টাকে আস্তে চেপে বালিশে ফেলে বলে, উত্তেজিত হয়ো না। তিলক কুঙ্কুম ওঘরে যাও—

বন্দনার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় ওরা অপমানিত হয়, বেশ যাচ্ছি, বলে চলে যায়। এবং দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে যায়, শুধু ঘর থেকে কেন এ বাড়ি থেকেই যাচ্ছি।

কিন্তু বন্দনা কি পাষাণ ? বন্দনা তো ছুটে গিয়ে আগলায় না। বন্দনা তো চেঁচিয়ে উঠে ডাক দেয় না। বন্দনা শুধু রোগীর মাথার বালিশটা চেপে চেপে ঠিক করতে বসে।

বন্দনা।

হাহাকারের মত গলায় বলে সুহৃদ, একী করছো তুমি ?

ঠিকই করছি।

দোহাই তোমার, ওদের ফেরাও।

ফেরাবো ? বন্দনা হেসে উঠে বলে, ভুলে যাচ্ছ কেন ওরা আমার গর্ভজাত ? নিজে না ফিরলে ডেকে ফেরানো যাবে এ ভরসা করি না।

বন্দনা। আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। ওদের কাছে সত্যি কথাটা বলতে দাও না!

সত্যি কথাটা ?

বন্দনা হঠাৎ বে-খাপপা ভাবে হেসে ওঠে, সত্যি কথাটা ? সত্যি কথাটা বলতে বসবে তুমি এখন ওদের কাছে ?

বলবো।

চিরবাধ্য সুহৃদ মজুমদার অবাধ্যের গলায় বলে, হ্যাঁ বলবো। চিরটাকাল আমি বলতে চেয়েছি। আর তুমি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছ, বলতে দাওনি। কী লাভ হল তাতে ?

কী লাভ হল তাতে ?

হাঁটুর ওপর চিবুকটা রেখে উঁচু হয়ে বসে আস্তে বলে বন্দনা, তাই ভাবছি কী লাভ হল তাতে।

লাভ হল না বন্দনা, শুধু লোকসানটাই ভারী হয়ে উঠল। না

বলার জন্যে কি ওরা তোমায় ভালবাসলো ? ভক্তি করল ? শ্রদ্ধা করল ?

কই আর করল ? বন্দনা বিমনা গলায় বলে, অথচ তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, সত্যি কথাটা বলতে বসলে ওরা ওদের মাকে ঘৃণা করবে অশ্রদ্ধা করবে, ভালবাসতে ভুলে যাবে। একচক্ষু হরিণের মতই ভেবেছিলাম আর কি। তাতে আমার পাওনার তো শূন্যিই পড়ল, তোমারও—

ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে চুপ করে বন্দনা।

সুহৃদ ব্যাকুল গলায় বলে, কিন্তু সে ভুলটাতো এখন শোধরানো যায় বন্দনা!

শোধরানো যায় ? বন্দনা যেন কৌতুকের হাসি হাসে।

যাবে না কেন বন্দনা। তুমি ওদের ফেরাও, আমার কাছে ডাক —আমি বলবো—

বন্দনা ওর হাতের ওপর একটা হাত রেখে স্নেহের গলায় বলে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছো। এতদিন পরে এই—পরিস্থিতিতে সত্যিকথাটা বলতে বসলে বিশ্বাস করবে ওরা ?

বিশ্বাস করবে না ? বাস্তবিকই ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে সুহৃদ মজুমদার, সব কথা খুলে বললে বিশ্বাস করবে না ?

না। বলবে এখন বেগতিক দেখে একটা গল্প বানাতে বসেছ তোমরা।

এই কথা বলবে ?

বলবে বৈকি। বলবেই তো। কিন্তু থাক ওকথা। ও নিয়ে আর উত্তেজিত হয়ো না তুমি, অসুখ বাড়বে।

বাড়ুক। মরার আগে আমাকে পরিস্কার হতে দাও বন্দনা। বিশ্বাস করবে না—বললেই হলো ? প্রমাণ নেই আমার কাছে ?

প্রমাণ মানতে চাইবে না। বলবে জাল।

বলবে জাল ?

বলাই স্বাভাবিক। নয় তো মুখের ওপর হেসে উঠে বলবে, বটে নাকি ? তা এতদিন এই সত্য ভাষণের মহিমাটি কোথায় তোলা ছিল ? সারাটা জীবন আমাদের ধোঁকায় ফেলে রেখে—

তবে কেন তুমি—তবে কেন তুমি—সুহৃদ মজুমদারের উত্তেজিত কণ্ঠ হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসে, তুমি ওদের প্রতি অবিচার করেছ। তুমি ওদের মিথ্যা পিতৃপরিচয়ে অন্যের অন্নদাস সাজিয়ে রেখে দিয়েছ।··· তুমি ওদের ডাক। মরবার আগে আমি ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে যাবো। বলে যাবো, আমি—আমি তোদের—

হঠাৎ যেন ঘুম ঘুম ভাব আসে সুহৃদ মজুমদারের। চুপ করে যায়।

কিন্তু বন্দনা তো চুপ করে বসেই থাকে। বন্দনা তো ছুটে তার ছেলে মেয়েদের ডেকে আনতে যায় না। বলতে যায় না তো মরবার আগে তোদের কাছে ক্ষমা চাইছে ও। সত্যি পরিচয় দিতে চাইছে।

না সে কথা আজ আর বলা যায় না।

বন্দনা তার ছেলে মেয়েকে চেনে। বন্দনা জানে, ওই মরণোন্মুখ লোকটার মুখের ওপরই হেসে উঠবে ওরা। বলবে, ওঃ এতক্ষণ ধরে পরামর্শ করে এই গল্পটি বানালে বুঝি? কিন্তু অত বোকা নই আমরা যে ওই আষাঢ়ে গল্পটি বিশ্বাস করবো।

আর তারপর—তাদের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে, আর যদি সত্যি হয়তো, ধিক ধিক! তুমি এই!

বলবে, কী ঘৃণা, কী লজ্জা। আগাগোড়াই তাহলে তুমি ঠক. একটা জোচ্চোর।

জীবনের এতগুলো বছরের এত ক্লেশ, এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত চেষ্টা, মুহূর্তে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই মাকে এই পরপুরুষাসক্ত বিধবা মাকে বরং সহ্য করতে পারছে, ওরা। কিন্তু পরপুরুষাসক্ত সধবা মাকে?

পারবে না, সহ্য করতে পারবে না। আর ক্ষমার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

অথচ সেই আশাতেই বন্দনা—আস্তে আস্তে পিছু হাঁটতে থাকে বন্দনা। এই বৈধব্যের সাজ সজ্জারও আগে চলে যায়।

যেখানে রবিরঞ্জন নামের একটা লোক শুধু সাপে খাওয়া পশুর মত ছটফটিয়ে মরছে।···

রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেতে ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না। অন্ততঃ পারা কঠিন। ছেলেরা যথেচ্ছ ঘুরে যতদিন ইচ্ছে পরে এসে সহাস্য মুখে দাঁড়াতে পারে, জানে গিয়ে দাঁড়ালেই ধান দুর্বো, বরণ মন্ত্র। কিন্তু মেয়েদের ?

তাদের জন্যে তেমন ক্ষেত্রে দরজায় ঝুলবে প্রবেশ নিষেধের নোটিশ, উঁচানো থাকবে কৈফিয়তের খাঁড়া।

ছেলেরা তাই চটিটা পায়ে গলিয়ে (এই চললাম) বলে বেরিয়ে যেতে চিন্তা করে না। মেয়েরা জানে (চললাম) বললেই প্রস্তুত রাখতে হবে (চিরতরে চললাম)।

ওইতো সুহৃদ মজুমদারের বৌটা যেই একবার বলল এখানটা আমার অসহ্য লাগছে, চললাম। ব্যস খতম। সেই যে গেল চিরতরেই গেল। আবার এসে সহাস্য মুখে দাঁড়াতে পারল না বরখাবাড়ি কোলিয়ারির মালিক মজুমদার সাহেবের দরজায়। অথবা বিষণ্ন মুখেই।

বলতে পারলো না, চলে এলাম !

উঃ ! পৃথিবীটা আরো অসহ্য। অথবা ! বলতে পারলো না, দেখলাম এ বাড়ি ছেড়ে থাকা অসম্ভব !

অহরহ যদি নিভৃত নিঃসঙ্গতায় উচ্চারণ করে থাকে সে কথা যদি সেই মুহূর্তের অসতর্কতার জন্যে মাথা কুটে মরে থাকে, তবু ফিরে আসতে পারেনি। মেয়েমানুষ জানে, যাক প্রাণ, থাক মান।

তাই তার চলে যাওয়া মানেই চিরতরে যাওয়া।

বন্দনার মেয়ে বোকা নয়, তাই সে ভবিষ্যৎটা ভেবে নিলো। চলে যাওয়াটা সমীচিন মনে করল না, তাই সে শুধু বেরিয়ে গিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িটায় ওর আনন্দ ছিল, আকর্ষণ ছিল, এখন আকর্ষণ থাকলেও আনন্দটা শূন্যের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওদের জীবনে যে কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে, সেটা বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত ধরা পড়ছে। নিজের কাছে তো' বটেই আকর্ষণের কেন্দ্রটির কাছেও।

পাশের বাড়ির ছেলে সিণ্টুও তার সঙ্গে কোলিয়ারি সাহেবের

সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে, তাদের খেলনা খাবারের ভাগ থেকে দু'হাত ভরে বাড়ি ফিরেছে, আর বিগলিত গলায় বলেছে, তোদের কী মজা। কেমন কোলিয়ারি সাহেব আছেন।

কিন্তু এখন সিন্টু বাঁকা হাসি হাসে।

তাই এখন এসে দাঁড়ানো মাত্র বলে উঠল, কী হল? কোলিয়ারি সাহেবের অসুখ আর সারল না?

কুঙ্কুম বসে পড়ে বলে, থাক ও প্রসঙ্গ থাক। জগতে আরো প্রসঙ্গ আছে।

সিন্টু মুচকি হেসে বলে, প্রসঙ্গটা পাড়া শুদ্ধু সকলের মাথা ধরিয়ে ফেলছে কি না।

কুঙ্কুম ক্রুদ্ধ গলায় বলে, কেন? পাড়ার লোকের মাথা ধরছে কেন? কার কি এসে যাচ্ছে?

যাচ্ছে। তাই যায়। মামা নয় কাকা নয়, জ্যাঠা নয় দাদু নয়, মেসো নয় পিসে নয়, কোলিয়ারি সাহেব। এর পিছনে রহস্য আবিস্কার করতে বসবে না লোকে?

ব্যাপারটা নতুন নয় বরাবরই দেখছে সবাই।

সিন্টু মাথা দুলিয়ে বলে, তা বটে। তবে আজকাল আবার আর একটা নতুন ব্যাখ্যা শুনতে পাচ্ছি—

থাক তুমি কী শুনছ তা আমার শোনার দরকার নেই।

সিন্টু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু আমার যে শুনলে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে কাল পিসিতে আর খুড়িতে কি বলাবলি করছিল জান? নাঃ থাক তুমি শুনলে হার্টফেল করতে পারো।

সে আশঙ্কা যদি থাকে, আশাকরি রিস্ক নেবে না?

কিন্তু সিন্টুর যে বলবার জন্যে মন ছটফট করছে। সিন্টু তাই প্যান্টের পকেটে হাত দুটো পুরে দিয়ে মাতব্বরের ভঙ্গীতে একটু পায়চারি করে বলে, কিন্তু তোমায় একটু অবহিত করাও তো দরকার? ওরা বলছিল, কোলিয়ারি সাহেবের টাকা ঢালা বন্ধ হবে না। মা বুড়ো হচ্ছে চুলোয় যাক, মেয়েটা তো দিব্যি বড় হয়ে—হঠাৎ বাল্য সখার গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দেয় কুঙ্কুম; বলে ওঠে, ইতর

ছোটলোক, অসভ্য! ওরা বলেছে বলে তুমিও মুখ দিয়ে বার করছ এই কথা ?

সিন্টু এই মারটা হজম করে নেয়। গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, উঃ মিলিটারী! তা থাক তেজটা ভালো। বোঝা যায় ঠিক আছে। কিন্তু লোককে এসব বলার সুযোগই বা দিচ্ছ কেন তোমরা ? আগে তো তবু মাঝে মাঝে আসতেন, এখন তো একেবারে গোড়া গেড়ে বসেছেন।

কুঙ্কুম মান রাখতে জোরাল গলায় বলে, তা অসুস্থ মানুষটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে ?

আহা তাই কি আর বলছি ? তা ছাড়া কার বাড়ি থেকে কাকে তাড়াবে ? বাড়ির ভাড়া তো উনিই দেন। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি কুঙ্কুম এগুলো অশোভন। আর অশোভন দৃশ্য দেখলেই লোকে সমালোচনা করে।

কুঙ্কুম হঠাৎ বসে পড়ে শান্ত গলায় বলে, আচ্ছা বলতে পারো কেন করে ? যে অশোভনটা অন্যের গায়ে গিয়ে ফোস্‌কা পড়ায় তার কথা বরং বলতে পারো, কিন্তু কার বাড়িতে কোন অনাত্মীয় লোক তাদের বাসা ভাড়া জোগাচ্ছে কি তাদের কাছে রোগে সেবা নিচ্ছে, এটা এমন কি আলোচ্য বস্তু ?

কী তা জানি না, তবে আলোচনা হয়। ছেলেবেলায় আমিও ভাবতাম, তাতে লোকের কি, কিন্তু এখন দেখি এটাই স্বাভাবিক। অসামাজিক কিছু দেখলেই—

তার কারণ কি জানো সিন্টু ? কেউ কারো কোন সুবিধে হওয়াটা দেখতে পারে না। এইটাই হচ্ছে সারকথা। নইলে নীতি দুর্নীতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি মদ খেয়ে এসে রাস্তায় গড়াগড়ি দাও পাড়ার লোকের আহ্লাদ বৈ গাত্রদাহ হবে না, কিন্তু তুমি চোরাই মাল বেচে বড়লোক হও, লোকে দুর্নীতি দেখে সরে যাবে।

বুঝলাম তো সবই—সিন্টু দুঃখিত গলায় বলে, কিন্তু এই ভাবে চলতে থাকলে আমাদের তো—মানে আমার অন্ততঃ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সিণ্টু ওর কাঁধ তুটো চেপে ধরে।

আর সেই স্পর্শের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

কুঙ্কুম কিন্তু—এ ইঙ্গিতকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ঝেড়ে ফেলে দেয় কাঁধ চেপে ধরা হাত তুটোও। ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে, দেখো এতেও আবার কেউ তুর্নীতি দেখতে পাবে। তবে আমার ভবিষ্যৎ আমি ভালই দেখতে পাচ্ছি। তোমার ওই পিসি খুড়ি আমাকে যে বরণডালা নিয়ে বরণ ক'রে ঘরে তুলবেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাক অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমার, চললাম!

কোথায় যাচ্ছো?

কোথায়? কুঙ্কুম একটু হাসে।

বলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তারপর এখানে এসে উঠলাম।

বেরিয়ে যাচ্ছিলে?

হ্যাঁ। দাবি তুলেছিলাম হয় উনি যান নয় আমরা যাই। মা বললেন উনি থাকবেন।

চমৎকার!

চমৎকার তো সবই। পৃথিবীটাই তো চমৎকার। নইলে আবার সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকবো, মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত, অথবা মাংসের ঝোল দিয়ে গরম লুচি খাবো, নরম গদিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বো।

কুঙ্কুম উঠে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে।

আশ্চর্য এত মেয়ে আছে পাড়ায়। গরীব, বড়লোক, কিন্তু কুঙ্কুমের মত মাথা হেটকরা অবস্থা কারো নয়। কুঙ্কুমেরা যদি তাদের কোন ধনী আত্মীয়ের অকৃপণ বদান্যতায় মানুষ হতো, এত লজ্জাকর হতো কি সেটা?

শুধু অনাত্মীয় বলেই—

ছেলেরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আরামে আরামে প্রতিপালিতরা চট করে পারে না।

তাই তিলক 'যেখানে তুচক্ষু যায়' না ভেবে গিয়ে উঠলো এক বড়লোক সহপাঠীর বাড়ি। বিনা ভূমিকায় বলে উঠলো, বড়লোকেরা

তো সখ করে অনেক কিছু পোষে শুনেছি, পাখী পোষে, কুকুর পোষে, মো সাহেব পোষে। যে কোন ভূমিকায় পোষ্য হতে রাজি আছি, পুষবি ?

সহপাঠীর প্রথমটা কথাটা বুঝতে সময় লাগলো, তারপর হো হো করে হেসে উঠে বললো, হলোকি ? বাড়ি থেকে পালিয়ে নাকি ?

যা বলিস ! মোটকথা রাজি থাকিস তো বল।

বন্ধু হেসে বলে, রাজী থাকতাম, যদি আশা থাকতো ওর মধ্যে একটা কোন ভূমিকাতেও তুই স্যুটেবল হবি।

হবোনা বলছিস ?

উঁহু ! বরং একটা ভূমিকায় 'জনবল' হলেও হতে পারতিস, কিন্তু তাতে আমার দরকার নেই বাবা।

কী সেটা ?

গার্জেন টিউটার।

ও হো হো। হেসে ওঠে দুজনেই। এরপর আর বলা চলে না, দেখ আমি সত্যিই বলছি, আমায় তোর বাড়িতে একটু জায়গা দে। রোজ-গারপাতি তো এক্ষুনি কিছু নেই যে বাড়ি ছেড়ে মেসে গিয়ে উঠবো।

অতএব সবটাই হাসি কৌতুকের ব্যাপার।

অতঃপর কেবল হাসি হুল্লোড়।

অনেক রাতে মাথা ঠাণ্ডা করে যখন বাড়ি ফিরলো, তখন তিলকের মনে একটা আলগা ঔদাস্য।

নিশ্চিত অন্ন, নিশ্চিত আশ্রয়, আর দায়িত্বহীন নিশ্চিন্ততা, এতটার বিনিময়ে কি খানিকটা অসহ্যকে সহ্য করে নেওয়া যায় না ? কী এসে যাচ্ছে মা যদি তাঁর গেষ্টকে নিয়ে একপাশে পড়ে থেকে তাকে রাজ আদর করেন। আমার দিন তো প্রায় কেনাই হয়ে গেছে। আর কটা মাস। পরীক্ষা হয়ে গেলেই কোথাও ভেগে পড়বো।

কিছুটা শান্তি নিয়ে যখন ফিরলো, তখন অনেক রাত, মনে হলো বাড়িটা যেন থম থম করছে।

দেয়ালের আড়ালে কোনো অর্থবহ ঘটনা ঘটলে কি দেয়ালের বাইরে থেকে বোঝা যায় ? হয়তো যায়।

নইলে কোনো কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িকে কেন অন্য আর এক রকম দেখায়? কেন থমথম করে?

নিঃশব্দে উঠে এসে কুঙ্কুমের ঘরে মাথা ঢোকালো, কুঙ্কুম উঠে এলো, বললো, আমি ভাবলাম তুই সত্যিই বুঝি চলে গেলি।

আমিও তোর সম্বন্ধে তাই ভেবেছিলাম।

কুঙ্কুম আর ভূমিকা করলো না, বললো, জানিস দাদা ওঁকে নার্সিং হোমে নেওয়া হয়েছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ! আমি এসে দেখলাম এ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর গাড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। এসে দেখলাম নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে অতটা অমন না করলেই হতো। তাই না দাদা?

ঠিক এই মুহূর্তে তিলকেরও তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু পুরুষ ছেলে, মুখে সেটা স্বীকার করে না। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, যা করা হয়েছে ঠিকই করা হয়েছে। হাসপাতালে দেওয়াইতো উচিত হচ্ছিল বাড়িতে তো সে ভাবে যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়?

যেন কেবলমাত্র রোগীর হিত চিন্তাতেই তিলক—

তবু তিলক আজ আর মাকে ডেকে বিরক্ত করতে গেল না। চুপচাপ খেয়ে শুয়ে পড়লো।

আর আশ্চর্য! আলাদা আলাদা ঘরে শুয়ে তিলক আর কুঙ্কুম দুজনে একই কথা ভাবতে লাগলো, আশ্চর্য এই তো চাইছিলাম আমরা! তবু কেন এমন মন কেমন মন কেমন ভাব হচ্ছে? কেন এমন বুকটা ফাকা ফাঁকা লাগছে। ছেলেবেলাকার সেই ভাল লাগার কারসাজি? না কি ইদানীং বড্ড 'দূরছাই' করেছিলাম বলে? সত্যি অতটা অমন না করলেও পারতাম। মার দুর্বলতার কথা তো আমাদের অবিদিত ছিল না, তবু তো অম্লান বদনে এই অন্ন পরিপাক করে এসেছি। অথচ মানুষটা অশক্ত হয়ে পড়ায়—

তাড়াতাড়ি ঘুমতে চেষ্টা করলো। আর ভাবলো, একবার না হয় নার্সিং হোমে দেখতে যাবে। বলা তো যায় না কিছু, অসুখটা বেশীই

দেখছি। তারপর মনের অগোচরে ভাবলো, কামধেনুর মৃত্যু ঘটলে সংসারের দুধের সরবরাহ হবে কোথা থেকে ?

আরও একটা শূন্য ঘরে একজন জেগে বসে স্বপ্ন দেখছিল, কে যেন তার হাত ধরে বলছে, থান কাপড় পরেছ ? আমার সামনে থান কাপড় পরে এলে ? তুমি নমস্য। আচ্ছা ও কি তোমায় বিয়ে করেছিল ? করেনি ? আইনের বাধা ছিল ? তবে ? স্ত্রী পরিচয়ে ছিলে ? ঠিক আছে। আমাকে অস্বীকার করতে চাও এই তো ? করো। কিন্তু জেনো আমার দরজা চিরদিনই খোলা আছে। ডাকিনি কেন ? ·· নাঃ ডাকিনি, তোমার ইচ্ছের ওপর জোর খাটাইনি। কিন্তু রবিটা মরে গেল ? ভারী আশ্চর্য লাগছে। আমার সাহায্য নেবে না ? বেশ তুমি না নাও আমার ছেলে মেয়ের ভারটা আমায় নিতে দাও। আর জানো, আইনতঃ তুমি এখনো আমার স্ত্রী। সে পরিচয়ে আর প্রকাশিত হতে চাও না ? তাই তুমি বন্দনা চৌধুরী ? আর তোমার ছেলে মেয়েরা তিলক চৌধুরী—কুঙ্কুম চৌধুরী ? হা হা ? খুব চাতুরী খেলেছ তো ? কক্ষনো যাতে আর দাবী করতে না পারি, তাই না ? কিন্তু দোহাই তোমার বরখাবাড়ি কোলিয়ারির টাকাটা নিতে অস্বীকার কোরো না। আমার স্ত্রী পুত্র রাস্তার ভিখিরি হয়ে ঘুরে বেড়াবে এ আমি সইতে পারবো না।

আরো কত কথা। কে বলে চলেছে ? কাকে বলেছে ?

বরখাবাড়ি কোলিয়ারির সাহেব তার গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে কি বলেছিল, সে কথা এসে বন্দনার কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে কেন ? সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে কেন ?

ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন ?

দীর্ঘদিনের ক্লান্তির পরিপূরক গাঢ় গভীর ঘুমের ?

বিবেক বস্তুটা স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। অথচ মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না। অবশেষে ডাক্তারবাবুর কাছে জেনে নিল ওরা কোন নার্সিং হোম, কেবিন নম্বর কি। কুঙ্কুমই অগ্রণী হয়েছে।

একবার গেলে কি হয়েছে অঁ্যা? কুঙ্কুমই বলেছে, এমন তো কত সামান্য পরিচিত লোকও হাসপাতালে দেখতে যায়।

অতএব দেখতে গেলে ওরা। কিন্তু মনকে পরিষ্কার করবে কি করে? কোন আহ্লাদে মন ভরে উঠবে যদি দেখা যায় মা বসে আছে সেই কেবিনের মধ্যে রোগীর ললাটে হাত রেখে।

তবু ঢুকলো। সেই মৃত্যুমলিন মানুষটাকে দেখলো। আর উদ্ধত অবিনয়ী—আর আক্রোশ হিংস্র ছেলেমেয়ে দুটোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন বিরাট একটা আলোড়ন উঠলো।

এই সেই আমাদের শৈশবের একান্ত প্রিয় মানুষটা।

তিলকের রূঢ় রুক্ষ মন, তিলকের চাপা প্রকৃতি, তবু তিলকের চোখের স্নায়ুগুলো চিনচিন করে ওঠে।···ভেবে ছিলাম মিথ্যা রোগ বানিয়ে লোকটা সুযোগ নিচ্ছে, বাসনা চরিতার্থ করছে, প্রিয়া সান্নিধ্যের সুখ উপভোগ করছে। অথচ ও মরে যাচ্ছে।···কী কটু ব্যবহার করেছি, কী রূঢ় বলেছি ইদানীং, ও কোনোদিন তার প্রতিবাদ করেনি। আমার সেই কদর্য ব্যবহারের ত্রুটি আর কোনোদিন পূরণ করবার সময় পাব না।

কুঙ্কুমের হঠাৎ নিজেকে ভারী নীচ মনে হল।

কুঙ্কুমের সারা মন হায় হায় করে উঠলো। এই তো মরতেই বসেছে মানুষটা, অথচ আমি কতদিন ভেবেছি, হঁ্যা মনের অগোচরে পাপ নেই, কতদিন ভেবেছি ও মরে যাক। ও মরলে আমাদের সংসারটা পাপমুক্ত হবে। লোকে ক্রমশঃ ভুলে যাবে ওকে, আমরা সাধারণ গরীব বিধবা মার ছেলে মেয়ের মত থাকবো। নিজেরা খেটেখুটে নিজের পায়ে দাঁড়াবো।···কিন্তু এখন এমন ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে কেন? এখন কেন ওর বিছানার কাছে আছড়ে পড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, আমায় ক্ষমা করো কোলিয়ারি সাহেব, বড় খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। এবারের মত বেঁচে উঠে একবার অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। তোমাকে বিষ দেখেছি, কিন্তু তোমারই বা দোষ কি? তুমি একটা অবিবাহিত পুরুষ, তোমার দুর্বলতা আসা আশ্চর্য নয়। বরং প্রকৃত দোষী আমাদের মা ওই যে

যিনি বসে আছেন। যিনি স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করে, একটা বড় বয়সে বিধবা হয়ে আবার—

কোলিয়ারি সাহেব তুমি এবারটার মতন অন্ততঃ বেঁচে ওঠো। অন্ততঃ বুঝে যাও সত্যি এত খারাপ আমি নই। শুধু রাগে দুঃখে ঘেন্নায় এত নীচতা করেছি। কুঙ্কুমের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

হয়তো এমনিই হয়। মৃত্যু দূর করে দেয় সমস্ত কাঠিন্য। মৃত্যু মানুষের ভিতরের মমতার দরজাটি খুলে ধরে। যাকে কঠোর বিচারে দণ্ডিত করতে চাইতে, মৃত্যু এসে তার দণ্ড মুকুব করে দেয়।

কেমন আছেন? ভাঙা ভাঙা গলায় বললো কুঙ্কুম।

বন্দনা চমকে তাকালো। রোগীও চমকে চোখ মেললো। দেখলো দুটি কমনীয় গড়নের মুখ। অপরাধী অপরাধী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

যেন ফুল ফুটে উঠলো ঘরে।

যেন প্রাপ্য পাওনা সম্পর্কে হতাশ হয়ে বিষণ্ন মনে বিদায় নেবার মুহূর্তে কে এসে পাই পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে এল।

তিলক এসেছে কুঙ্কুম এসেছে। সুহৃদ মজুমদারকে দেখতে এসেছে।

অদ্ভুত একটা আলো জ্বলে উঠলো সেই নিষ্প্রভ হয়ে আসা চোখ দুটোয়। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়লো সেই মরণাহত মুখে। কথা বলবার ক্ষমতা নেই, তবু বললো, জানতাম! জানতাম তোরা আসবি।

কেমন আছেন?

তিলকের স্বরটা এখন আর সেই বড় হয়ে ওঠার রূঢ়তা নিয়ে আছড়ে পড়ল না। তিলকের স্বরটা যেন আবার কৈশোরে ফিরে গেছে।

ভাল আছি। রোগী থেমে থেমে বলে, একটু কাছে আয়। তোদের একবার ভাল করে দেখি। বন্দনা জানালাটা ভাল করে খুলে দাও তো। ওদেরমুখ দেখতে পাচ্ছি না আমি।···

বেশী কথা বোলো না। আস্তে বলে বন্দনা!

আর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মুখের ভাব ভয়ঙ্কর ভাবে বদলে যায়।

কঠোর হয়ে ওঠে, বিকৃত হয়ে ওঠে, এখনো বলছো কথা বলো না। এখনো ভাবছো কথা না বললেই আরো একশো বছর বাঁচবো আমি ?

স্বর ধাপে ধাপে উঠতে থাকে, আমি কচি খোকা ? আমি বুঝছি না আমার শেষ হয়ে এসেছে ? আর আমি তোমার বারণ শুনবো ভেবেছ ? আমি ওদের কাছে সব বলে যাবো। আমি ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে যাবো !

হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সুহৃদ মজুমদারের কঙ্কালখানা।

তুমি, তুমি শুধু নিজের জেদে চলে আমাকে একটি কথা বলতে দাওনি। আমার ছেলে মেয়েকে ছেলে মেয়ে বলতে দাওনি। ওরা কত দুঃখ পেয়েছে, সংশয়ে জ্বলেছে—

চুপ করুন চুপ করুন উত্তেজিত হবেন না—

মঞ্চে যে নাটক অভিনীত হচ্ছে, তার সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ না বুঝে, নার্স তার কর্তব্য করতে ছুটে আসে।···রোগীর উত্তেজিত দেহটাকে ধরে তীব্র গলায় বলে ওঠে, আপনারা বাইরে যান। দেখছেন কী রকম উত্তেজিত হচ্ছেন !

নার্সের ক্রুদ্ধ ইসারায় চলে আসছিল দুই ভাইবোন, কিন্তু বিকার বলমত্ত রোগী তখন নার্সের হাত ছাড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেছে, না ওরা চলে যাবে না। ওরা থাকবে। ভেবেছে কি তোমরা ? আমি মরে যাবো তবু বলতে দেবে না, তাড়িয়ে দিচ্ছো ওদের ? জানো ওবা কে ? চলে যাসনি তোরা শুনে যা—আমি তোদের বাবা ! বানানো গল্প নয় সত্যিকার বাবা···আমায় চিরদিন চুপ করিয়ে রেখেছে বলতে দেয়নি। আজ আর কথা শুনছি না—হাহাকার ওঠে একটা।

নার্সের জ্বলন্ত দৃষ্টির বাণে ছিটকে গিয়ে ঘরের বাইরে এসে পড়ে দুটো হতচকিত ছেলে মেয়ে, আর হাহাকারটার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ পায়।

কিন্তু কোনটা আগে ? হাহাকারটা ? না শব্দটা।

কিন্তু ওরা পিছু ফিরে তাকাবে না। ওরা পালাবে। ওরা ভয় পেয়েছে। ওদের মাথার মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে।

আর ওই আর্তনাদটা ওদের তাড়া করে আসছে। একসঙ্গে ছু' ছুটো বড ধাক্কা সহ্য করতে পারছে না ওরা।

তাই ছুটতে ছুটতে নেমে যাচ্ছে। বারান্দা সিঁড়ি করিডোর··· কম্পাউণ্ড। রাস্তায় পড়েও ছুটবে। এই শহরটা ত্বলছে ওদের চৈতন্যের সামনে।

ওরা পালাবে। ওদের ভয় করছে।

ওরা বাড়ি গিয়ে তবে হাঁফ ফেলবে।

আমি তোদের বাবা! এ কী ভয়ানক ভয়াবহ স্বীকারোক্তি! তার মানে আমরা অবৈধ!

একটা দমবন্ধ হয়ে আসা গলা উচ্চারণ করে, বুঝতে পারছিস? আমরা হচ্ছি নোংরা, পচা, সমাজের একটা আবর্জনা। আমাদের জাত নেই গোত্র নেই মানুষের জগতে একটা পরিচয় নেই। লোকে আমাদের ভেতরের কথা জানতে পারলো, আমাদের ছোঁবে না, আমাদের গায়ে থুতু দেবে। বুঝতে পারছিস কথাটা? বুঝতে পারছিস অভিধানে আমাদের মতন হতভাগাদের কী বলো?

দাদা তোর পায়ে পড়ি চুপ কর।

কুঙ্কুম কেঁদে ফেলে বলে, ভাবতাম আমরা ভাল, আমরা পবিত্র, মা শুধু এখনই ভুল করছে। মা এই সংসারটা সুখে চালিয়ে নেবার জন্যে নিজেকে খারাপ করছে, আর উনি শুধু মার জন্যেই···বুঝতে পারিনি— ডুকরে কেঁদে ওঠে কুঙ্কুম, উনি যা করেছেন বাধ্য হয়েই করেছেন। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে দাদা।

মরবার আগে আমাদের মাকে একবার দেখে নিতে চাই কুঙ্কুম। জিজ্ঞেস করতে চাই কেন উনি আমাদের জন্মের আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় দেননি। কেন এই জঞ্জালদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু বন্দনা কোথায়?

বন্দনা তো তখনো একটা জ্বলে যাওয়া সলতেয় ফোঁটা ফোঁটা তেল দিচ্ছে আর মুহূর্ত গুণছে। জানে এ সলতে আর জ্বলবে না,

তবু একেবারে ছাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তো থাকতেই হবে বসে। কথা নেই, সেবা নেই, শুধু অক্সিজেনের নলটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকা অতএব অন্তহীন অবকাশ। অতএব বসে বসে ভাবা যায়, এতদিন ধরে তবে কি করলাম আমি?

এই স্বীকারোক্তিটুকুর জন্যে ছটফটিয়ে মরেছে লোকটা, সেই গোড়া থেকে। বলেছে. এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না বন্দনা, এই চোর হয়ে থাকার গ্লানি আর সহ্য হয় না। যা থাকে কপালে, দিই একবার প্রকাশ করে। প্রথমটা হয়তো চমকাবে ওরা, হয়ত বিরূপ হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। রবিরঞ্জনের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই একথা টের পেলে, মুছেও ফেলবে সে স্মৃতি। আর আমি ও—

হ্যাঁ বলেছিল লোকটা, আর আমিও ভুলে যাবো মাঝখানের এই দিনগুলো! মনে হবে যেমন ছিলাম—

মনে হবে? বিদ্রূপের ছুরি বিঁধিয়েছিল বন্দনা, অপরের উচ্ছিষ্ট পাত নিয়ে আবার খেতে বসতে ইচ্ছে করবে তো?

হ্যাঁ, এই ভাবে ছুরি বিঁধে বিধেও মুঠোয় ভরে রেখেছিল বন্দনা লোকটাকে। আজ মুঠো থেকে ফস্‌কে চলে গেল।

আশ্চর্য। বন্দনাকে হারিয়ে ফেলেও যে লোক কতদিন নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল, সে কেন—

সে কি শুধু বন্দনার দুঃসময় দেখে?

নাকি আগুন নয় শুধু জল?

প্রেম নয়, শুধু বাৎসল্য স্নেহ?

অথচ সেই স্নেহটাকে প্রকাশ করতে পায়নি সে।

বন্দনার ঠোঁট নড়েনা, তবু যেন বন্দনা বলেই চলে, কিন্তু কেন পায়নি? আমি কি তবে শুধু নিজের দিকে তাকিয়েছিলাম? ভেবেছিলাম, প্রকাশ করতে বসলে, আমার সমস্ত কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমার মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে তিল তিল করে মেরেছি লোকটাকে। আপন সন্তানের কাছে ধিকৃত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে প্রাণটা ভেঙে গেছে ওর। তবু আমার জেদ ভাঙিনি।

কিন্তু শুধুই কি নিজের কথা ভেবেছি আমি? ওদের কথা ভাবিনি? ওদের মুখ চাইনি? হতে পারে আমারই বুদ্ধির দোষে, ওরা মজুমদার হয়েও চৌধুরীদের ঘরে পড়ে আছে, একথা ওদের টের পেতে দেব না।

ভেবেছিলাম ওদের সত্য পরিচয় দিলে ওরা আমায় ঘৃণা করবে।

অথচ ওরা সেই ঘৃণাই করলো। ওদের বাপকে বাইরের লোক ভেবে প্রতি মুহূর্তে ছোবল হানলো।

তবে আমি কা করবো? জীবনের প্রারম্ভের এক টুকরো অসতর্কতার জের টানতে টানতে জেরবার হয়ে গেলাম তবু কোথাও পথ খুঁজে পেলাম না। দিনে দিনে জটিলতা শুধু বেড়েই চলল।

রবিরঞ্জন যে মরে গেল সে কি আমার দোষ?

আমি কি তাকে লরীর তলায় পড়তে বলেছিলাম? আমি তো শুধু বলেছিলাম আমায় একটু বিষ এনে দাও।

আর কি করেছি?

হ্যাঁ, অজস্রবার বলেছি বটে, তুমি আমায় ফেলে চলে যাও, আমি মুক্ত হই তুমি মুক্ত হও।...আমি তোমার ইহ পরকাল খাচ্ছি, তোমার বুকে বাঁশ ডলছি, তোমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, তবু তুমি কেন আমায় আগলে নিয়ে বসে থাকবে? বলেছি এসব।

তা বলে মরে গিয়ে চলে যেতে বলিনি।

কথা কথা! অজস্র কথা তোলপাড় করছে।

তারপর অক্সিজেনের নলটা কখন যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল, কখন যেন সব বন্ধ হয়ে গেল, বন্দনার নার্সিং হোমের কাজ ফুরলো। বন্দনাকে আর ফিডিং কাপও ধুতে হবে না। বন্দনাকে অতএব ভয়ে ভয়ে চোর হয়ে থাকতে হবে না।

বন্দনা এখন সাহসে ভর করে খামটা এগিয়ে দিল ওর ছেলের হাতে। যে খামটায় বরখাবাড়ি কোলিয়ারির মালিক মজুমদার সাহেবের উইল আছে, আর তার শেষ পত্র আছে।

প্রথম আর শেষ।

উইলটা জলের মত সোজা।

মজুমদার সাহেব তাঁর যথাসর্বস্ব তাঁর দুই প্রিয় পাত্রকে দিয়ে গেছেন! তিলক চৌধুরী, আর কুঙ্কুম চৌধুরীকে।

চৌধুরীই।

চৌধুরী নামেই পরিচিত যে ওরা। ওটা বদলাতে বসলে, উইল নিয়ে কোর্টে যেতে হবে ওদের। অতএব সোজা ভাষা, 'প্রিয়পাত্র'।

কিন্তু চিঠিখানা ভারী গোলমেলে। বুঝতে সময় লাগে।

আর বুঝে ফেলার পর হঠাৎ দেখা যায় তিলক নামের ছেলেটা আর কুঙ্কুম নামের মেয়েটা অবৈধ নয়। সমাজের জঞ্জাল নয়।

চিরদিন অফুরন্ত স্নেহের রহস্য ভেদ হয়ে যাচ্ছে, একটি প্রসন্ন দেবতা মূর্তি মৃত্যুর মহিমা বলয়ের মধ্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

কত মহৎ সেই মূর্তি! কত ক্ষমাশীল! কত স্নেহময়।

কুঙ্কুম মুখ ঢেকে বসে পড়ে। তার সেই হাতের ফাঁকগুলো ভিজে ওঠে। তার সেই সমস্ত কান্না যেন কথা হয়ে বলতে চায়, কী করেছি। কী করেছি।

তিলক রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে ওঠে, মা।

বন্দনা যেন ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়া আসামী। বন্দনার কণ্ঠে সেই নির্লিপ্ততা।

বল।

এ চিঠি সত্যি?

সত্যি।

এইভাবে তুমি আমাদের জীবনগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ?

খেলেছি। অস্বীকার করতে পারি না।

কেন? কেন? কী সুখ পেয়েছ তুমি এতে? বল কেন এইভাবে আমাদের অন্ধকারে রেখে দিয়ে মজা দেখেছ?

জানি না।

জানো না? জানো না তুমি কিছু?

সত্যিই জানি না তিলক। বন্দনা কেমন একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলে, মাকড়সা কি জানে, কেন সে নিজেকে ঘিরে ঘিরে জাল রচনা করে চলে, নিজেকে বন্দী করার জন্যে।